সাহিত্য-বিচার

সাহিত্য-বিচার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকা

প্রকাশক :

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি. এ.

৮ সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৯

দ্বিতীয় সংস্করণ : কার্ত্তিক, ১৮৭৯ শকাব্দ

পাঁচ টাকা

মুদ্রাকর :

শ্রীঅজিত ঘোষ

শরৎ [illegible] ণী

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অভিন্নহৃদয়েষু

গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন

সাহিত্যের রস ও সাহিত্যের রূপ এই দুই লইয়া সাহিত্যের স্বরূপ। সাহিত্যের এই স্বরূপ সম্বন্ধে আমি আমার বিভিন্ন গ্রন্থে, আধুনিক পদ্ধতি অনুযায়ী যে সকল আলোচনা করিয়াছি তাহার এমন কয়েকটি এই পুস্তকে একত্র করিয়া দিলাম যেগুলি সাহিত্য-শিক্ষার্থী বাঙ্গালী পাঠক ও ছাত্রগণের কাজে লাগিতে পারে।

এই পুস্তকের তিনটি প্রবন্ধ নূতন—পূর্ব্বে কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে 'কবি ও কাব্য'-শীর্ষক প্রসঙ্গগুলির রচনা-ভঙ্গিও নূতন, 'কাব্যকথা' নাম দিয়া একদা যে একখানি গ্রন্থ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এগুলি তাহারই একটি অংশ। এই গ্রন্থ যদিও পরে আর সমাপ্ত হয় নাই, তথাপি এই চতুরঙ্গ-আলোচনাটিতে কবি ও কাব্যঘটিত কতকগুলি মূল প্রশ্নের সম্যক মীমাংসা আছে।

বাকি প্রবন্ধগুলি যে যে গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়াছি সেই সেই গ্রন্থের প্রকাশক আমাকে এইরূপ উদ্ধৃত করিবার অনুমতি দিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

বাগনান, বি-এন্-আর
রাস-পূর্ণিমা, ১৩৫১

কবি ও কাব্য

১। বিষয়-নির্দ্দেশ

কবি কে?—এই কথার সহজ উত্তর, যিনি কাব্য রচনা করেন, তিনিই কবি। কিন্তু কথাটা এত সহজ নয়, কারণ সঙ্গে-সঙ্গে—কাব্য কি?—এ কথারও উত্তর চাই, এবং সে উত্তর কঠিন বটে। তথাপি কাব্যের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশের গুরুভার আপাততঃ কাব্যামোদী পাঠকের উপরে চাপাইয়া যিনি কাব্যকার, কবি বলিতে তাঁহাকেই বুঝিব। কাব্য কি, তাহার উত্তরে এই মাত্র বলিব যে, 'শকুন্তলা' ও 'মেঘদূত' কাব্য, 'লিয়ার' ও 'টেম্পেস্ট' কাব্য, 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'সোনার তরী' কাব্য। ইহাদের মধ্যে কাব্যবস্তু কোথায়—ছন্দে না বাক্যে, অর্থে না আখ্যান-ব্যাখ্যানে, কল্পনা-কৌশলে না সদ্ভাব বিকাশে—কিম্বা, এই সকলের সহ-যোগেরও অধিক একটি অপূর্ব্ব চিত্ত-চমৎকার বা অনুভূতি-বিলাসে—সে আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমি কেবল কবি ও কাব্যের কার্য্য-গত সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে চাই, কীর্ত্তি ও কর্ত্তার মধ্যে পরস্পরের পরিচয়ের সূত্র কতটুকু, কবির প্রেরণা ও কাব্যের অভিপ্রায় কিরূপ, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অতএব প্রথমেই ধরিয়া লইলাম, যিনি কাব্যকার তিনিই কবি। আর একটু স্পষ্ট করিয়া লই। প্রথমতঃ যিনি কাব্য রচনা করেন নাই, তিনি কবি নহেন, যথা—নীরব কবি। দ্বিতীয়তঃ যিনি কাব্য রচনা করেন, কবি বলিতে সেই মানুষটিকে বুঝিব না, সেই মানুষটির মধ্যে যে আর একটি মানুষ আছে, কাব্যরচনাকালে যে আত্মপ্রকাশ করে, অথবা আর একটি যে আত্মা যেন তাঁহার উপরে ভর করে, সেই অপর ব্যক্তি বা আত্মাকেই কবি বলিয়া বুঝিব।

যিনি কাব্য রচনা করেন না, তিনি কবি নহেন—এ কথাটা বোধ হয় বেশি বুঝাইতে হইবে না। ভাবুক বা রসিকমাত্রেই কবি নহেন, কাব্যের ভাবনা বা ধারণা করিতে পারিলেই কবি হওয়া যায় না, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ভাবুক বা রসিকের কল্পনা আছে সত্য, কিন্তু সে কল্পনা বন্ধ্যা, ভাবুকের মনেই রুদ্ধ হইয়া থাকে। যে দৈবী প্রেরণার বশে সেই কল্পনা কাব্যসৃষ্টিতে রূপময়ী

হইয়া উঠে, সে প্রেরণা সকলের ভাগ্যে ঘটে না; যাঁহার ভাগ্যে ঘটে, সেই ভাগ্যবানই বাণীর বরপুত্র, তিনিই কবি।

আবার যে মানুষটির মধ্যে এই দৈবী প্রেরণার লীলা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই মানুষটির সাধারণ মনুষ্যজীবন একরূপ, তাঁহার কবি-জীবন বা কাব্যগত পরিচয় স্বতন্ত্র। কবির জীবনে এই দ্বৈত আছে। কাব্যের মধ্যে যাঁহাকে পাই তাঁহার মূর্ত্তি, আর সমাজে সংসারে যাঁহাকে পাই তাঁহার মূর্ত্তি এক নহে। এমন কি, কাব্যের মধ্যে যাঁহার সঙ্গে পরিচয় হয়, তাঁহার মধ্যে আমাদের সাধারণ ধারণার অনুযায়ী কোনও ব্যক্তিত্ব খুঁজিয়া পাই না। কবির ব্যক্তিত্ব বলিতে যাহা বুঝি, তাহা কোনওরূপ চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নয়—ইহাই আমার কথার তাৎপর্য্য।

কাব্যের গৌরব আর যাহা হউক, তাহা যুদ্ধজয়ের মত একটা কীর্ত্তি নয়, সাম্রাজ্যস্থাপন নয়, পতিতোদ্ধার নয়। মানুষের কর্ম্মগৌরব, এবং তাহার মূলে যে বুদ্ধি, নীতি, কৌশল ও চরিত্রশক্তির পরিচয় আছে, সেরূপ কোনও পরিচয় কবি-কীর্ত্তির মধ্যে নাই। কবির কাজ ইহা হইতে বহুগুণে উত্তম হইতে পারে; তাহার মধ্যে যে শক্তির পরিচয় পাই, তাহার চমৎকারিত্ব অনেক বেশি হইতে পারে, তথাপি তাহাতে সাধারণ মানুষ-ধর্ম্মের পরিচয় নাই।

কাব্যে মনীষার পরিচয় নাই, কবিপ্রতিভা বলিতে চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ বুঝায় না; কারণ, যাহাকে আমরা চিন্তাবৃত্তি বলি, কাব্য সেই চিন্তাবৃত্তির ফল নয়।

কাব্যের মধ্যে কবির যে সহৃদয়তার পরিচয় পাই, যে সহানুভূতিকে সত্যকার কবি-ধর্ম্ম বলিয়া বুঝি, তাহা লৌকিক হৃদয়বৃত্তি নয়। যে প্রাণ, কুষ্ঠীর ক্ষত নিজ হস্তে ধৌত করিতে চায়, ক্ষুধিতের ক্ষুন্নিবারণে উৎসুক, বিপন্নকে উদ্ধার করিতে চিন্তিত—কাব্যের মধ্যে সেই প্রাণের পরিচয় অসম্ভব; বরং অনেক সময়ে (সাধারণ পাঠকের বুদ্ধিতে) তাহার উল্টা পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। কবি এমন সকল বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত, যাহা পড়িতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়,—এমন কল্পনায় মশগুল, যাহা শয়তানকেও আমাদের চক্ষে মহিমামণ্ডিত করে।

অতএব যাহা কিছু লইয়া সাধারণ মানুষের কৃতিত্ব তাহার অনুরূপ লক্ষণ কাব্যে পাওয়া যাইতে পারে না। কাব্যদ্বারা কাব্যকারের বাস্তব চরিত্রের কোনও ধারণা পরিস্ফুট হয় না।

চরিত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কবির মনটাকেই যদি কাব্যের মধ্যে ধরিতে যাই—তবে সেই পরিচয়ের মূল্য কোন্ দিক্ দিয়া কতটুকু তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। কবি-কল্পনার সত্যাসত্য অন্যরূপ। সে যে কিরূপ, সেই কথাই এই প্রবন্ধের বিষয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে, ব্যবহারিক জীবনে, 'লোকচরচা'য়—যে সংস্কার, সকলের সম্বন্ধেই নানাদিক্ হইতে ফুটিয়া উঠিয়া মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রের একটা ধারণা গড়িয়া তোলে, কাব্যের মধ্যে কবির সম্বন্ধে সেই ধারণাকে সর্ব্বদা দূরে রাখিতে হইবে—ইহাই আমার সর্ব্বপ্রথম বক্তব্য। কথাটা অনেকের পক্ষেই হয়ত নূতন নয়, তথাপি অনেকের মনে এইরূপ একটা অভ্যাসের সংস্কার রহিয়াছে দেখা যায়, এই জন্য আমি বাহুল্যভয়সত্ত্বেও ওই কথাটাই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতে চাই। কাব্য পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠক —যাঁহার যতটুকু রসবোধ আছে, সেই অনুপাতে—আনন্দ পাইয়াও, কবির একটা অবান্তর পরিচয় কাব্য হইতে খাড়া করিয়া, কাব্যের অর্থ-সঙ্গতি বা অর্থ-গৌরব অথবা অর্থ-লাঘব করিতে চান; ইহাতে কবি ও কাব্য উভয়েরই মর্য্যাদাহানি হয়।

কবির জীবনের সঙ্গে কাব্যের একটা যোগ কোথাও আছে, সে যোগসূত্র বাহির করার উপায়ও স্বতন্ত্র। প্রাত্যহিক জীবনের কার্য্যক্ষেত্রে, মানুষের কার্য্য ও স্বভাবের মধ্যে, যে একটি সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়, মানুষের মতামত ও সামাজিক আচরণের মধ্যে যে মিল না থাকিলে তাহাকে মিথ্যাচারী হইতে হয় —কবির কবিজীবন ও কাব্যের মধ্যে সেইরূপ একটা মিল থাকাই সম্ভব, কিন্তু সে যে কিরূপ এবং কোথায়, তাহা বিচার করিতে হইলে, কবি ও কাব্যের একটি যথার্থ ধারণার প্রয়োজন। কাব্যের কবি-মানস কবির ব্যক্তিগত চরিত্র হইতে স্বতন্ত্র। ইহার প্রমাণ সকল উৎকৃষ্ট কাব্য পাঠ করিবার সময় মনে-মনে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট নাটক উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার নিদর্শন, সেখানে কবির ব্যক্তিত্ব কোথায়? বরং সেইটি লোপ হয় বলিয়াই নাটক উৎকৃষ্ট হইতে পারে। কাহিনী-কাব্যের আখ্যানবস্তু-নির্ব্বাচনে বা বর্ণনাভঙ্গিতে কবির যে অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়, তাহাও কবির বাস্তবজীবনের বাস্তব অভিপ্রায়ের সহিত না মিলিবারই সম্ভাবনা। লিরিকের মধ্যে কবির যে আত্মগত উচ্ছ্বাস থাকে, তাহাতে যে আত্মাভিমান প্রকাশ পায়, তাহাও একটা আদর্শ-কল্পনার আবেগ, সেও কবির ব্যক্তি-চরিত্রের পরিচয় নয়।

অতএব কবি-ধর্ম্ম বলিতে সাধারণ ব্যক্তি-ধর্ম্ম মনে করা চলে না। তাহার কারণ, কাব্যরচনাকালে মানুষটি আর সেই-মানুষ নাই, তখন একটা বৃহত্তর চেতনার আবেশে প্রাণের অবাধ স্ফূর্ত্তি, কল্পনার দিব্যোন্মাদ ঘটে। কবি তখন মনুষ্যজীবনের সাধারণ স্তর হইতে একটা উর্দ্ধতর স্তরে উঠিয়া যান; এই mood বা ভাবাবস্থাই কাব্যের জননী। কাব্যসৃষ্টিতে কবির যে আত্ম-বিকাশ বা আত্মপ্রসার হয়, তাহাতে কোনরূপ চরিত্রলক্ষণ থাকে না। চরিত্র কি?—মানুষের সাধ ও সাধ্যের বিষমতায়, অনুকূল বা প্রতিকূল প্রতিবেশের প্রভাবে, তাহার ইচ্ছাশক্তি নিরন্তর যে কর্ম্ম-রূপ ধারণ করিতেছে তাহারই একটি বিশিষ্ট ও ব্যক্তিগত আকারকে আমরা চরিত্র বলিয়া থাকি। কবি যখন কাব্যরচনায় ব্যাপৃত, যখন তাঁহার ঐ mood উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার জীবন এই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে, লৌকিকতার সর্ব্বসংস্কার ঘুচিয়া যায়, ক্ষুদ্র ব্যক্তি-জীবন একটি মহত্তর সত্তায় ডুবিয়া যায়—তখন তাঁহার নবজন্ম বা দ্বিজত্ব লাভ হয়। এই অবস্থায় মানুষ যেন স্বমহিমায় বিরাজ করে। এই উল্লাসের অবস্থায় মানুষের 'অহং'টি আর থাকে না। এই অহংজ্ঞানই সর্ব্বপ্রকার অশক্তি ও অজ্ঞানের মূল। ইহারই ফলে মানুষের সাধনা ও সিদ্ধি, জ্ঞান ও প্রবৃত্তির নিত্য বিরোধ ঘটে, এবং সারাজীবন ধরিয়া তাহাকে আত্মসংগ্রাম করিতে হয়। তাহার ইচ্ছাশক্তি, জগৎ-ব্যাপারের প্রতিপদে বিঘ্নিত হইয়া ঘূর্ণাস্রোতে বহিয়া চলে, এবং তাহার মুক্ত শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ আত্মাকে পীড়িত করিয়া, তাহার উপর ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের বা সঙ্কীর্ণ চরিত্র-বুদ্ধির আরোপ করে। কাব্যসৃষ্টিকালে এই অহং-মুক্তি ঘটে বলিয়াই কবির সম্বন্ধে কোনও চরিত্রবিচার খাটে না। বাস্তব জীবনে কবির কর্ম্মবৃত্তি সাধারণ মানুষের মতই অবস্থা ও চরিত্রবশে নানারূপ হইতে পারে। কেহ যোদ্ধা, কেহ রাজসভাসদ্, কেহ জমীদার, কেহ পল্লীবাসী গৃহস্থ, কেহ শেক্স্পীয়ারের মত সাধারণ বিষয়ী লোক, কেহ গোঁড়া ধর্ম্মবিশ্বাসী, স্বজাতি ও স্বদেশপরায়ণ; আবার কেহ গেটে বা রবীন্দ্র-নাথের মত জাতি ও স্বদেশাভিমান-বর্জ্জিত বিশ্বপরায়ণ মনীষী। কিন্তু যেমনি তাঁহার হৃদয়ে কাব্যপ্রেরণা জাগিয়া উঠে, সেই বৃহত্তর চেতনার আবেশ হয়, অমনি বাহিরের সকল সাজসজ্জা খসিয়া যায়—বিষয়-বুদ্ধি, মানুষের প্রতি অবজ্ঞা বা অবিশ্বাস, স্বার্থসাধন, আত্মপ্রতিষ্ঠা কোথায় ভাসিয়া যায়; তখন তাঁহার চিত্ত শিশুর মত সরল, বিশ্বাস-প্রবণ ও আনন্দময় হইয়া উঠে।

কবির এই অবস্থা, এই নবজন্মের পরিচয় আমরা কাব্যে সর্ব্বত্র পাইয়া থাকি। দেশ, কাল ও পাত্রের সীমা কোথাও থাকে না, কোনোখানে গণ্ডী নাই, কুত্রাপি ব্যক্তিত্বনিষ্ঠা বা চরিত্রনীতির পরিচয় নাই। বিশ্ববিধানের যাহা কিছু বৈচিত্র্য তাহাকে এক দিব্যজ্ঞানের ও আনন্দের ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া,—যুক্তিবিরোধ, নীতিবিরোধ, ন্যায়বিরোধ—সকলই অস্বীকার করিয়া, কবি স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল-রসাতলে তাঁহার 'আমি'টাকে প্রসারিত করিয়া এক অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি, এক মহান্ উল্লাস প্রকটিত করেন। নিজেই প্রজাপতি হইয়া ফুলের উপর উড়িয়া বসেন, মেঘ হইয়া আকাশে ভাসিয়া বেড়ান, ঘাতক হইয়া হত্যা করেন, প্রণয়মুগ্ধা কিশোরী হইয়া ব্রীড়াবনতমুখী হন; একই কালে 'ওথেলো'র অরুন্তুদ হৃদয়যাতনা এবং 'ইয়াগো'র নৃশংস উল্লাস ভোগ করেন। কখনও বলিয়া উঠেন,

ইহার চেয়ে হতেম যদি
          আরব বেদুয়িন!
চরণতলে বিশাল মরু
          দিগন্তে বিলীন!
ছুটেছে ঘোড়া উড়েছে বালি
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি'
          চলেছি নিশিদিন;
বরশা হাতে ভরসা প্রাণে
          সদাই নিরুদ্দেশ,—
মরুর ঝড় যেমন বহে
          সকল বাধাহীন।

আবার

যদি   ননী-ছানার গাঁয়ে
কোথাও   অশোক-নীপের ছায়ে
আমি   কোন জন্মে পাই-রে হ'তে
               ব্রজের গোপবালক!

আবার, কবি কোনও কবিতায় যাহা বলিয়াছেন, নিজ জীবনে তাহা আচরণ করিয়াছেন কি না—তাঁহার যে অনুভূতি কাব্যের মধ্যে জ্বলন্ত হইয়া

উঠিয়াছে, জীবনযাত্রায় তাহার কতটুকু সত্য হইয়া উঠিয়াছে—সেই প্রমাণ যদি পাইতে চাই, তবে নিরাশ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কাব্যজগৎ স্বতন্ত্র জগৎ, সেখানে বাস্তবের কঠিন শাসন অগ্রাহ্য করা চলিতে পারে বলিয়াই কবি-শক্তিকে পূর্ণমানবতার লীলা বলা যায়। বাস্তব জীবনের সকল অক্ষমতা, অজ্ঞান ও অশক্তির হাত এড়াইয়া কবি কাব্যলোকে প্রবেশ করেন। এই সৃষ্টির অন্তরালে যে জ্ঞান, আনন্দ ও শক্তি একাধারে প্রবাহিত, তাহারি পূর্ণ-চেতনায় তিনি তখন লীলাময়। সেই অবস্থায় কবির আহ্লাদের অবধি থাকে না; স্বমহিমায় পুলকিত হইয়া সেই দিব্যশক্তিরূপিণী কাব্য-সুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া কবি তখন জয়োচ্চারণ করেন—

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক গে এ বসুমতী যার খুসী তার।

এই অবস্থা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তিনি তাই; আবার যখন প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় নামিয়া আসেন, তখন তিনি যে-মানুষ সেই-মানুষ, তখন তাঁহার চরিত্র আছে, কর্ম্মনীতি আছে, সাধারণ মানুষের যাহা কিছু দুর্ব্বলতা সবই তাঁহার আছে। অতএব কবি তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের কর্ম্মনীতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সত্তার প্রভাব রক্ষা করিতে পারেন না বলিয়া যদি হতাশ হইতে হয়, তাহা হইলে কবি যখন উৎকৃষ্ট ভাবাবেশে কাব্যলোকে প্রবেশ করেন তখন তিনি নিজ জীবনের সকল ত্রুটি, অক্ষমতা ও সঙ্কীর্ণতা সেখানেও সঙ্গে লইয়া যান না কেন, বলিয়া দোষ দেওয়া চলে; কেন না, কবিজীবন ও ব্যক্তিজীবন এই দুইয়ের সামঞ্জস্য উভয় প্রকারেই হইতে পারে।

কাব্যের মধ্যে বাস্তব-মুক্তি আছে। জীবনে যে বাধা কবি-স্বর্গে সে বাধা নাই। সে-স্বর্গে কবি একেশ্বর, সেখানে তিনিই স্রষ্টা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান। সে স্বর্গ তাঁহার মনের মত করিয়া রচিত, কোথাও তাঁহার ইচ্ছা-শক্তির বাধা নাই। তিনি যাহা চান তাহাই হইবে; যেমন করিয়া সাজাইতে চান, যেমন করিয়া দেখিতে চান, তেমনি হইবে—জড় ও চেতন সর্ব্ববস্তু তাঁহার আদেশ মানিয়া চলিবে। কবির যখন বাসনা হয়—

মেয়েটি মোর আগ্‌বাড়ায়ে
দাঁড়িয়ে রবে দ্বারে,

দোপাটি-ফুল খোঁপায় পরে',
সাঁঝের আঁধিয়ারে ;
কাজল-দেওয়া চক্ষু ছুটি
আদর-দোলে উঠ্‌বে ফুটি'
ফণী-মনসার বেড়ায় ঘেরা
দুর্গা-দীঘির ধারে।
শিউলি-ফুলের গন্ধে যাবে
সন্ধ্যাখানি ভরে,'
জ্যোৎস্নাধারা পড়বে ঝরে',
দূর দেউলের 'পরে ;
অঙ্গ মাজি' দুধের সরে,
ঘাটটি হ'তে ঘটটি ভরে',
সইয়ের সাথে গৃহিণী মোর
আস্‌বে ফিরে ঘরে।

—তখন তাঁহার কামনা অপূর্ণ থাকে না। দোপাটি ফুল সময় না হইলেও ফুটিবে, ঘরে কাজল-পরা শিশুকন্যা না থাকিলেও দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইবে, শিউলি-ফুলের গন্ধ ও জ্যোৎস্নাধারা মেঘ-বাদলে আচ্ছন্ন হইবে না ; ঘাট হইতে ঘট ভরিতে গিয়া গৃহিণীর পা পিছলাইয়া ঘট ভাঙ্গিবে না, সইএর সাথেও কলহ হইবে না—তিনি সুস্থদেহে ও সুস্থমনে, পল্লীপথে সিক্তপদপল্লবের আলিপনা আঁকিয়া স্মিতমুখে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

এই অধিকার কবির আছে। আবার কবিশক্তির গৌরব ও বিশেষত্ব এই যে, পাঠককেও কবি এই অধিকার দিতে পারেন। কবির এই স্ফূর্ত্তি পাঠকের মনেও সংক্রামিত হয় ; কবিতা পাঠ করিবার সময়ে বা গান গাহিতে গাহিতে আমরা অনায়াসে এই চেতনা-লোকে বিহার করি, আমরাও এই উচ্চ সত্তায় যেন কতকটা স্বত্ববান্ হই। ইহাই কবির প্রধান কৃতিত্ব, এই জন্যই আমরা কবির নিকটে ঋণী। ইহার দ্বারা বুঝা যাইবে, কাব্যের ভিতর দিয়া কবির সঙ্গে যে পরিচয়—সে কতকটা আত্ম-পরিচয়ই বটে। কারণ, আমার ভিতরে যে রসবোধ আছে, কবি তাহাই উদ্বুদ্ধ করেন—তাহার মধ্যে দিয়া আমি আমারই পরিচয় পাই। কবিকল্পনার ইন্দ্রজাল বস্তুজগৎকে আমার মনোরম মূর্ত্তিতে প্রকটিত করিয়া আমার মধ্যে আমারই নিগূঢ় সত্তার

যেন সাক্ষাৎকার ঘটায়। আমার প্রাণের অবাধ স্ফূর্তি—আমার চিত্তের চমৎকার বিধান করিয়া, আমার মধ্যে যে উদার বৃহৎ 'আমি' রহিয়াছে তাহাকেই মুক্ত করিয়া দেয়। এই আত্মোপলব্ধিই কাব্যের অভিপ্রায়।

কাব্যের মধ্য দিয়া কবির সঙ্গে পাঠকের এই পরিচয়, তথা আত্মপরিচয়—ইহাই কাব্য-পরিচয়ের ভিত্তি। এই পরিচয়ের মূলতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হয়ত যাইবে না, তথাপি আমি সেই দুঃসাহস করিব। আমার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে, বিষয়টি শেষ পর্য্যন্ত দুরূহই থাকিয়া যাইবে। তথাপি যদি সহৃদয় পাঠক কেবল তর্কবুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া মর্ম্মগ্রাহী হইবার চেষ্টা করেন তবে সফল হইতেও পারি।

কাব্যের ভিতর কবিচরিত্র সন্ধান করিতে গিয়া একটা কথাই বার-বার ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসিয়া পড়িয়াছে যে, কবি-মানুষটির ব্যক্তিগত বিশিষ্ট রূপটি কাব্যের মধ্যে না ফুটিবারই কথা, তাঁহার ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-জীবনের পরিচয় না থাকাই সঙ্গত। এই ব্যক্তি-জীবনের সঙ্কীর্ণতা থাকে না বলিয়াই জগৎ ও জীবনের আসল রূপটি তিনি দেখিতে পান। এই 'দেখা', এই কবি-দৃষ্টিই সত্যদৃষ্টি—ঋষির মন্ত্র-দৃষ্টির মত। কাব্যে উপন্যাসে জীবনের যে চিত্র আমরা পাই, তাহার মধ্যে একটা অত্যন্ত সরল সহজ ও তীক্ষ্ণ সত্যবোধ জাগে বলিয়াই আমরা আনন্দ পাই। সত্যের এই মূর্ত্তি সুন্দর না হইয়া পারে না বলিয়াই তাহা সুন্দর। কারণ, যে প্রতীতি সম্যক্ বা সম্পূর্ণ—সমস্ত সংশয়-সংস্কারের বাহিরে যাহার সঙ্গে পরিচয় হয়, সেই ত' আনন্দ। সুন্দর-বোধ ও আনন্দ একই কারণে হয়। যে কাব্যে এই সত্য-সুন্দরের বোধ এমন করিয়া জাগে না, সে কাব্যের প্রেরণা অসম্পূর্ণ বুঝিতে হইবে। কবির এই সত্যদৃষ্টিই কাব্যের প্রাণ। সুন্দরকে ফুটাইয়া তুলিতে পৃথক আয়াস করিতে হয় না, যাহা সত্য তাহা অনিবার্য্যরূপেই সুন্দর। বরং যেখানে সুন্দরকে ফুটাইবার একটা চেষ্টা লক্ষিত হয়, সেখানে সত্যের অভাব আছে বলিয়াই মনে হইবে। কাব্যে জীবনের কোনও fact-ই রঞ্জিত বা রূপান্তরিত হয় না, গভীরতমরূপে সত্য হইয়া উঠে।

এখন প্রশ্ন উঠিবে, সত্য কি? সত্য আর যাই হোক, তাহা বিজ্ঞানের থিয়রি, ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন বা দর্শনের মতবাদ নয়। সত্য একটি চিন্তাগত ধারণা নয়, তাহা মনুষ্য-হৃদয়ের একটি অতি ঘনিষ্ঠ অনুভূতি। সত্যের একটি

প্রমাণ এই যে, তাহাকে পাইলে কোনোখানে আর কোনও সংশয় থাকে না। 'জানা' বলিতে আমরা সর্ব্ববস্তুর সম্বন্ধে—কি ? বা, কেন হয় ?—এইরূপ একটা কৌতূহল-তৃপ্তি বুঝি, কিন্তু তাহাতে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না; মনের স্বাচ্ছন্দ্য হয় ত' হয়,—এমন কি সর্ব্ববস্তুর উপর ক্রমান্বয়ে মনের অধিকার বিস্তার করায় একটা আত্মগৌরব জাগে—কিন্তু সংশয়ের শেষ হয় না। কারণ, সর্ব্বত্রই পৃথকভাবে কৌতূহলতৃপ্তি হয়—কোনটির পরিচয়েই সমগ্রতাবোধ জাগে না। এই সমগ্রতাবোধ মনের ধর্ম্ম নয়; মন সর্ব্বকে খর্ব্ব করে, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র করিয়া পৃথক করিয়া দেখে, সেজন্য সে-দেখায় পূর্ণদৃষ্টির আনন্দ নাই। 'To know all is to pardon all' (জ্ঞান সম্পূর্ণ হইলেই তিতিক্ষা আসে)—এই উক্তিতে যে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ দিব্যানুভূতি, তাহাই সত্যোপলব্ধি। তাহার লক্ষণ—সর্ব্বসংশয়ের সমাধান নয়, সর্ব্বসংশয়ের তিরোধান। ইহাকে কেবলমাত্র মনের দ্বারা লাভ করা যায় না। কেবল মন লইয়াই মানুষ নয়। যাহা কিছু লইয়া মানুষের মনুষ্যত্ব—তাহার ভিতরকার সেই সমগ্র রহস্যটি—তাহার সবখানি যখন সজাগ হইয়া ওঠে, তখনই এই সত্যচেতনা সম্ভব হয়। অতএব বলিতে হইবে, দেহ-চেতনা, হৃদয়-বেদনা ও মানস-ক্রিয়া এই তিনের পূর্ণ-পরিণতি ও সামঞ্জস্য না ঘটিলে—প্রত্যেকটি পূর্ণ-বিকশিত অথচ পরস্পরের অনুগত না হইলে, এই সত্যের সাক্ষাৎকার অসম্ভব। এ অবস্থা যে কখন কেমন করিয়া ঘটে, তাহাই মানবের চিরবিস্ময়। ইহারই সাধনাকে লক্ষ্য করিয়া গুরু উপদেশ করেন যে, তাহা—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া

ঋষি ইহারই উদ্দেশে বলিয়াছেন—

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ

—যাহাকে তিনি আপনি বরণ করেন, সেই তাঁহাকে লাভ করে।—তিনি কাহাকে বরণ করেন ? সেই ভাগ্যবান কে ?

আদিকাল হইতে তিনি কবিকেই বরণ করিয়া আসিতেছেন। কবি তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাহার প্রমাণ,—তিনি অপরকেও তাহা দেখাইতে পারেন। বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে নাস্তিক, দর্শন তর্ক-বিচারের দুর্ভেদ্য জালে জড়িত; ভক্ত বলেন বটে, 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর'—কিন্তু সে বিশ্বাস তাঁহার নিজেরই থাকে, অপরের মনে জাগাইতে পারেন না। একমাত্র কবি যাহা

দেখেন, অপরকেও তাহা দেখাইতে পারেন, এজন্য সাহিত্যই প্রকৃত জ্ঞানের উপায়, সাহিত্যের জ্ঞানযোগই উৎকৃষ্ট।

কবির এই সত্য-দৃষ্টির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যাহা বাস্তব-জীবনে পীড়া-দায়ক, তাহাই কাব্যের ইন্দ্রজালে মনোহর; অথচ তাহাকে একটুও অযথার্থ বা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না—অন্ততঃ যতক্ষণ তাহা পাঠ করি, যতক্ষণ কাব্যের বাহিরে না আসি। ইহাতেই বুঝিতে পারি, এ দেখা আর এক রকমের দেখা। যে-দেখায় নিজ-নিজ ব্যক্তি-জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডী ও নানা সংস্কারের বাধা আছে, সেই দেখাই সত্যকার দেখা নয়; সেখানে স্বার্থ ও স্বাভিমানের বিরোধ আছে বলিয়াই সবটুকু চোখে পড়ে না। যখন সবটুকু চোখে পড়ে তখনই সামঞ্জস্য বুঝি, তাই সঙ্গে-সঙ্গে সুন্দর-বোধ হয়। সত্য-সুন্দরের এই অদ্বৈততত্ত্ব ঘোষণা করিয়াই ইংরাজ কবি কীট্‌স্‌ তাঁহার সেই বিখ্যাত বাণী প্রচারিত করিয়াছিলেন—

Beauty is truth, truth beauty,—that is all
Ye know on earth, and all ye need to know.

"যাহা সুন্দর তাহাই সত্য, সত্যই সুন্দর—মানুষের জ্ঞান ইহার অধিক হইতে পারে না, হইবার প্রয়োজনও নাই।"

—এই বাণীর অন্তরালে সাহিত্য-বিজ্ঞানের শেষ কথাটি রহিয়াছে। ইহার অর্থ বিশদ করিয়া বুঝিতে বা বুঝাইতে পারা যদি সম্ভব হয়, তবে সাহিত্যকে যে অভিনব জ্ঞানযোগ বলিয়াছি তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না।

কবি-প্রতিভায় এই জ্ঞানযোগের একটি প্রণালী আবিষ্কার করা যায়। যাহা কিছু কবিচিত্তকে স্পর্শ করে, কবির অন্তরতম অনুভূতিতে কবি যেন তার সঙ্গে এক হইয়া যান—কবি যেন তাহারই রূপ ধারণ করিয়া, তন্ময় হইয়া, তাহাকে প্রকাশিত করেন। ইহাই কবির একমাত্র জ্ঞানবৃত্তি; ইহারই ইংরেজী নাম Imagination, দেশী নাম প্রতিভা বা প্রজ্ঞা। এই বৃত্তিদ্বারা কিছু জানিতে হইলে তাহা 'হইতে' হয়। কবি কোনও কিছুকে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করেন না, তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া, তাহার সত্তায় নিজ সত্তা মিলাইয়া তন্ময় হইয়া—তাহার রূপটি আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। এইরূপ আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতা আত্ম-বিস্মৃতি না হইলে হয় না। এইরূপ আত্ম-বিস্মৃতি না

হইলে, যাহা শ্রেষ্ঠ অনুভূতি—সেই আত্মোপলব্ধি বা সত্যজ্ঞানের উদয় হয় না। এই অবস্থার আনন্দ স্মরণ করিয়া কবি কীট্‌স্ বলিতেন—

"O for a life of sensation rather than of thought!"

[আমি কেবল দেহে-প্রাণে অনুভব করিতে চাই, বিচার করিতে চাই না।]

এই আনন্দের লোভেই আমাদের দেশের ভক্তেরা বলিয়া থাকেন, "আমার দে মা পাগল করে', আমার কাজ নেই জ্ঞান-বিচারে!" এই উপলব্ধিকেই কতকটা চিন্তার আকারে ব্যক্ত করিতে গিয়া আমাদের কবি গাহিয়াছেন—

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে
চারিদিকে চির-যামিনী।
অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।

কবি এখানে সেই আত্মবিস্মৃতির অবস্থাকে কতকটা ধারণা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; সেই দিব্যজ্ঞানের অবস্থাকে সজ্ঞান চেতনায় জ্ঞাপন করিতেছেন।

একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির-যামিনী।

এবং

অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,

এই দুইটি বাক্যের একটিতে বাহ্যজ্ঞানলোপের, ও অপরটিতে পূর্ণজ্ঞানের যে আনন্দ, তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে, এই সকল উক্তিতে ইঙ্গিত মাত্র আছে; যিনি এই রসের আস্বাদন করিয়াছেন তিনিই ইহা বুঝিতে পারিবেন, অপরে পারিবেন না। এই সকল শ্লোক ঠিক কাব্য নয়—ইহা ঋষির মন্ত্রোচ্চারণ। আর একটি কবিরও এই ধরণের সাক্ষ্য এখানে উদ্ধৃত দিলাম। গান শুনিতে শুনিতে কবি বলিতেছেন—

পিয়ে ও সঙ্গীত-মধু আমার মানসী-বধূ
আহ্লাদে উন্মুখ আজি, উর্দ্ধ করি কাণ।
বধিরতা সারিয়াছে, আত্মা মোর বুঝিয়াছে
রূপ রস স্পর্শ গন্ধ একই উপাদান!
পুষ্প, জ্যোৎস্না, প্রেম, গান এক সেতারের তান!
গেয়ে যাও, থেম না ক, গেয়ে যাও গান,
তোমার সাজে না সখি মিছে অভিমান।

সৃষ্টির মর্ম্মস্থানে যেখানে সর্ব্ববৈচিত্র্য এক হইয়া আছে, সেখানে পৌঁছিতে পারিলে, কোন বৈচিত্র্যই আর ভেদবুদ্ধি জাগাইয়া, চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয় না; জ্ঞান অনুভূতিমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, কোনোখানে আনন্দের বাধা থাকে না—সর্ব্বত্র বিরোধ ঘুচিয়া সর্ব্বাত্মীয়তা জন্মে। বহিঃসৃষ্টি একেবারে কবির অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে, কবি তন্ময় হইয়া যান। তখন আর কথা থাকে না, ভাব তখন রূপ হইয়া বিরাজ করে—কবি কথা বল্লেন না, রূপসৃষ্টি করেন। এই সময়ে ভাব যদি রূপের সহিত লুকোচুরি খেলিতে থাকে—কবি যদি রূপ-রসের পরিবর্ত্তে ইঙ্গিতরসে মজিয়া যান তবে সে অবস্থায় কি হয়, তাহারও সাক্ষ্য আছে—

মনে হল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি',
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি'।

কিন্তু খাঁটি কাব্যসৃষ্টিতে এই তন্ময়তাই অসাধ্য-সাধনের একমাত্র উপায়। কবি কীট্‌সেরই একটি কথায় এই তন্ময়তার অতি সুন্দর উদাহরণ আছে। কীট্‌স্ একবার বলিয়াছিলেন, "আমার সম্মুখে ওই যে পাখীগুলা নাচিয়া নাচিয়া খাদ্য খুঁটিয়া বেড়াইতেছে—উহাদের পানে চাহিবামাত্র আমি যেন আমাকে ভুলিয়া যাই, আমি যেন উহাদের মত নাচিয়া নাচিয়া ওই রূপ করিয়া বেড়াই।" তিনি পাখী দেখিতে দেখিতে পাখী হইয়া যান! এই দেখিয়া-হওয়াকেই আমি কবির জ্ঞান-বৃত্তি বলিয়াছি। এইরূপ অনুপ্রবিষ্ট হইবার ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে বলিয়াই কবি যেমন দেখাইতে পারেন, সাধারণ ব্যক্তি নিজে তেমন করিয়া কিছুই দেখিতে পায় না। মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ারের এই ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় ছিল বলিয়াই, তিনি অপরের মধ্যে এইরূপ অবাধে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারিতেন বলিয়াই, মানুষের সমগ্র মনুষ্যত্বকে এমন সত্য-স্বরূপে প্রকটিত করিতে পারিয়াছিলেন।

এই জ্ঞানযোগ বিজ্ঞানের নয়, দর্শনেরও নয়। ইহা প্রকৃত রসানুভূতির অবস্থা। এ অবস্থায় সকল বিরোধ ঘুচিয়া যায়, কোনো সমস্যাই থাকে না—'অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি'। এ অবস্থায় জ্ঞানী ও জ্ঞেয় (Subject and Object) এই দুইএর ভেদ আর থাকে না,—ইহা 'বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য' ব্রহ্মাস্বাদের অবস্থা। যাঁহারা ইহার একটু আস্বাদ জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন—ইহাই আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার কিনা। যাঁহাদের এই আস্বাদন-ক্ষমতা নাই, তাঁহারা কাব্যজগৎ ও ব্যবহারিক জগৎকে পৃথক করিয়া রাখিবেন, কাব্যপাঠের পর তাহার চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়া উঠিবেন—A superior pyrotechnic ! সুন্দর আতসবাজী ! ইহাতে সমাজের কোনও বাস্তব উপকার সাধন হয় না, ইত্যাদি।

কিন্তু জ্ঞানকে যাঁহারা আনন্দরূপে চান, যাঁহারা সত্যসুন্দরের মূল-রহস্যটি ধরিতে পারিয়াছেন বা ধরিতে উৎসুক—তাঁহারা কবির সঙ্গে সঙ্গে এই তন্ময় হওয়ার সৌভাগ্যকেই শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বলিয়া জানেন। তাঁহারা এই জ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান বলিবেন। এই জ্ঞান কাব্যে ভিন্ন ফুটিতে পারে না, যেখানে যেরূপ ফুটিয়াছে তাহাই কাব্য, কাব্য ব্যতীত আর কোথাও এই সত্য-সাক্ষাৎকার হয় না। ইহার ধারণা দর্শন করাইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা ধারণা নয়—আস্বাদন করিবার বস্তু। তাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ইহা আস্বাদন করাইতে গিয়া বহুল পরিমাণে কাব্যের আশ্রয় লইয়াছেন, বৈষ্ণবদর্শন সাহিত্যের সঙ্গে একাকার হইয়া গিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী যাহার রূপক, তাহা এই সাহিত্যসাধনারই মূলতত্ত্ব। যে আত্মবিস্মৃতি ও তন্ময়তার শক্তিকে কবির প্রজ্ঞা বলিয়াছি—যাহার সাহায্যে কবি অপরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, তদনুরূপ হইয়া, তাহাকে পাওয়ার পূর্ণ আনন্দ ভোগ করেন, বৈষ্ণব কবি রাধার প্রেমযোগের মধ্যে সেই রহস্যটি আবিষ্কার করিয়াছেন—তাহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত কাব্য-রচনায় কেমন ফুটিয়াছে !—

সঙ্কেতবংশী বাজিলেই বনে যাইতে হইবে, অতএব রাধা সমক্ষে দর্পণ রাখিয়া ইতোমধ্যে বেশভূষা তিলকাদি রচনা করিতেছিল। কিন্তু ধ্যান আছে কৃষ্ণে। দর্পণে নিজমুখ দেখিতে দেখিতে বাঁশী শুনা গেল। সচকিত রাধা সহসা দর্পণে কৃষ্ণমুখ দেখিল—নিজমুখপ্রতিবিম্ব না দেখিয়া কৃষ্ণমুখ দেখিল। আর কেহই দর্পণে এরূপ অলৌকিক দর্শন করে না, করে নাই, করিবে না।

আমরা বলি, কবির প্রাণই রাধা। আবার এই রাধাকে যে সৃষ্টি করিয়াছে সেও কবি। এই তন্ময়তা কবিরই আছে, আর কাহারও নাই। এই রাধা অপেক্ষাও কবিচিত্ত বড়; কারণ, সেই ত' রাধার একমাত্র লীলা-নিকেতন। কবির প্রতিভাগুণেই, কাব্যের সাহায্যে, রাধা সর্ব্বজনমনোমোহিনী হইয়া ওঠে।

২। কবিত্ব ও কবিধর্ম্ম

কাব্যে কবির ব্যক্তি-জীবনের পরিচয় নাই—এইরূপ কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিবে, কবি যাহা লেখেন তাহা যখন তাঁহার অন্তরতম অনুভূতির প্রকাশ, তখন কাব্যে কবি-মানুষটির গূঢ় প্রকৃতির লক্ষণ কিছু থাকিবে বৈ কি। উত্তরে বলিব, কাব্যে কবি-মানুষটির পরিচয় না থাকিলেও তাহার বিশিষ্ট কবি-প্রকৃতির পরিচয় নিশ্চয়ই থাকিবে। প্রত্যেক কবির ভাব ও ভাবনার রূপটি কিছু স্বতন্ত্র—সত্য-সুন্দরের একটা ব্যক্তিগত আদর্শও থাকে। এজন্য প্রত্যেক কবির ভাষা ও ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু থাকে যাহা সেই কবির নিজস্ব। এই মৌলিকতাই শক্তিমানের লক্ষণ, এবং ইহারই মধ্যে কবির কাব্যগত বিশিষ্ট ব্যক্তি-পরিচয় খুঁজিতে হইবে। রবীন্দ্র-নাথের কাব্যে আমরা যে বাংলাভাষা পাইয়াছি, তাহার পূর্ব্বে আর কোথাও ঐরূপ ভাষা ছিল না—সে একটি অভিনব রীতি, তাহাকে একটি নূতন ভাষা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শেক্‌স্‌পীয়ারের ভাষা আর কোনরূপ হইতে পারিত না, প্রাচীন ভঙ্গিটুকু ছাড়িয়া দিলেও সে ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা, তাহা যেন সাধারণ ইংরেজী ভাষা নয়—শেক্‌স্‌পীয়ারের ভাষা। ভাষা, ভাব ও ভঙ্গিতে প্রত্যেক কবির স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া ওঠে। একই বিষয়ে দুই বা ততোধিক কবির রচনা পাঠ করিলে ইহা সহজে উপলব্ধি হইবে। ইংরেজীতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলী উভয়েরই 'স্কাইলার্ক'-পাখীর উদ্দেশে লিখিত কবিতা আছে—এই একই উপলক্ষে দুই কবির কল্পনা দুইটি বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। আমাদের কাব্য-সাহিত্যে 'তাজমহল' লইয়া অনেক কবিই কবিতা রচনা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা সকলেরই পরিচিত, এই সঙ্গে আর দুই একজন কবির রচনা পাঠ করিলেই কবিকল্পনার বৈশিষ্ট্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। অবশ্য এরূপ বিচারে ইহাও দেখিতে হইবে যে, তুলনাধীন কবিতায় কবির নিজস্ব কাব্যপ্রেরণা পূর্ণস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে কিনা। রবীন্দ্রনাথের 'উর্ব্বশী' কবিতাটিতে সে যুগের রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টির একটি প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ ঐ একই ছন্দে কবিজীবনের আরাধ্যা আদর্শ-দেবতার স্তুতি করিয়াছেন। উভয় কবিতা হইতে কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—ভাষার ভঙ্গি ও ভাবনার প্রকৃতি উভয়ের কত স্বতন্ত্র, উভয়ের কল্পনায় কত প্রভেদ! রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ঊর্দ্ধতম লোকে দেশকালের অতীত পরম-রহস্যময়ী সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর বন্দনা করিতেছে—

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্ব্বশি!
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা!
মুক্তবেণী বিবসনে! বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।
অখিল মানসস্বর্গে অনন্তরঙ্গিণী,
হে স্বপ্নসঙ্গিনি!

—কবির অন্তর-বিশ্বে কামনা-শতদলে যিনি বিরাজ করিতেছেন, এখানে আমরা তাঁহারই একটি রূপ দেখিতে পাই। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে 'মহাসরস্বতী'-রূপে কল্পনা করিয়া আরতি করিয়াছেন,—

ভূলোকে ভ্রমর-গর্ভ শুভ্র-নীল পদ্ম-বিভূষণা;
হংসারূঢ়া—ময়ূর-আসনা।
তুমি মহাকাব্য-ধাত্রী। মহাকবিকুলের জননী।
কখনো বাজাও বীণা, কভু দেবী! কর শঙ্খধ্বনি,
উচ্চকিয়া উদ্দীপিয়া; চক্র-শূল ধর ধনুর্ব্বাণ;
হলবাহী কৃষকের ধরি' হল কভু গাহ গান,—
পুলকি' পরাণ;—
সর্ব্ব-বিদ্যা-বার্ত্তা-বিধি দেখিতে দেখিতে
গড়ি' উঠে গীতে।

* * *

লক্ষ কোটি চিত্তে প্রাণে অলক্ষিতে বিহর' আপনি
বুলাইয়া দাও স্পর্শমণি।
নবীন উষার তরুণ অরুণে থাকি'
গগনের কোণে মেলি পুলকিত আঁখি,
সমুদ্র মূর্চ্ছনা আর হিমাদ্রি 'অচল ঠাট' যার
হে মহাভারতী দেবী! গাহ সেই সঙ্গীত তোমার;
এস গো সত্যের উষা! অসত্যের প্রলয়-প্রদোষ।
বীণাধ্বনি-ঘণ্টারোলে যুক্ত হোক্ মূর্ত্ত রুদ্র-রোষ,
শঙ্খের নির্ঘোষ;
পুণ্যে কর মৃত্যুজয়ী, পাপে ছন্নমতি;
মহাসরস্বতী!

এই দুই কবিতায় দুইটি বিভিন্ন কবি-প্রকৃতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, উভয়ের কবি-স্বপ্নের আভাস গাঢ় অনুভূতির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অতএব প্রত্যেক কবির কবিহিসাবে যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার একমাত্র প্রমাণ তাঁহার কাব্য-প্রকৃতির এই লক্ষণ। সৃষ্টির আর সকল বৈচিত্র্যের মতন কবি-মানসও বিধাতার এক একটি বিচিত্র সৃষ্টি। সৃষ্টির কিছুই নির্ব্বিশেষ হইতে পারে না, তাই কবির যে অনুভূতি দেশকালপাত্রের সীমাকে লঙ্ঘন করিয়া স্ফূর্ত্তি পায়, তাহারও একটি বিশেষ রং, বিশেষ রূপ ও বিশেষ ভঙ্গি আছে। যে কবি-প্রতিভা নিয়তিকৃতনিয়মরহিত, তাহাই কতক পরিমাণে দেশকালপাত্রের অধীন হইয়া তবে কার্য্যকরী হয়। মহাকবিগণের কাব্য-প্রেরণা যুগকে অতিক্রম করিয়াও, সেই যুগের আশা-বিশ্বাস ধ্যান-ধারণাকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করিতে পারে না। প্রত্যেক কবির স্বপ্রকৃতি ও বহিঃ-প্রভাব—এই দুই কারণে কাব্যের বৈশিষ্ট্য ঘটে। মনে রাখিতে হইবে, এই বৈশিষ্ট্যই প্রকৃতির, তথা আর্টের, প্রধান গুণ। আবার, এ বিষয়ে প্রকৃতি ও আর্টের মধ্যেও প্রভেদ আছে—সে কথা পরে। কবি-সৃষ্টির আলোচনায় এই বৈশিষ্ট্যের কথাটাই ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে। সত্য বা আনন্দ নির্ব্বিশেষ, অথচ বিশেষের মধ্য দিয়াই যাহা কিছুর রস-বিলাস। বিশেষ ও নির্ব্বিশেষের কাব্যের মধ্যে নানাস্থানে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল উক্তির মধ্যে তাঁহাদের নিজ নিজ কাব্য-প্রেরণার পরিচয় মেলে। এগুলিকে ঠিক মত বলা

চলে না—আপনাকে আপনি নিরীক্ষণ করার মত একটা চেষ্টাই বলা চলে। এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমি কয়েকটি এইরূপ উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। প্রথমেই শেক্‌স্‌পীয়ারের সেই সুবিখ্যাত বচন—

The poet's eye in a fine frenzy rolling,
Doth glance from heaven to earth, from earth
to heaven,
And, as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation and a name.

[দিব্যোন্মাদঘূর্ণিতনেত্র কবি একবার স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে, আবার মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে তাঁহার দৃষ্টি প্রেরণ করেন; তৎকালে কবির কল্পনায় যে অজ্ঞাতপূর্ব্ব ভাবসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়, কবির লেখনী-মুখে তাহারা দেহ ধারণ করে—যাহারা বায়ুভূত শূন্যময়, তাহারাই এক একটি নাম ও ধাম লইয়া সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে।]

—ইহার মধ্যে কবিধর্ম্ম-সম্বন্ধে কবির যে অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার গূঢ় অর্থ তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যেই আছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি তাঁহার কবিধর্ম্মের পরিচয়স্বরূপ গ্রহণ করা যায়—

The moving accident is not my trade,
To freeze the blood I have no ready arts,
'Tis my delight, alone in summer shade,
To pipe a simple song for thinking hearts.

[কোনরূপ অঘটনঘটনপটীয়সী কল্পনাচাতুরী আমার নাই; মানুষকে অভিভূত করিবার বিদ্যাও আমার আয়ত্ত নহে। রৌদ্রোজ্জ্বল বসন্তদিনে প্রচ্ছায় বনতলে বসিয়া ভাবুক-জনের সমীপে দুইচারিটি সহজ সরল সুর আলাপ করাই আমার বাসনা।]

যাঁহারা শেলীর কবি-প্রকৃতির সহিত পরিচিত তাঁহারা কবি-সম্বন্ধে তাঁহার এই উক্তি স্মরণ করিবেন—

He will watch from dawn to gloom,
The lake-reflected sun illume
The yellow bees in the ivy-bloom,
Nor heed nor see what things they be ;

But from these create he can
Forms more real than living Man,
Nurslings of Immortality!

[সরোবর-জলে সূর্য্যকিরণ বিচ্ছুরিত হইয়া আইভি-কুঞ্জের উপর পড়িয়াছে; সে আলোকে আইভি-ফুলের উপর যে হলুদবর্ণ মৌমাছিরা বসিয়াছে তাহাদিগকে আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছে; যিনি কবি তিনি সারাদিন ধরিয়া মুগ্ধনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া থাকিবেন—কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ঠিক সেদিকে নাই, তথাপি তাহারই মাধুরী দিয়া তিনি যাহা সৃষ্টি করিবেন—তাহা রক্তমাংসের চেয়ে বাস্তব, তাহাই শাশ্বত ও মৃত্যুহীন।]

এই সঙ্গে কীট্‌সের সেই Beauty-Truth (সুন্দরই সত্য, সত্যই সুন্দর)-বিষয়ক বাণী এবং উপরি-উদ্ধৃত শেক্‌স্‌পীয়ারের বচনটি তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, সেই একই সত্য বিভিন্ন কবির কল্পনাদর্শে প্রতিফলিত হইয়া কেমন বিভিন্ন বোধ হইতেছে।

আমাদের কবিগণের মধ্যে বিহারীলালের উক্তি এইরূপ—

রহস্য স্বপন-বালা খেলা করে মাথার ভিতরে,
চন্দ্রবিম্ব স্বচ্ছ সরোবরে,
কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে,
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে।

* * *

ব্রহ্মার মানস-সরে
ফুটে ঢল ঢল করে
নীলজলে মনোহর সুবর্ণ নলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি' হাসি' ভাসি' যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা-যামিনী!

এই কবি-ভাষণ যে কবি-স্বপ্নের আভাস দেয় তাহা উক্ত কবির সম্বন্ধে কতখানি সত্য, তাহা বিহারীলালের কাব্য পাঠ করিলে বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ কবিধর্ম্ম-সম্বন্ধে বহুবার বহু উক্তি করিয়াছেন, একটি স্থান উদ্ধৃত করিলাম—

শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি'
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি',
পুষ্পের মত সঙ্গীতগুলি
ফুটাই আকাশভালে।

অন্তর হ'তে আহরি' বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার-ধূলিজালে।

*　　*　　*

সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।

প্রেয়সী-নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে'
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ 'পরে
শিশিরের মত রবে।

না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে,
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে—
মাগিছে তেমনি সুর;

কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু'চারিটি কথা,
রেখে যাব সুমধুর।

এই শ্লোকগুলিতে কবিধর্ম্মের যে আদর্শ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা শুধুই ব্যক্তিগত নয়, ইহাতে যাবতীয় কবির কাব্যপ্রেরণার একটি মূল উৎসের সন্ধান রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিজ কাব্য-সম্বন্ধে এই আদর্শ যে কতখানি সত্য, কাব্য-বিচারের দিক দিয়া ইহা যে কত উচ্চ, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এখানে কবি কবিত্বের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা যেমন সহজ, সরল, তেমনই যথার্থ।

কবিবর দেবেন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতিতে যে বিশিষ্ট কবিধর্ম্মের লক্ষণ আছে, তাহার পরিচয় কবি যেমন দিয়াছেন তাহা ঠিক উক্তি নয়—নিম্নোদ্ধৃত কাব্য-খণ্ডটিতে তাঁহার কবি-প্রেরণাই যেন মূর্ত্তিমতী হইয়াছে!

চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারী আমি
রূপের পূজারী !
সারাসন্ধ্যা সারানিশি রূপবৃন্দাবনে বসি'
হিন্দোলার দোলে নারী, আনন্দে নেহারি।
অধরে রঙ্গের হাস বিদ্যুতের পরকাশ
কেশের তরঙ্গে নাচে নাগের কুমারী !
বাসন্তী ওড়না সাজে প্রকৃতি-রাধিকা সাজে,
চরণে ঘুঙ্ঘুর বাজে আনন্দে ঝঙ্কারি' !
নগনা দোলনা-কোলে মগনা রাধিকা দোলে
কবিচিত্ত-কল্পনায় অলকা উধারি'—
আমি সে অমৃত-বিষ পান করি অহর্নিশ
সংসারের ব্রজবনে বিপিন বিহারী !

আর এক স্থানে কবি তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীর উদ্দেশে বলিতেছেন—

এইরূপে নিত্য তুমি নব নব বেশে,
হে অপূর্ব্ব কুহকিনী, হে বহুরূপিণী !
কল্পনারে করি' জয়, সত্যের মন্দিরে
দেখাইতে ছায়াবাজী ! কঙ্কাল হইতে
সৃজিতে অপ্সরীমূর্ত্তি ; দাবদগ্ধ বনে
সৃজিতে অলকাপুরী, আনন্দনগরী !
পান করি' হলাহল নীলকণ্ঠ যথা
বাঁচাইলা বৃন্দারকে, হায় গো তেমতি
মৃত্যুর উৎসঙ্গে বসি', হে করুণাময়ী !
নিরক্ত অধর-ওষ্ঠে চুম্বিয়া সুধীরে
শুষিতে বিষাক্ত ক্রূর ফেনপুঞ্জরাশি !
দুই ধারে মরণের পঞ্জর হইতে
ঝটপট ইন্দ্রধনু-পালক প্রকাশি'
জীবনের যুগ্মপক্ষ দেখা দিত, মরি !

উপরি-উদ্ধৃত কবিতাগুলির মধ্যে যে সপ্রতিভ কবি কল্পনার পরিচয় আছে, তাহা হইতে প্রত্যেক কবির বিভিন্ন আদর্শের বা বিশিষ্ট কল্পনাপ্রকৃতির অনুমান হয় ; কিন্তু কোনটিকে কবিবিশেষের একটি creed বা মত-বিশ্বাস বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয়, কবিগণের সকলের অল্পবিস্তর আত্মচেতনা আছে, স্বধর্ম্ম-সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে। এইরূপ

কবি-বচনকে যদি আত্মসমালোচনাও বলা হয়, তবে সেগুলিকে সেই মূল্যই দিতে হইবে,—তাঁহাদের কাব্য সম্বন্ধে অপরাপর সমালোচকের মতের যাহা মূল্য, তাহার অধিক মূল্য দেওয়া যাইবে না। কিন্তু এগুলি যে ঠিক সমালোচনা নয়, তাহার প্রমাণ—এগুলিতে কোনও বিচারবুদ্ধি নাই, এগুলি কবিগণের নিজ নিজ অনুভূতির অভিব্যক্তি মাত্র। কবি যখন বলেন,

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়—

তখন সেরূপ উক্তির মধ্যে যে সুদৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাকে কবিধর্ম্ম না বলিয়া একটা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথা মনে করা উচিত। কারণ কাব্য পাঠ করিবার সময় সর্ব্বত্র উহার মনে রাখার প্রয়োজন হয় না। কবির এইরূপ ব্যক্তিগত বিশ্বাসের পরিচয় অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া গেলেও, উহা যে কবিসৃষ্টির বহুবিচিত্র প্রেরণায় একটি সজ্ঞান উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ের মত কার্য্য করে, এমন বিবেচনা নিতান্তই নিরর্থক। কবির যদি কোনও বাণী থাকে, তবে তাহা যুক্তি-বিচারের দাবী মিটাইয়া বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য নহে; তাহা একটু অহেতুক—এমন কি অযৌক্তিক আনন্দের নিদান। এজন্য কবির যদি কোনও মত থাকে, কাব্যপাঠকালে সেই মতটিকে সম্মুখে না ধরিয়া, যদি আবশ্যক হয়, কাব্যেরই আলোকে সেই মতের মূল্য নিরূপণ করা অন্যায় হইবে না। দর্শন, বিজ্ঞান বা নীতিশাস্ত্রের কোনও তত্ত্ব যদি কবির কবিতার মধ্যে উঁকি দেয়, তবে তাহারও তত্ত্বহিসাবে কোনও মূল্য নাই—এবং সেই সকল মত যদি সুচিন্তিত না হয়—এমন কি সঙ্গতিহীন হয়, তাহা হইলেও কাব্যের কোনও ক্ষতি হয় না। রবীন্দ্রনাথের "হে বিরাট নদী" কবিতাটির মধ্যে একটি সুপরিচিত দার্শনিক চিন্তার ইঙ্গিত আছে, কিন্তু এখানে তাহা কেবলমাত্র কাব্যপ্রেরণায় আবেগ সঞ্চার করিয়াছে। এজন্য কবিতাটির রস-উপভোগের জন্য দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা অনাবশ্যক, এবং কবিকে কোনও একটি দর্শনপন্থার পথিক বলিয়া স্থির করা নিতান্তই হাস্যকর। ইংরেজ কবি শেলীর কাব্যগুলিতে ন্যায় নীতি, সত্য ও স্বাধীনতার উগ্র অনুভূতির মধ্যে যে মতবাদ রহিয়াছে, তাঁহার Prometheus Unbound কাব্যের মূল্য সেই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাঁহার Millennium-স্বপ্ন একটা স্বপ্নই, সেই স্বপ্নের মূল্য এই যে, উহা তাঁহার কবি-কল্পনার আহ্লাদিনী শক্তি; এই স্বপ্ন তাঁহার কল্পনা সমুদ্রের একটি তরঙ্গ, এই তরঙ্গের আঘাতে কবিচিত্ত কতই না দুলিয়াছে! তাঁহার Epipsychidion-

এর মূলে প্লেটোর যে তত্ত্বকথাই থাক, আমরা তাহা মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বাস না করিয়াও ঐ কবিতার অপূর্ব্ব কবি-প্রেরণায় মুগ্ধ হই। Adonais-এর শেষ কয়টি শ্লোকে যে নক্ষত্র-লোকের রাগিণী ধ্বনিয়া উঠিয়াছে তাহা পড়িয়া কোন-কালে কোন তত্ত্বকথা মনে আসে না। বরং আমরা তখনই যদি পড়ি—

On a poet's lips I slept
Dreaming like a love adept,

ইত্যাদি,—তবে কবির কথায় আশ্বস্ত হই, কবির স্বরূপ দেখিয়া সকল আশঙ্কা নিরস্ত হয়।

অতএব কবিধর্ম্ম বলিতে কবিত্বই বুঝিতে হইবে। কবির কোনও খেয়াল, স্বপ্ন বা মতবাদ যদি কাব্যের মধ্যে উঁকি দেয় তবে তাহাকেও কাব্যের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে হইবে, তাহাকে কোনও বহির্গত নীতি বলিয়া স্বীকার করিলে তাহা কবির ব্যক্তি-ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইবে, কবিধর্ম্ম হইতে পারিবে না। কবি-মানুষটির সজ্ঞান চিন্তায় যদি তাহাও একটি বিশেষ মতবাদের মত শুনিতে হয়, কবির দিব্যানুভূতির ভাবাবস্থায় তাহা কবির একটি চিত্তবৃত্তি মাত্র।

তবে কি কবির কোনও নীতি-বিশ্বাস নাই? কবি কি ধর্ম্মহীন? তাঁহার ভাবনার কি কোনও নিয়ম-বন্ধন নাই? ইহার উত্তরে কবিকল্পনার স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা বলিবার—পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু কোনও বিধি-সংস্কারের নিয়মানুবর্ত্তিতা যদি ধর্ম্মবিশ্বাসের লক্ষণ হয়, তবে কবির কোনও ধর্ম্ম নাই। কবিচিত্ত এতই উদার, মুক্ত ও লীলাপ্রবণ যে, সাক্ষাৎ অনুভূতিযোগে যাহা কিছু তাঁহার দিব্য দৃষ্টির গোচর হয়—আনন্দের অব্যর্থ প্রমাণে, তাহাই তাঁহার নিকট সত্য হইয়া দাঁড়ায়। এই সত্য হওয়ার পক্ষে কোনরূপ মত-সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয় না, একারণ তাঁহার কল্পনাপথে কোনও বাধা নাই। কবিধর্ম্ম-সম্বন্ধে কবির এই উক্তিই যথার্থ—

যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই,
ধূলারেও মানি আপনা;
ছোট বড় হীন সবার মাঝারে
করি চিত্তের স্থাপনা;
হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,

> জীব সাথে যদি ফিরি ধরাতল
> কিছুতেই নাই ভাবনা ;
> যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
> অন্তবিহীন আপনা।

কবির সঙ্গে কাব্যের যে সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধের জন্য কবি-সৃষ্টির বৈচিত্র্যের নানা কারণ, এবং সেই প্রসঙ্গে কাব্যকলায় বিশেষ ও নির্বিশেষের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। কবির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অর্থে কবির মত-বিশ্বাস বলিয়া যদি কোনও প্রশ্ন উঠে, তবে তাহারও মূল্য কিরূপ, সে আলোচনা যথাসাধ্য করিয়াছি। তথাপি এই প্রসঙ্গে একটা দিক এখনো লক্ষ্য করা হয় নাই। কবি-প্রকৃতি বা কবিচিত্তের একটা অন্তরতর প্রভেদ আছে। কবি-প্রকৃতিতে একটা মূল প্রবৃত্তির প্রেরণা আছে—যাহার গতি ভিন্নমুখী। এইবার সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কবিত্ব বলিতে একটা সাধারণ ধারণাই সম্ভব, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, কবিত্বের উৎস প্রধানতঃ দুইটি ধারায় প্রবাহিত। একই জগৎ সকল কালে সকল কবির সমক্ষে দণ্ডায়মান, ভাবাবস্থার তন্ময়তাও সাধারণ কবিধর্ম্ম। তথাপি কাব্যপ্রেরণার প্রবৃত্তি এক নহে। কবিচিত্তকে প্রকৃতির দর্পণ বলিলেও সেই দর্পণের গঠনভেদ আছে। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে একটি অহং যুক্ত হইলে সৃষ্টি প্রেরণা জাগে। এই অহং যেন অনেকটা মজিয়া যায় বলিয়াই রসানুভূতি হয়। তথাপি কবিকল্পনায় সর্ব্বত্র অহং-মুক্তি হইতে পারে না। বরং একজাতীয় কাব্যে অহং-এর অতিরিক্ত প্রসারই কাব্য-প্রেরণার মূল কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। এরূপ কাব্যে কবির অহমিকা এতই তীব্র, কবির আত্মমোহ এতই প্রবল, যে সেখানে ‘তন্ময়তা’র স্থলে ‘মন্ময়তা’ই কবিধর্ম্ম বলিতে হইবে। কল্পনা এখানে অন্তরমুখী, কবি এখানে আপনাকেই সম্ভোগ করেন—এই জাতীয় কাব্যে কবির আপন অন্তরতম অনুভূতিই বিশ্বজনীন হইয়া উঠে ; মানুষের সঙ্গে মানুষের যে হৃদ্‌গত আত্মীয়তা তাহারই রসে একটি গভীর সহমর্ম্মিতার উদ্রেক হয়। এরূপ কাব্যপাঠে, মানুষের যে গূঢ়তম হৃদয়বৃত্তি ঘুমাইয়া আছে, তাহাই জাগ্রৎ হইয়া ওঠে। যাহা আমারই অবস্থা, অথচ স্পষ্ট গোচর নয়—যে বেদনা ব্যাকুল করে, অথচ ব্যক্ত হইয়া উঠে না—যে সৌন্দর্য্যের আভাস পাই, অথচ দেখিয়াও দেখি না—মানুষের সেই আত্মগত গূঢ়

বাসনা এইরূপ অন্তর-সন্ধানী কবির কল্পনায় জাজ্বল্যমান হইয়া ওঠে। তাই কবি বলেন—

নব-অরণ্যে মর্ম্মর-তান তুলি,
যৌবন-বনে উড়াই কুসুম-ধূলি,
চিত্তগুহায় সুপ্ত রাগিণীগুলি
শিহরিয়া উঠে আমার পরশে জাগিয়া।
নবীন উষার তরুণ অরুণে থাকি'
গগনের কোণে মেলি পুলকিত আঁখি,
নীরব প্রদোষে করুণ কিরণে ঢাকি'
থাকি মানবের হৃদয়চূড়ায় লাগিয়া।
তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যবে
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীত রবে,
লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি ক'বে
সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।

* * * *

আপনাকেই বিশ্বের কেন্দ্ররূপে উপলব্ধি করিয়া সেইখানে সৃষ্টির সকল রহস্যকে সাক্ষাৎকার করিয়া অপার বিস্ময়ে অভিভূত কবির আত্মস্ফূর্ত্তি সকল যুগের কাব্য-সাহিত্যেই অল্পবিস্তর আছে। কাব্যে কবিমাত্রেরই এই আত্মবশ্যতা অবশ্যম্ভাবী; এবং এই কারণেই প্রায় কোনও কাব্যই সম্পূর্ণ 'আত্মভোলা' হইতে পারে না। তথাপি,

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরীমৃগ সম—

এমন কথা সকল কবির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খাটে না—আর একরূপ কবি-প্রবৃত্তিও আছে। অন্তর ও বাহির, কবি-মানস ও জগৎ, 'অহং' ও প্রকৃতি—এই দুইয়ের যুগপৎ লীলা কাব্যসৃষ্টিতে প্রকটিত হয়। এজন্য কাব্যবিচারে এই দ্বন্দ্বের একটি বা অপরটিকে অবলম্বন করিয়া শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব নয় বটে, তথাপি সমগ্র কাব্য-সাহিত্যে এই যমজ প্রবৃত্তির মিলিত-ধারা গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের মতই পৃথক চিহ্নিত করা যায়। কোনও কবির কল্পনা বিশেষ করিয়া ভাবপ্রধান ও আত্মধর্ম্মী, কাহারও কল্পনায় আত্মবিস্মরণী নাটকীয় প্রবৃত্তির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আপনার অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগই যেখানে কাব্যের মূল প্রেরণা,

সেখানে বাহিরের ঘটনা বা বস্তুবিশেষের বর্ণনাই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য নয় ; কাব্যবস্তু যাহাই হউক, অন্তরের আবেগেই তাহা মহীয়ান, সেখানে ভাষা— বস্তুগত অর্থের গৌরবে নয়—গানের সুরে রূপান্তরিত হইয়া কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। আর এক জাতীয় কবি-কল্পনা আছে। তাহাতে কবি আত্মমুগ্ধ নহেন ; আপনার অন্তর-কাহিনীর পরিবর্ত্তে বহিঃসংসার—বাহিরের মানব-জীবনের রহস্য-বিস্ময়—কবি-প্রেরণার মূল কারণ। এই দুই রকমের কবিপ্রবৃত্তি কতকটা যুগপ্রভাবের অধীন বটে, তথাপি ইহা কবিবিশেষের প্রকৃতিগত। বৈষ্ণব পদাবলী ও পরবর্ত্তীকালের কথাকাব্যে (মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র) আমরা কবি-প্রেরণার এই দুই মূল প্রবৃত্তি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতে পাই। আবার সন্ধান করিলে এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যাইবে যেখানে যুগধর্ম্মবশে, তদানীন্তন প্রচলিত আদর্শের শাসনে কবির স্বধর্ম্ম পীড়িত হইয়াছে ; যাহার প্রেরণা গীত তাহা কাহিনীর আকারে প্রকাশ পাইয়াছে, এবং যাহার প্রেরণা কাহিনী তাহাকে গানের ভঙ্গি স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই দুই ভিন্নমুখী কল্পনার বশে কাব্য-সাহিত্যে দুইটি পৃথক আদর্শের উদ্ভব হইয়াছে, তথাপি এই দুই পন্থার নামকরণে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাব্যসৃষ্টিতে এই দ্বন্দ্বের একটি লুকাচুরি খেলা চলিয়াছে দেখা যায়—কোনও কাব্যের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আত্ম-সর্ব্বস্ব বা সম্পূর্ণ বহিঃসর্ব্বস্ব হইতে পারে না। যাহা কিছু বাহিরের তাহা কবির অন্তরে প্রতিফলিত হইয়া একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিতে প্রকাশ পায় ; আবার যাহা কবির নিজস্ব আবেগ তাহাও একেবারে বহিঃসম্পর্ক-শূন্য নহে। এজন্য কবিকল্পনাকে মূলে একটি সাধারণ মানস-ক্রিয়া বলিয়া বুঝিয়াও এইরূপ ভেদ নির্দ্দেশ করা যায় যে, কাহারো প্রেরণা বহির্মুখী, কাহারো বা অন্তর্মুখী ; কোনও কবির কল্পনার প্রেরণা যোগাইয়াছে তাঁহার অন্তরের ভাবরাশি, কাহারও প্রেরণা আসিয়াছে বাহিরের রূপরাশি হইতে। কেহ বাহিরের রূপকে অন্তরের ভাবে আত্মসাৎ করেন, কেহ বা অন্তরের ভাবকে বাহিরের রূপে প্রসারিত করেন। কেহ বলেন,

'তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'

কেহ বলেন,

"আমি মনের মোহের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা।"

এই প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ কবি ও সমালোচকের মত * উদ্ধৃত করিয়া কথাটা স্পষ্ট করিয়া তুলিব।

উক্ত সমালোচক কবিকল্পনার এই দুই প্রবৃত্তির একটিকে Lyric বা Egoistic Imagination (গীতাত্মক, আত্মপরায়ণ) ও অপরটিকে Dramatic Imagination বা নাটকীয় কল্পনা নাম দিয়াছেন। নামদুইটি ইংরেজী কাব্যসমালোচনায় বহু-প্রচলিত। এই দুইজাতীয় কবি-কল্পনায় দুই ধরণের কবিদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাকে তিনি যথাক্রমে Relative Vision বা আপেক্ষিক দৃষ্টি ও Absolute Vision বা নিরপেক্ষ দৃষ্টি বলিয়াছেন। 'আপেক্ষিক দৃষ্টি'র অর্থ এই যে, ইহা একটা চশমার অপেক্ষা রাখে, অর্থাৎ যাহা দেখে, তাহাতে নিজের মনের রং অল্পাধিক মাত্রায় থাকিবেই। 'নিরপেক্ষ দৃষ্টি' অর্থে স্বাধীন অবাধ দৃষ্টি বুঝিতে হইবে। যাঁহারা নিছক গীতি-কবি তাঁহাদের এই আপেক্ষিক দৃষ্টিও অতিশয় সঙ্কীর্ণ। যাঁহারা মহাকাব্য, কাহিনী বা নাটক-সদৃশ কাব্য রচনা করেন তাঁহাদের দৃষ্টিও আপেক্ষিক। এই দুই দলের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা একটি উপমার সাহায্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। যাঁহারা গীতি কবি তাঁহাদের একটিমাত্র কণ্ঠ, এবং সেই কণ্ঠে একটিমাত্র সুর। অপর কবিগণের কণ্ঠ একটি বটে, কিন্তু সেই কণ্ঠে বিবিধ সুর খেলিতে পারে। জগতের প্রায় সকল বড় কবি—কল্পনা ও কাব্যভঙ্গি যাঁহার যেমনই হউক—সকলেই এই আপেক্ষিক দৃষ্টির অধিকারী। দ্বিতীয় প্রধান দল—যাঁহারা নিরপেক্ষ বা পূর্ণদৃষ্টির অধিকারী—তাঁহাদের কণ্ঠ একাধিক, এবং সেই বহুকণ্ঠে বহুতর সুর বাজিয়া ওঠে। ইঁহাদের সংখ্যা অতিশয় অল্প; য়ুরোপীয় কবিগণের মধ্যে শেক্‌স্‌পীয়ার, এস্কাইলাস্‌, সোফোক্লিস্‌, হোমার ও কতকটা চসারকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে।

গীতি-প্রাণ কবিদের সম্বন্ধে ইনি বলেন যে, ইঁহাদের দৃষ্টি অপর সাধারণ ব্যক্তির দৃষ্টি অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ, ইঁহারা অতিমাত্রায় আত্মসর্ব্বস্ব—বাহিরের কিছুই ইঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না; ইঁহারা যেন অন্ধ বলিয়াই গান করেন। এই সকল কবির বহির্দৃষ্টি যত সঙ্কীর্ণ, অন্তর-রাজ্য ততই বিস্তৃত। ইঁহাদের গান বড় মিষ্ট, বড় করুণ ও স্বপ্নময়।

* Encyclopaedia Britannica-য় Theodore Watts-Dunton লিখিত Poetry শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কিন্তু যাঁহাদের দৃষ্টি আপেক্ষিক হইলেও যথেষ্ট বৃহৎ ও উদার, জগতের সেই অধিকাংশ বড় কবির শক্তি একটু স্বতন্ত্র। দার্শনিক-প্রবর হেগেল বলেন— জগৎসৃষ্টিতে প্রতিবস্তুই অপর হইতে বিশিষ্ট, কোনও দুই বস্তুই একরূপ নহে; কিন্তু আর্টের সৃষ্টিতে সকল বস্তুই সাধারণীকৃত—সকলের মধ্যেই বিশেষ অপেক্ষা সামান্য-লক্ষণই প্রবল। এই কবিগণের কাব্যসৃষ্টি-সম্বন্ধে ইহাই সত্য। ইহাদের কাব্যে ব্যষ্টির বিশিষ্ট লক্ষণের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের মনোগত সমষ্টি-লক্ষণ প্রকাশ পায়; প্রত্যেকের জগৎ যে এক একটি 'অহং'-কে কেন্দ্র করিয়া বিরাজ করিতেছে, সেই 'অহং'-এর গণ্ডি ইঁহারা ভাঙ্গিতে পারেন না; স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যেমন স্বপ্নদ্রষ্টার আত্মগত কল্পনার সৃষ্টি, তাহারা যেমন স্বপ্নদ্রষ্টাকেই ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরিতে থাকে—সেইরূপ তাঁহাদের সৃষ্টির আপাতগোচর বিভিন্ন 'অহং' গুলি সেই একই 'অহং'-এর প্রতিচ্ছবি।

যাহাকে নিরপেক্ষ বা পূর্ণ দৃষ্টি বলা হইয়াছে, তাহা একেবারেই আত্ম-সম্বন্ধ-শূন্য—সে দৃষ্টির যাহা সৃষ্টি তাহার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র; তাহাদের সামান্য-লক্ষণ যেমনই হউক, এমন বিশিষ্ট লক্ষণ আছে যে, তাহাদিগকে প্রাকৃতিক সৃষ্টির মত স্বতন্ত্র ও নূতন বলা যাইতে পারে। সময়ে সময়ে আপেক্ষিক দৃষ্টিও এমন সৃষ্টি করে, যে হঠাৎ ভ্রম হয়—সে বুঝি আপেক্ষিক দৃষ্টি নয়, নিরপেক্ষ দৃষ্টি। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাগা (Saga)-কাব্য হইতে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। নায়িকার ভ্রাতৃদ্বয় তাহার স্বামীকে হত্যা করিতেছে; তাহার স্বামীর পূর্ব্ব প্রণয়িনী, উপেক্ষিতা অপর এক রমণী, এই হত্যাকার্য্যে তাহাদিগকে প্ররোচিত করিয়াছে। হত্যাকার্য্য হইয়া গেলে স্বামীর মৃতদেহের উপর অবলুণ্ঠিতা রক্তাক্তকলেবরা নায়িকার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শুনিয়া দ্বারদেশে প্রতীক্ষমাণা অপর রমণী হাসিয়া উঠিল। সেই হাসি দেখিয়া হত্যাকারীদের মধ্যে একজন তাহাকে বলিল—

> "তোর হাসি দেখিয়া ত মনে হয় না, যে তোর কলিজার শিকড়গুলাও হাসিতেছে—তাহা হইলে তোর মুখ এত পাণ্ডাশ দেখাইবে কেন?"

চিত্রটি খুব সুন্দর সন্দেহ নাই। কিন্তু ওই নাটকীয় অবস্থায় যে কোনও দুই ব্যক্তির মুখে এইরূপ কথোপকথনই সঙ্গত হইত। এজন্য এখানে কবির দৃষ্টি সাধারণে আবদ্ধ, বিশেষে নয়—ইহাও আপেক্ষিক দৃষ্টি, পূর্ণদৃষ্টি নয়। এই আপেক্ষিক দৃষ্টির দৃষ্টান্ত পূর্ণদৃষ্টির অধিকারী মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ারের কাব্যে

অনেক আছে—সে এতই চমকপ্রদ যে সহসা তাহাকে পূর্ণদৃষ্টি বলিয়াই ভ্রম হয়, এবং তাহাকে আর কোনও দৃষ্টি বলিয়া উল্লেখ করিলে সমালোচকের বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইতে পারে। 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে লেডি ম্যাকবেথের সেই বিখ্যাত উক্তি—

"রাজার নিদ্রিত মুখ আমার পিতার মুখের মত না দেখাইলে, আমি এ কার্য্য (হত্যা) করিতাম।"

—মহাকবির অতি গভীর চরিত্রজ্ঞানের পরিচায়ক; তথাপি এ লক্ষণ সাধারণ মানবচরিত্রের অন্তর্গত, এখানে কোনও বিশেষ চরিত্রের পরিচয় নাই। সত্য সত্যই একবার কোন পান্‌সীওয়ালা এক আরোহীর নিদ্রাবস্থায় তাহার সর্ব্বস্ব চুরি করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া আদালতে যাহা বলিয়াছিল তাহা ঠিক এইরূপ—"যদি উহার ঘুমন্ত মুখ আমার বাপের মুখের মত না দেখাইত, তবে উহাকে হত্যাই করিতাম।"

পূর্ণদৃষ্টির প্রেরণা অন্যরূপ। সে অবস্থায় কবির 'অহং' যেন নিষ্ক্রিয়; তাঁহার মনশ্চক্ষুতে যে ভাবমূর্ত্তি ভাসিয়া ওঠে তাহাই যেন দৈবশক্তিবলে তাঁহার কল্পনাকে চালিত করে—তাহার অতিরিক্ত বা বহির্গত কোনও চেতনা তখন আর থাকে না। তাই কাব্যে যে মূর্ত্তিটি ফুটিয়া ওঠে, তাহার ব্যক্তিত্ব এত নিখুঁত, এত স্পষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন, যে—তাহার তুলনা সে-ই; তাহা যেন আর্ট নয়, স্বয়ং প্রকৃতি। পুত্রহন্তা আকিলিসের (Achilles) হস্ত চুম্বন করিবার সময়ে হতভাগ্য বৃদ্ধ রাজা প্রিয়ামের (Priam) মুখে যে আর্ত্ত-চীৎকার শুনি, সে যে-কোনও পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ পিতার বিলাপধ্বনি নয়, সে সেই একমাত্র ট্রয়-রাজ প্রিয়ামেরই শোকোচ্ছ্বাস। ওই বিলাপভঙ্গী ঐরূপ অবস্থায়, কোপন-স্বভাব, অবুঝ লিয়ারের (Lear) মুখে মানায় না। শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক-গুলিতে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। হ্যামলেট নাটকের প্রথম অঙ্কের একটি দৃশ্য লওয়া যাক্। হ্যামলেট এই প্রথম হোরেসিওর মুখে শুনিলেন যে, তাঁহার পিতার প্রেতাত্মা দুর্গ-মধ্যে দেখা দিয়াছে। কয়েকটা দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের দ্বারা এই অলৌকিক ব্যাপার-সংশ্লিষ্ট জ্ঞাতব্য কথা জানিয়া লইয়া হ্যামলেট বলিয়া উঠিলেন, "আমি যদি সে সময় সেখানে থাকিতাম!" ইহার উত্তরে হোরেসিও নিতান্ত প্রাকৃত জনের মতই বলিল, "তাহা হইলে আপনি খুব বিস্মিত হইতেন।" এইবার হ্যামলেট যাহা বলিলেন তাহাতে কি অপূর্ব্ব

নাটকীয় কল্পনার পরিচয়!—বলিলেন, "খুব সম্ভব, খুব সম্ভব,—বেণীরূপ ছিল কি?" শ্রেষ্ঠ শক্তির অধিকারী ব্যতীত আর কোনও কবির রচনায় এখানে কি দেখিতাম? যে ঘটনা হ্যামলেটের নিকট দশটা নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হওয়া অপেক্ষাও বুদ্ধিভ্রংশকারী, তাহারই সম্পর্কে হোরেসিওর এই অতি ক্ষুদ্র প্রশ্ন শুনিয়া হ্যামলেট নিশ্চয়ই বলিয়া উঠিতেন, "কি বলিলে?—বিস্মিত হইতাম!" তার পর, ইহা যে তাঁহার পক্ষে কতখানি বিস্ময়কর সেই সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু কবি এখানে নিজেই হ্যামলেট হইয়া গিয়াছেন—কবি-প্রেরণার দিব্য-শক্তি তাঁহাকে এমনই পাইয়া বসিয়াছে যে, হ্যামলেটের মত চরিত্রের অন্তর-নিরুদ্ধ ভাবাবেগ ব্যক্ত করিবার ভাষা জুটিল না—তাই এরূপ প্রশ্নের উত্তরে হ্যামলেট যেন আত্মগত পরিহাসের ছলে কতকটা মনে মনেই বলিয়া উঠিলেন, "খুব সম্ভব, খুব সম্ভব। এই হ্যামলেট ভিন্ন আর কেহই এরূপ অবস্থায় ওইরূপ উত্তর এমনভাবে দিতে পারিত না।

অতএব কবি-প্রেরণার এই গুণ একটি বিশিষ্ট গুণ বটে। কেবলমাত্র রসবিচারে, কাব্য-প্রেরণার এই প্রভেদ অনর্থক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু কবিকে যদি কাব্য হইতে পৃথক করিয়া দেখার প্রয়োজন হয়, যদি কবি-প্রেরণার বৈচিত্র্য বা কবি-শক্তির তারতম্য তুলনায় বিচার করিতে হয়, তবে এই Absolute Vision বা নিরঞ্জনা কবি-দৃষ্টির কথা বিশেষ করিয়া আলোচনার যোগ্য। কারণ, সত্যকার সৃষ্টি বলিতে যাহা বুঝায়—যে সৃষ্টি-প্রেরণার মূলতত্ত্ব ব্রহ্মের "এক আমি বহু হইব" এই কামনা,—সেই সৃষ্টিলীলার আনন্দ এই পূর্ণদৃষ্টিতেই সম্ভব। কবি যখন আপনার সম্পূর্ণ বহির্গত, অথচ সৃষ্টিরহস্যের অনুগত কিছু সৃষ্টি করেন, তখনই তাহা একটা বিশেষ কিছু, অর্থাৎ সত্যকার সৃষ্টি হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাঁহার কল্পনার লীলা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে চরম কবিশক্তি বলিয়া বিশ্বাস হয়। পূর্ব্ব প্রবন্ধে সাহিত্যকেই যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগ বলিয়াছি, ইহাই তাহার কারণ। এই সত্যকার সৃষ্টিশক্তির মধ্যে কবির যে দিব্যানুভূতির প্রমাণ পাই তাহাই পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দের লীলা। এইরূপ সৃষ্টি করার শক্তিতে সৃষ্টি-রহস্যভেদের যে পরিচয় আছে—উৎকৃষ্ট নাটকীয় শক্তিতেই তাহা সম্ভব, সে যেন সেই অন্তর্য্যামী আদি-পুরুষের মত। কবিদৃষ্টি যাহা প্রত্যক্ষ করে, ঠিক সেইটির অস্তিত্ব যেন তৎপূর্ব্বে ছিল না—তাহা যেন 'airy nothing'; কিন্তু তাহাই যখন কবি-কল্পনায় নাম-ধাম লইয়া শরীরী

হইয়া উঠিল, তখন সে আর অবাস্তব বা অসত্য নহে, বিশ্বশিল্পীর স্বহস্ত-রচিত কীর্ত্তিবিশেষের মতই তাহা বিশিষ্ট, জীবন্ত ও বাস্তব। এই আত্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিই যে পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দের নিদান—আপনা হইতে আপনার বাহিরে দাঁড়াইবার শক্তিই যে সকল রহস্যভেদের শক্তি; এ অবস্থায় যে বুঝিতে হয় না, খুঁজিতে হয় না—সব দেখিতে পাওয়া যায়,—সে কথা কবি নিজেও বলিতেছেন—

ওরে মন, আয় তুই সাজ ফেলে আয়
মিছে কি করিস্ নাট-বেদীতে?
বুঝিতে চাহিস্ যদি বাহিরেতে আয়
খেলা ছেড়ে আয় খেলা দেখিতে!
ওই দেখ নাটশালা
পরিয়াছে দীপমালা,
সকল রহস্য তুই চাস্ যদি ভেদিতে
মিছে না ফিরিস্ নাট-বেদীতে!

নেমে এসে দূরে এসে দাঁড়াবি যখন,—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি,
এই হাসি-রোদনের মহানাটকের
অর্থ তখন কিছু বুঝিবি!
একের সহিত একে
মিলাইয়া নিবি দেখে'
বুঝে নিবি,—বিধাতার
সাথে নাহি বুঝিবি,—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি।

ইহাই লক্ষ্য করিয়া আমি কবির দিব্যানুভূতিকে পূর্ণমানবতার লীলা, এবং কবিধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগ বলিয়াছি।

৩। কবি-কল্পনা

কবি ও কাব্য-সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা এ পর্য্যন্ত করিয়াছি তাহা ঠিক তত্ত্বালোচনা নয়; যদি কেহ সে ধারণা করিয়া থাকেন তবে নিরাশ হইতে হইবে। কাব্য যেমন কোনও তত্ত্বকথা নয়, তেমনি কাব্যপরিচয় ঠিক

তত্ত্বানুসন্ধানের মত হইলে, কাব্যবস্তু উহ্য হইয়া যাইবে। রসিক পাঠকের মনে, কাব্যপাঠকালে, কবি ও কাব্যকলা-সম্বন্ধে যে কতকগুলি ধারণা আপনা হইতে গড়িয়া উঠে, অথচ খুব স্পষ্ট করিয়া তুলিবার আবশ্যক বা সুবিধা হয় না—সেই ধারণাগুলিকেই একটু সাজাইয়া গুছাইয়া দেওয়া আমার অভিপ্রায়, তার বেশী কিছু করিবার অভিমান বা সাধ্য আমার নাই। আমার আলোচনায় যদি কোনও থিয়রী থাকে, তাহা কোন তত্ত্বসিদ্ধান্ত নয়—যাঁহাদের ওইরূপ কোনও সিদ্ধান্ত আছে, তাঁহাদের সেই সিদ্ধান্তকে পাকা করিয়া তুলিবার জন্য গৌণভাবে সাহায্য করিলেই আমার আলোচনা সার্থক হইবে। আমার কোনও নিজ-মত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই। কাব্যপাঠ করিয়া কবি ও কাব্য সম্বন্ধে যে একটি প্রত্যক্ষ ধারণা অনিবার্য্য, তাহার যতটুকু—পণ্ডিত নয়—রসিক-সমাজে আলোচনার যোগ্য, তাহাই বিবৃত করা আমার অভিপ্রায়। তাই বার বার বলিয়া রাখিতে চাই যে, আমার লক্ষ্য কাব্য-মীমাংসা নয়, কাব্য-পরিচয়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় কবি-কল্পনা। বিষয়টির নামোল্লেখ মাত্রেই একটা কিছু ধারণা সকলের মনে জাগিয়া উঠা সম্ভব। দেখা যাক, এই ধারণা কার্য্যতঃ কতখানি ও কিরূপ।

ইংরেজীতে 'Imagination' বলিতে যাহা বুঝায়—'কল্পনা' অর্থে আমরা শেষ পর্য্যন্ত তাহাই বুঝিব। ইংরেজী শব্দটির ক্রমশঃ যে ব্যাপক অর্থ দাঁড়াইয়াছে, সে অর্থে কোনও দেশী শব্দ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল কিনা সন্দেহ, কারণ কবি-প্রতিভার ঠিক এই শক্তির আবশ্যকতা দেশীয় কাব্যবিচারে কার্য্যতঃ কখনও স্বীকৃত হয় নাই। 'কল্পনা' শব্দটির অর্থ,—রচনা বা আরোপ—পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে, ইহার অধিক কোনও অর্থ এই শব্দটির মধ্যে ছিল না। কবি-কর্ম্মের যে দিকটি লক্ষ্য করিয়া অধুনা এই শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য দেখা যাইতেছে সেইদিকটির যেমন বিশেষ আলোচনা এ পর্য্যন্ত হয় নাই, তেমনি কল্পনা কথাটির অর্থও সুনিরূপিত হয় নাই।

কাব্যবিচারে কবিকর্ম্মের ধারণা, কাব্যের ধারণা হইতেই জন্মে। তথাপি কবিকর্ম্মের ধারণা আগে, ও কাব্যের ধারণা তদনুযায়ী হওয়াই স্বাভাবিক। উৎকৃষ্ট কাব্যগুলি না পড়িলে কবিপ্রতিভার কোনও ধারণা হইতে পারে না। প্রশ্ন উঠিবে—উৎকৃষ্ট কাব্য কি? ইহার উত্তরে, জগতের কাব্যসাহিত্যে

যেগুলি সর্ব্বকালের ও সর্ব্বদেশের রসিক-সমাজে উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে—সেইগুলির নাম করা ভিন্ন অন্ত উপায় নাই। আমাদের দেশেও উৎকৃষ্ট কাব্যের লক্ষণ-বিচার করিয়া, কাব্যের একটি আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই আদর্শ ও তদনুযায়ী কবিকর্ম্মের ধারণা একটু বুঝিবার চেষ্টা করিলে ভালো হয়, কারণ পুরাতনের সহিত নূতনের প্রভেদ কোথায় তাহা স্থিরীকৃত না হইলে, কাব্যপরিচয়ের ভিত্তি দৃঢ় হইবে না। এসম্বন্ধে যতটুকু বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছি তাহার জন্ম আমি প্রধানতঃ ডাঃ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের বহু গবেষণাপূর্ণ সুবৃহৎ গ্রন্থের নিকট ঋণী। * অবশ্য এই আলোচনায় আমার মতামতের জন্ম সেই পণ্ডিত ব্যক্তিকে দায়ী করা যাইবে না।

কাব্যের মূলে কবিকল্পনা, এবং কবিকল্পনার কারণ কবির প্রতিভা—এমন কথা বলিতে কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু, এই কবিকল্পনা কি এবং কতটুকু জিনিষ, তাহার নির্ণয়ের উপর কবিশক্তির মূল্য বা গৌরব নির্ভর করিতেছে। আমরা যাহাকে কবিকল্পনা বলি, কবির সেই অন্তর্গত ভাবকর্ম্মকে সংস্কৃত আলঙ্কারিক 'কবিব্যাপার', 'কবিকর্ম্ম' বা 'কবিকৌশল' বলিয়াছেন। 'কল্পনা' এই শব্দটি কুত্রাপি এই সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় নাই; কারণ, আধুনিক কাব্য-জিজ্ঞাসার যে প্রধান বিষয়—কবিমানস ও কাব্যবস্তু, তাহা সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের প্রয়োজনের বহির্ভূত। এ সম্বন্ধে ডাঃ দে তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে পাদটীকায় বলিতেছেন—

The Indian theorists have almost neglected an important part of their task, to find a definition of the nature of the subject of a poem as the product of the poet's mind : this problem is the main issue of Western Aesthetics.

[অর্থাৎ ভারতীয় পণ্ডিতগণ কাব্যশাস্ত্র আলোচনার একটা দিক প্রায় লক্ষ্যই করেন নাই,—প্রত্যেক কাব্যই কবিমানসপ্রসূত অতএব তাহার বিষয়-বস্তুর যে বিশেষত্ব নির্দ্দেশের প্রয়োজন সে দিকে তাঁহারা যত্নবান হন নাই; পাশ্চাত্য সুন্দর-তত্ত্বের ইহাই প্রধান সমস্যা।]

এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার পূর্ব্বে কাব্য ও কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে অলঙ্কার-শাস্ত্রের মত সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রথমেই কবিপ্রতিভা বিষয়ক কয়েকটি উক্তি চয়ন করিয়া দিলাম।

* Studies in the History of Sanskrit Poetics, Vol. II.

ভামহ ও দণ্ডী এই প্রতিভাকে 'নৈসর্গিকী' ও 'সহজা' বলিয়াছেন। বামনের মতে এই প্রতিভা—"জন্মান্তরগতঃ সংস্কারবিশেষঃ কশ্চিৎ", ইহারই মধ্যে কাব্যের বীজ নিহিত থাকে। মম্মট ইহাকে 'শক্তি' বলিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত ইহার নাম দিয়াছিলেন 'প্রজ্ঞা' বা উৎকৃষ্ট বুদ্ধি, ইহাই 'অপূর্ব্ব বস্তুনির্ম্মাণক্ষম', ইহার প্রধান পরিচয়—"রসাবেশ-বৈশদ্য-সৌন্দর্য্য-কাব্য-নির্ম্মাণক্ষমত্বং।" ইহাই ভরতনির্দ্দিষ্ট—কবির অন্তর্গত 'ভাব'। এই প্রতিভা-কেই অভিনবগুপ্তের গুরু ভট্ট তৌতের একটি শ্লোকে 'প্রজ্ঞা নবনবোল্লেখ-শালিনী" বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ এই শ্লোকটিকে শাস্ত্র-বাক্যের মত মানিয়া লইয়াছেন, কেহ কেহ ইহার উপর আর-একটি বিশেষণ যোগ করিয়াছেন—'লোকোত্তর'; এবং ইহা রচনার 'বৈচিত্র্য' 'বিচ্ছিত্তি' 'চারুত্ব' 'সৌন্দর্য্য' বা 'রমণীয়ত্ব' সম্পাদন করে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা'য় কবি-সম্বন্ধে—শক্তি, প্রতিভা (রচনা-কৌশল), ব্যুৎপত্তি (culture) ও অভ্যাস—এই চারিগুণের উল্লেখ আছে। এই চারিটি ছাড়া 'সমাধি' বা চিত্তের একাগ্রতাও একটি গুণ বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। যাযাবরীয়গণের মতে, কবিত্বের কারণ 'শক্তি'—এই শক্তির ফলেই 'প্রতিভা' ও 'ব্যুৎপত্তি'র উন্মেষ হয়। এই প্রতিভার আবার দুই দিক আছে—একদিকে ইহা 'কারয়িত্রী', আর-এক দিকে ইহা 'ভাবয়িত্রী'।

অলঙ্কারশাস্ত্রের এই বচনগুলিতে প্রতিভার যে পরিচয় আছে তাহা এক হিসাবে যথার্থ। কবি-প্রতিভা 'দিব্য প্রযত্ন' হইলেও, এমন কি প্রাক্তন-সংস্কার বলিয়া মানিলেও, ইহা যে অভ্যাস ও ব্যুৎপত্তি দ্বারা মার্জ্জিত হয়, একথাও সকলে স্বীকার করিবেন। কিন্তু 'কবিব্যাপার' বা 'কবিকর্ম্মে'র স্বরূপ অনুসন্ধান করিতে হইলে, ওই 'নবনবোল্লেখশালিনী' ও 'অপূর্ব্ব বস্তু-নির্ম্মাণক্ষম' বিশেষণ দুইটি ভালো করিয়া বুঝিতে হয়। এজন্য সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্যের যে ধারণা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক। কোনও মতবাদের মূল্যনিরূপণ আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি চাই, কবিকল্পনা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার কতটুকু ধারণা এই বিচারে ধরা পড়ে, তাহা বুঝিয়া লইতে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই—'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যং—কাব্যের এই সংজ্ঞানির্দ্দেশ অলঙ্কার-শাস্ত্রে প্রচলিত আছে। 'কাব্য' অর্থে মূলতঃ শব্দ ও

অর্থের মিলনাত্মক রচনা। শব্দার্থের ব্যাকরণ ও দর্শনঘটিত মীমাংসা হইতেই কাব্যালোচনার আরম্ভ—তাই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের যতকিছু মতবাদ সব এই শব্দার্থের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। 'সাহিত্য' শব্দটিও এই 'শব্দার্থৌ সাহিতৌ' হইতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকিবে। ইহার পর শব্দার্থঘটিত অলঙ্কারই কাব্যের নিদান বলিয়া এ সম্বন্ধে বহুতর সিদ্ধান্ত অলঙ্কার-শাস্ত্রের পুষ্টি বিধান করে। ইতিমধ্যে 'অলঙ্কার' ব্যতীত 'রীতি' ও 'দোষ-গুণ' কাব্যকলায় স্থান পাইল। 'রীতি' অর্থে বিশিষ্ট পদরচনা বা বাক্যবিন্যাস (diction)। ওজঃ, প্রসাদ ও মাধুর্য্য—এই তিনটিই কাব্যের প্রধান গুণ, এবং কতকগুলি দোষও সেই সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট হইল। এজন্য, অতঃপর কাব্যের সংজ্ঞানির্দ্দেশে অলঙ্কারের সঙ্গে রীতি ও দোষ-গুণ ধরা হইত। বিশ্বনাথের মতে, যাহা "গুণালঙ্কারসহিতৌ শব্দার্থৌ দোষবর্জ্জিতৌ" তাহাই কাব্য। শব্দার্থকে কাব্যশরীর ধরিয়া তাহার অঙ্গশোভা দোষ-গুণ ইত্যাদি নির্ণয় করিয়া, শেষে কাব্যের আত্মা কি, তাহার সন্ধান আরম্ভ হইল। বামনের মতে 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'—রীতিই অর্থাৎ এই বাক্যবিন্যাসগুলিই কাব্যের আত্মা। 'বক্রোক্তিজীবিত'-কার কুন্তলের মতে অলঙ্কারনিহিত বক্রোক্তিই কাব্যের জীবিত বা প্রাণ। অর্থাৎ সোজা কথাকে বাঁকা করিয়া বলিবার যে ভঙ্গি হইতে কাব্যের অলঙ্কারগুলির সৃষ্টি হয়—তাহাই কাব্যের মূল উৎস, কাব্যের সর্ব্বস্ব। 'রস'-নামক আর-একটি উপাদান পূর্ব্ব হইতেই (ভারতের 'নাট্যসূত্র' হইতে) কাব্যের প্রাণ বলিয়া উল্লিখিত হইলেও, উত্তরকালে তাহার যে মূল্য দাঁড়াইয়াছিল এখনও তাহা সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই; 'রস'কে, অন্য সকল উপাদানের উপজীব্য বলিয়া, কাব্যবিচারে একটা সাধারণ মূল্য দেওয়া হইত। অলঙ্কার, রীতি ও দোষ-গুণই ছিল প্রধান আলোচনার বিষয়, এবং তাহা লইয়া জটিল সিদ্ধান্তের অবধি ছিল না। ক্রমশঃ যখন 'ধ্বনি', বা ব্যঙ্গার্থ, কাব্যের আত্মা বলিয়া একটা নূতন মত প্রবল হইয়া উঠিল, তখন কবি-কৌশলের সকল অঙ্গই ধ্বন্যাত্মক বলিয়া ধারণা হইল; উৎকৃষ্ট কাব্যের বস্তু, অলঙ্কার, রস প্রভৃতির উৎকর্ষের শেষ প্রমাণ হইল এই ধ্বনি। পরিশেষে সকল ধ্বনিই এক রস-ধ্বনিতে আসিয়া দাঁড়াইল; তখন এক আলঙ্কারিকের মতে কাব্যের স্বরূপ হইল—"বাক্যং রসাত্মকং" অর্থাৎ রস যে-বাক্যের আত্মা, তাহাই কাব্য।

উপরি-উদ্ধৃত অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল

না, জানি। 'রস' কথাটির তাৎপর্য্য যথাস্থানে নির্দ্দেশ করিব। 'ধ্বনি' কথাটির মোটামুটি অর্থ—ব্যঞ্জনা, suggested sense। এই সকল সিদ্ধান্ত কাব্যের আদর্শ-বিচারে, তত্ত্ব-হিসাবে যতই মূল্যবান হউক—কবিকল্পনা বা কবিকর্ম্ম-সম্বন্ধে আমার মূল জিজ্ঞাসা, এই অলঙ্কারাদির বাহিরে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিবে না। শেষ পর্য্যন্ত কাব্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশে আলঙ্কারিক যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাতে কাব্য 'রমণীয়ার্থপ্রতিপাদক শব্দ'; অর্থাৎ কাব্যে শব্দার্থের রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদন আবশ্যক; তথাপি কার্য্যতঃ সেই সালঙ্কার ও নির্দ্দোষ পদরচনাই কবির প্রত্যক্ষ কীর্ত্তি। এই কৌশল যে অভ্যাসের দ্বারাও আয়ত্ত করা যায়, আলঙ্কারিক তাহা স্বীকার করেন; শব্দার্থগত কবিকর্ম্মকে যে রীতিমত শিক্ষাশাস্ত্রে পরিণত করা যায়, অলঙ্কার-শাস্ত্র রচনার একটি প্রধান কারণই এই। আলঙ্কারিকগণের মতে কবিপ্রতিভা 'সহজা' হইলেও 'ঔপদেশিকী'ও বটে। কবি-প্রতিভার 'নবনবোল্লেখশালিনী' শক্তি ও 'অপূর্ব্ব বস্তুনির্ম্মাণক্ষমত্বে'র পরিচয়-স্বরূপ একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিলাম, ইহা হইতে আলঙ্কারিকের মতে কবিকর্ম্মের প্রসার যে কতটুকু, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

> হৃতসারমিবেন্দুমণ্ডলং
> দময়ন্তীবেদনায় বেধসা।
> কৃতমধ্যবিলং বিলোক্যতে
> ধৃতগম্ভীরখনিখনীলিম॥

[দময়ন্তীর মুখনির্ম্মাণ জন্য বিধি চন্দ্র হইতে কিয়দংশ হরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যভাগে অতি গভীর আকাশ-নীল গহ্বর দেখা যাইতেছে, অর্থাৎ গহ্বর এত গভীর যে ওপিঠে আকাশ দেখা যাইতেছে, তাহা না হইলে উহা নীল দেখাইত না, আলোক পড়িয়া শুভ্র হইয়া যাইত।]

—ইহাও যে নবনবোল্লেখশালিনী প্রতিভার নিদর্শন, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। রস ও ধ্বনিবাদ অনুসারে, কবিকর্ম্মের কোনও বিচারযোগ্য বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ধ্বনিকার ও আনন্দবর্দ্ধনের মতে—কবির একমাত্র চেষ্টা হইবে, কেমন করিয়া রচনার দ্বারা রসোদ্রেক হয়। বারবার এই কথাই বলা হইয়াছে যে, শব্দ ও অর্থের যোজনায় কেবলমাত্র রস-ধ্বনিই লক্ষ্য হওয়া উচিত—এমন কি আখ্যান-বস্তু ও অলঙ্কার গৌণ উপাদান মাত্র। অর্থাৎ কাব্যবস্তু ও অলঙ্কারের মধ্যেও যে কৃতিত্বটুকু ছিল, তাহা ঐ

অর্থের মিলনাত্মক রচনা। শব্দার্থের ব্যাকরণ ও দর্শনঘটিত মীমাংসা হইতেই কাব্যালোচনার আরম্ভ—তাই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের যতকিছু মতবাদ সব এই শব্দার্থের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। 'সাহিত্য' শব্দটিও এই 'শব্দার্থৌ সাহিত্যৌ' হইতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকিবে। ইহার পর শব্দার্থঘটিত অলঙ্কারই কাব্যের নিদান বলিয়া এ সম্বন্ধে বহুতর সিদ্ধান্ত অলঙ্কার-শাস্ত্রের পুষ্টি বিধান করে। ইতিমধ্যে 'অলঙ্কার' ব্যতীত 'রীতি' ও 'দোষ-গুণ' কাব্যকলায় স্থান পাইল। 'রীতি' অর্থে বিশিষ্ট পদরচনা বা বাক্যবিন্যাস (diction)। ওজঃ, প্রসাদ ও মাধুর্য্য—এই তিনটিই কাব্যের প্রধান গুণ, এবং কতকগুলি দোষও সেই সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট হইল। এজন্য, অতঃপর কাব্যের সংজ্ঞানির্দ্দেশে অলঙ্কারের সঙ্গে রীতি ও দোষ-গুণ ধরা হইত। বিশ্বনাথের মতে, যাহা "গুণালঙ্কারসহিতৌ শব্দার্থৌ দোষবর্জ্জিতৌ" তাহাই কাব্য। শব্দার্থকে কাব্যশরীর ধরিয়া তাহার অঙ্গশোভা দোষ-গুণ ইত্যাদি নির্ণয় করিয়া, শেষে কাব্যের আত্মা কি, তাহার সন্ধান আরম্ভ হইল। বামনের মতে 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'—রীতিই অর্থাৎ এই বাক্যবিন্যাসগুঙ্গিই কাব্যের আত্মা। 'বক্রোক্তিজীবিত'-কার কুন্তলের মতে অলঙ্কারনিহিত বক্রোক্তিই কাব্যের জীবিত বা প্রাণ। অর্থাৎ সোজা কথাকে বাঁকা করিয়া বলিবার যে ভঙ্গি হইতে কাব্যের অলঙ্কারগুলির সৃষ্টি হয়—তাহাই কাব্যের মূল উৎস, কাব্যের সর্ব্বস্ব। 'রস'-নামক আর-একটি উপাদান পূর্ব্ব হইতেই (ভারতের 'নাট্যসূত্র' হইতে) কাব্যের প্রাণ বলিয়া উল্লিখিত হইলেও, উত্তরকালে তাহার যে মূল্য দাঁড়াইয়াছিল এখনও তাহা সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই ; 'রস'কে, অন্য সকল উপাদানের উপজীব্য বলিয়া, কাব্যবিচারে একটা সাধারণ মূল্য দেওয়া হইত। অলঙ্কার, রীতি ও দোষ-গুণই ছিল প্রধান আলোচনার বিষয়, এবং তাহা লইয়া জটিল সিদ্ধান্তের অবধি ছিল না। ক্রমশঃ যখন 'ধ্বনি', বা ব্যঙ্গার্থ, কাব্যের আত্মা বলিয়া একটা নূতন মত প্রবল হইয়া উঠিল, তখন কবি-কৌশলের সকল অঙ্গই ধ্বন্যাত্মক বলিয়া ধারণা হইল ; উৎকৃষ্ট কাব্যের বস্তু, অলঙ্কার, রস প্রভৃতির উৎকর্ষের শেষ প্রমাণ হইল এই ধ্বনি। পরিশেষে সকল ধ্বনিই এক রস-ধ্বনিতে আসিয়া দাঁড়াইল ; তখন এক আলঙ্কারিকের মতে কাব্যের স্বরূপ হইল—"বাক্যং রসাত্মকং" অর্থাৎ রস যে-বাক্যের আত্মা, তাহাই কাব্য।

উপরি-উদ্ধৃত অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল

না, জানি। 'রস' কথাটির তাৎপর্য্য যথাস্থানে নির্দ্দেশ করিব। 'ধ্বনি' কথাটির মোটামুটি অর্থ—ব্যঞ্জনা, suggested sense। এই সকল সিদ্ধান্ত কাব্যের আদর্শ-বিচারে, তত্ত্ব-হিসাবে যতই মূল্যবান হউক—কবিকল্পনা বা কবিকর্ম্ম-সম্বন্ধে আমার মূল জিজ্ঞাসা, এই অলঙ্কারাদির বাহিরে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিবে না। শেষ পর্য্যন্ত কাব্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশে আলঙ্কারিক যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাতে কাব্য 'রমণীয়ার্থপ্রতিপাদক শব্দ'; অর্থাৎ কাব্যে শব্দার্থের রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদন আবশ্যক; তথাপি কার্য্যতঃ সেই সালঙ্কার ও নির্দ্দোষ পদরচনাই কবির প্রত্যক্ষ কীর্ত্তি। এই কৌশল যে অভ্যাসের দ্বারাও আয়ত্ত করা যায়, আলঙ্কারিক তাহা স্বীকার করেন; শব্দার্থ-গত কবিকর্ম্মকে যে রীতিমত শিক্ষাশাস্ত্রে পরিণত করা যায়, অলঙ্কার-শাস্ত্র রচনার একটি প্রধান কারণই এই। আলঙ্কারিকগণের মতে কবিপ্রতিভা 'সহজা' হইলেও 'ঔপদেশিকী'ও বটে। কবি-প্রতিভার 'নবনবোল্লেখশালিনী' শক্তি ও 'অপূর্ব্ব বস্তুনির্ম্মাণক্ষমত্বে'র পরিচয়-স্বরূপ একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিলাম, ইহা হইতে আলঙ্কারিকের মতে কবিকর্ম্মের প্রসার যে কতটুকু, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

দময়ন্তীবেদনায় বেধসা।
দ্রুতমধ্যবিলং বিলোক্যতে
ধৃতগম্ভীরখনিখনীলিম॥

[দময়ন্তীর মুখনির্ম্মাণ জন্য বিধি চন্দ্র হইতে কিয়দংশ হরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যভাগে অতি গভীর আকাশ-নীল গহ্বর দেখা যাইতেছে, অর্থাৎ গহ্বর এত গভীর যে ওপিঠে আকাশ দেখা যাইতেছে, তাহা না হইলে উহা নীল দেখাইত না, আলোক পড়িয়া শুভ্র হইয়া যাইত।]

—ইহাও যে নবনবোল্লেখশালিনী প্রতিভার নিদর্শন, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। রস ও ধ্বনিবাদ অনুসারে, কবিকর্ম্মের কোনও বিচার-যোগ্য বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ধ্বনিকার ও আনন্দবর্দ্ধনের মতে—কবির একমাত্র চেষ্টা হইবে, কেমন করিয়া রচনার দ্বারা রসোদ্রেক হয়। বারবার এই কথাই বলা হইয়াছে যে, শব্দ ও অর্থের যোজনায় কেবলমাত্র রস-ধ্বনিই লক্ষ্য হওয়া উচিত—এমন কি আখ্যান-বস্তু ও অলঙ্কার গৌণ উপাদান মাত্র। অর্থাৎ কাব্যবস্তু ও অলঙ্কারের মধ্যেও যে কৃতিত্বটুকু ছিল, তাহা ঐ

কল্পনার যে অর্থ বুঝায়, ইংরেজীতে তাহাকে Invention বলে। কবি বলিতেছেন, কল্পনা তাঁহার চিত্ত-ফুলবনের মধু সংগ্রহ করিয়া (অথবা অপর কবিগণের কাব্য হইতে কিছু কিছু মধু আহরণ করিয়া) একটি মধুচক্র রচনা করিবে; অর্থাৎ, নানা ভাবরাজি আবশ্যকমত সাজাইয়া বা গ্রহণ করিয়া একখানি নূতন কাব্য রচনা করিলে—সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে কবি-প্রতিভাকে যে 'অপূর্ব্ববস্তুনির্ম্মাণক্ষম' প্রজ্ঞা এবং ভাবয়িত্রী ও কারয়িত্রী দুই শক্তির আধার বলা হইয়াছে, তাহাতে—কল্পনার এই ধারণা কতকটা সূচিত হয়। ইহাই কবি-কৌশল। মেঘনাদবধ কাব্যখানিতে কল্পনা এই কাজ উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়াছে—পুরাতনকে নূতন করিয়া বলা এবং অনুকরণমূলক উদ্ভাবন-কর্ম্মের পরিচয় এই কাব্যে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। মধুসূদন পাশ্চাত্য কাব্যের যে আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাঁহার মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহার শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত এই যে, আর্ট—Imitation বা অনুকৃতি। এই অনুকরণ দ্বিবিধ; প্রকৃতির অনুসরণ (যাহাকে সংস্কৃত অলঙ্কারে 'জাতি' বা 'স্বভাবোক্তি' নামে কোনওরূপে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে); আর-এক রূপ অনুকরণ—অপর কবির অনুকরণ, এই অনুকরণ নিকৃষ্ট। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র এই অনুকরণ স্বীকার করে, কাব্যকলা রীতিমত শিক্ষণীয় বা আভ্যাসিক বলিয়া মনে করে, কারণ শব্দ ও অর্থেই কাব্যের আরম্ভ, এবং এই শব্দার্থের যত কিছু কারুকলাই কবি-কর্ম্ম। এ অর্থে ইংরেজী Invention কথাটির অর্থ আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু মজার কথা এই যে, প্রকৃতির অনুকরণই পাশ্চাত্য কাব্যের আদর্শ হইলেও, এবং সেই-আদর্শে অতি উৎকৃষ্ট কাব্যরচনা সম্ভব হইলেও, সেখানে সেকালে সুন্দর-বোধ বা রসের কোনও সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত হয় নাই—সে দেশে Aesthetics একটা অতিশয় আধুনিক শাস্ত্র। কিন্তু যাহারা প্রকৃতি বা স্বভাবের অনুকরণ না করিয়া, কাব্যকে খাঁটি সাহিত্য অর্থাৎ সালঙ্কার শব্দার্থ-রচনা বলিয়াই মনে করিত, তাহারা এই রসের সন্ধান বহুপূর্ব্বে পাইয়াছে, এবং ইহাকে কাব্যের শেষ প্রয়োজন বলিয়া স্থির করিয়াছে। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় ভাবনা তুলনায় সমালোচনা করিবার ইহাও একটি দৃষ্টান্ত। ভারতীয় ভাবনা, কাব্য-বিচারে—প্রকৃতি, কবিতার বিষয়, কবিমানস প্রভৃতিকে পাশ কাটাইয়া—অলৌকিক রসবস্তুকে আশ্রয় করিয়াছে; সে ভাবনা বিশেষকে বাদ দিয়া নির্ব্বিশেষের প্রয়াসী, তাহার নিকট বস্তুমাত্রই শূন্য ও নস্যাৎ হইয়া যায়।

এক্ষণে ইয়ুরোপীয় কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এই ‘কল্পনা’র প্রসার সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এ সম্বন্ধে ইংরেজী ‘রোমান্টিক’ শব্দটির অর্থবিপর্য্যয়ের ইতিহাস লক্ষ্য করিলেই ব্যাপারটি বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিবে, তাই এ বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট ইংরেজী প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া নিম্নে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিলাম।*

ইয়ুরোপীয় সাহিত্যে, প্রাচীন কাব্যকলার যে Imitation অথবা অনুকৃতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাই কবিকল্পনার আদর্শ ছিল। মধ্যযুগের কাব্য ও আখ্যান-আখ্যায়িকায় কবিকল্পনা কোনও নিয়ম মানে নাই, অবাধে আপন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছে,—ভাব-বিলাসের আতিশয্য এবং অবাস্তবের যাহা কিছু আনন্দ, তাহাকেই বরণ করিয়াছে। কল্পনার এই স্বাধীন স্ফূর্ত্তি মানব-মনের অতি সহজ ও আদিম প্রবৃত্তি। পরবর্ত্তী কালে এই অতিচারী কল্পনাকে রোমান্টিক (Romantic) বলা হইত—তাহার কারণ, এ সাহিত্য যে-ভাষায় রচিত হইয়াছিল, তাহা (ইয়ুরোপের ‘সংস্কৃত’) ল্যাটিন নহে; এ-সাহিত্য ‘ভাষা-সাহিত্য’—রোমান্টিক শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তাই। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, এ-সাহিত্য পাণ্ডিত্য-বর্জ্জিত সরল লোকসাহিত্য, এবং এ কল্পনা স্বাভাবিক কবিব্যাপার। সর্ব্বদেশের লোকসাহিত্যে এই কল্পনার প্রসার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ক্রমে এই ‘রোমান্টিক’ শব্দটির অর্থ দাঁড়াইল—অবাস্তব, অতিপ্রাকৃত, বালকোচিত, এমন কি ছন্নমতি বা উন্মাদ পর্য্যন্ত। ইয়ুরোপীয় সভ্যতায় যখন বিজ্ঞানের যুক্তিবাদ প্রবল হইয়া উঠিল, তখন সাহিত্যের আদর্শও বদলাইয়া গেল। তখন কবিকল্পনাকে যুক্তিবিচারের শাসনে সংযত রাখাই উৎকৃষ্ট প্রতিভার পরিচয় বলিয়া গণ্য হইল। এই বিচারবুদ্ধিই হইল কবিতার প্রাণ, ‘কল্পনা’ অলঙ্কারাদি দ্বারা কাব্যের প্রসাধন করিবে মাত্র। তখনকার কবি ও দার্শনিক উভয়েরই মতে, কল্পনা একটি উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তি, উহার ফলে বাতুলতা, ভ্রান্তি ও চিত্তদাহ উপস্থিত হয়; এই বৃত্তিকে বিচারবুদ্ধির শাসনে রাখিলে, স্মৃতি-ভাণ্ডার হইতে নানা দৃষ্টান্ত ও উপমা আহরণ করিয়া জ্ঞান-গর্ভ রচনার শোভা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। তখন

* Logan Pearsall Smith-কৃত Words and Idioms নামক গ্রন্থে Four Romantic Words-শীর্ষক সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

উৎকৃষ্ট কাব্যকে 'যুক্তিযুক্ত ও সুবুদ্ধিসম্মত' (reasonable and judicious) বলিয়া প্রশংসা করা হইত। কিন্তু ক্রমশঃ প্রায় একই কালে, কবিকল্পনা সম্বন্ধে আর-একটি ধারণা স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছিল—আর্টে কল্পনার যথার্থ স্থান ও প্রকৃত মূল্য-নিরূপণ আরম্ভ হইয়াছিল। যাহা অসঙ্গত বা অপ্রাকৃত—অথচ মনোমুগ্ধকর, তাহারই নাম হইল 'রোমান্টিক'। প্রাচীন কথা, কাব্য ও কাহিনীর মধ্যে যে ধরণের কল্পনা ছিল তাহাই উপাদেয় বলিয়া স্থির হইল। জ্যোৎস্না রাত্রি, নির্জ্জন বনভূমি, সমুদ্রসৈকত প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যের যেখানে যাহা কিছু অবাস্তব-রমণীয় এবং চিত্ত-চমৎকারী বলিয়া বোধ হইল, তাহা প্রাচীন কাব্যোদ্ধৃত রসরাগে রঞ্জিত বলিয়া 'রোমান্টিক' শব্দটি নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। যুক্তি-বিচার দ্বারা প্রকৃতির অনুসরণ কাব্যের আদর্শ বলিয়া আর গ্রাহ্য হইল না। কল্পনা প্রকৃতির মধ্যে একটা চমৎকারের সন্ধান পাইল—যাহা সুন্দর তাহার মধ্যে একটা 'কি-জানি-কি'-ভাব (সংস্কৃত আলঙ্কারিকের 'অবিচারিতরমণীয়') রহিয়াছে দেখা গেল। জ্ঞানবুদ্ধির অতীত এই সুন্দর-রহস্য কল্পনার প্রধান উপজীব্য হইয়া দাঁড়াইল। মধ্যযুগের কাব্য-সাহিত্য হইতেই কল্পনার এই অঞ্জন মানুষের চোখে নূতন করিয়া লাগিল, কাব্য প্রকৃতিকে অনুসরণ না করিয়া যেন প্রকৃতির উপরেই আপন প্রভাব বিস্তার করিল। এখন হইতে প্রকৃতিই যেন কল্পনার বশ হইল। কল্পনার এই স্বাধীন বৃত্তি, কবিগণের অন্তরগত বাসনা-সংস্কারের প্রভাব, কাব্য-সৃষ্টিতে যে নূতনত্ব আনিল, তাহা তত্ত্বের দিক দিয়া নয়, কবিকল্পনার দিক দিয়া সংস্কৃত আলঙ্কারিকের 'রস' নামক বস্তুরই প্রেরণা। অতঃপর ইয়ুরোপীয় সাহিত্যে যুক্তিবাদী ও ভাববাদীর মধ্যে যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল, Romanticism ও Classicism নামক সেই দ্বন্দ্ব কাব্য-সমালোচনায় আজিও অব্যাহত রহিয়াছে —তাহার ইতিহাসে এক্ষণে আমাদের প্রয়োজন নাই।

ইয়ুরোপীয় কাব্যের এই আদর্শই বাংলা কাব্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কাব্যকলার এই আদর্শের পরিচয় ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের মধ্য দিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই আদর্শ কোনও মতবাদ নয়, ইহা, জাতি-যুগ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে দিব্যশক্তি-দাতা—ইহার প্রভাবে কবিকল্পনা উদার, উন্মুক্ত ও 'নবনবোন্মেষশালিনী'। যাহা সার্ব্বজনীন, যাহা সর্ব্ব-মানবের রসপিপাসা চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত, সেই স্বাভাবিক ভাব-প্রেরণা বাংলা

কাব্যকে বিশ্বসাহিত্যের সহিত যুক্ত করিয়াছে। প্রাচীন কাব্যশাস্ত্রের বিধি-নিষেধ এখন অচল। এখানকার কাব্যে অলঙ্কার আছে, কিন্তু ব্যাকরণ নাই; যে গুণদোষসমন্বিত রীতি আছে তাহা কবির ব্যক্তিগত ভাবপ্রেরণার অনুগত, শাস্ত্রনিয়মের অধীন নয়; যে রস আছে তাহাতে পদে পদে রসাভাস ঘটিয়াছে। আধুনিক রুচি 'বিশ্ববিদ্যাবার্ত্তাবিধি'র দ্বারা মার্জ্জিত—সর্ব্বদেশের সর্ব্বযুগের সাহিত্যসম্ভার এক্ষণে রসিকচিত্তের গোচরীভূত। কালিদাস ভবভূতির কবি-প্রতিভা এখন আর সংস্কৃত অলঙ্কারের মানদণ্ডে যাচাই হইবার নয়, নিখিল রসিকচিত্তের রসবিলাসে তাহার প্রকৃত মূল্য নিরূপিত হইয়াছে। তাই কাব্য-সমালোচনায় নূতন আদর্শের—কবিকল্পনার নূতন করিয়া মূল্য-নিরূপণের—প্রয়োজন আছে।

কিন্তু আমার উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হইল জানি না। কবিকল্পনার স্বরূপ-পরিচয়ই ছিল আমার উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক যত কথা বলিয়াছি, তাহাতে ব্যাপারটা অন্ততঃ কতক পরিমাণে পাঠকের মনে ধরিয়াছে বলিয়া আশা করিতে পারি। কোনও তত্ত্বালোচনা বা মনস্তত্ত্বঘটিত বিশ্লেষণ আমার সাধ্য নয়। 'কল্পনা' কথাটির প্রচলিত পরিচিত অর্থ সকলের জানা আছে। কবি-প্রতিভার বিশিষ্ট শক্তিরূপে ইহার যে ধারণা আধুনিক কাব্য-বিচারে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহাই আমার আলোচনার বিষয়। ইহার সঙ্কীর্ণ ও ব্যাপক দুই অর্থেরই ইঙ্গিত আমি ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র অনুসারে এই বস্তুর মূল্য কতটুকু দাঁড়ায় তাহার আভাস দিয়াছি। ইয়ুরোপীয় কাব্যসাহিত্যে ইহার স্বরূপ কি, তাহারও একটু পরিচয় দিয়াছি। এ প্রসঙ্গে সংস্কৃত আলঙ্কারিকের ধারণা ও ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের যুগ-বিশেষের ধারণা তুলনা করিয়া দেখিবার ভার পাঠকের উপরেই রাখিলাম। এক্ষণে 'কল্পনার' কোনো সংজ্ঞা-নির্দ্দেশের চেষ্টা না করিয়া, মানব-মনের এই আদিম প্রবৃত্তি সাহিত্যে কত রূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার মূলে কাব্যসৃষ্টির কত বিভিন্ন প্রেরণা রহিয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য, কবিকল্পনার কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিদর্শন উদ্ধৃত করিব—এই নিদর্শন সমুদ্র হইতে জল-গণ্ডুষের মত। কারণ মানবের মনোজগৎ বিশাল বর্হিজগৎ অপেক্ষা বিস্তৃত; মানুষের জ্ঞান-অজ্ঞানের যত দিক ও যত পথ আছে সর্ব্বত্র এই কুহকিনী কল্পনার অবাধ গতি। মনুষ্যচিত্তের সেই বিরাট বিশ্বরূপ দেখিয়া কবিও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন—

"Not chaos, not
The darkest pit of lowest Erebus
Nor aught of blinder vacancy scooped out
By help of dreams—can breed such fear and awe
As fall upon us often when we look
Into our minds, into the Mind of man."

[প্রলয়ের একাকার,
তলাতল পাতালের অন্ধতম গুহা,
কিম্বা যেই অনাসৃষ্টি আরো শূন্যময়
খুঁড়ে তুলি স্বপনের খনিত্র সহায়ে—
সেও নাহি পারে হেন করিতে বিহ্বল
ভয়ত্রাসে, যথা যবে করি আঁখিপাত
আপনার চিত্তমাঝে, মানব-মানসে।]

—এই অসীম মানবচেতনার উপরেই কাব্য-লোক প্রতিষ্ঠিত; ইহা যেমন আদি-অন্তহীন, কল্পনার সৃষ্টিও তেমনি বহুবিচিত্র। আমি এই কল্পনার পরিচয়-স্বরূপ কয়েকটি কাব্যাংশ এখানে উদ্ধৃত করিব—কোনোরূপ মনস্তত্ত্বঘটিত বিশ্লেষণ অথবা অলঙ্কার-শাস্ত্রসম্মত শ্রেণী-নির্দ্দেশ আমার কর্ম্ম নয়।

প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলির মূর্ত্তিকল্পনা, জড়বস্তুতে চিদ্‌বুদ্ধির আরোপ—মানব-মনের অতি আদিম প্রবৃত্তি। রূপকথার সোনার কাঠি, রূপার কাঠি, পক্ষীরাজ ঘোড়া প্রভৃতি বোধহয় এই কল্পনারই আর-এক স্তর। দশমুণ্ড রাবণ, কচ্ছপীর দুগ্ধ—এমন কি অতি-পরিচিত অশ্বডিম্বের কথাও এই সূত্রে স্মরণযোগ্য। আমাদের কবিকঙ্কণের কমলে-কামিনীর রূপবর্ণনা মনে করুন—কল্পনা যে কেমন অঘটনঘটনপটীয়সী তাহা বুঝিতে পারিবেন। পৌরাণিক দেবদেবীর রূপ-কল্পনায়, রূপ-বিবর্জ্জিতের যে রূপ ধ্যানের দ্বারা কল্পিত হইয়াছে, তাহাতেও এই কবিমানসক্রিয়া বর্ত্তমান। আবার কোনও জ্ঞানকে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য—চিন্তাকে ভাবে, এবং ভাবকে রূপে ধরিতে গিয়া—এই কল্পনাবৃত্তি কেমন বিরোধাভাস ফুটাইয়াছে!—

"শিবের গলে সর্প, নিকটেই সর্পভুক ময়ূর; মস্তকে শীতল গঙ্গা, ললাটে প্রজ্বলিত বহ্নি; জীবনস্বরূপ সুশুভ্র রজতকান্তি, কণ্ঠে মরণচিহ্ন—বিষ-নীলিমা। খাদ্য বলদ সহ খাদক সিংহ; বোকা

লক্ষ্মী, সেয়ানা সরস্বতী; ধনপতি কুবের ভৃত্য, অথচ দিগ্বসন; দগ্ধমদন, অথচ ঔরসজাত পুত্র কার্ত্তিকেয়; অন্নপূর্ণা গৃহিণী, উপজীবিকা ভিক্ষা।"

সত্যসুন্দররূপী শিবের স্বরূপ-কল্পনায় সকল দ্বন্দ্বের লোপ করিয়া, একটি যে ভাব-সত্যের ইঙ্গিত এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কারণ—কল্পনার সেই অঘটনঘটনপটুত্ব। কাব্যের রূপক-রচনা ও উপমায় এই শক্তি এখনও সমান প্রবল রহিয়াছে—এই শ্রেণীর চিত্রাঙ্কনী-কল্পনার একটি পরিচয় উদ্ধৃত করিলাম। কবি আপনার কল্পনাকেই বলিতেছেন—

কখনো বা দাঁড়াইয়া আকাশ-প্রাচীরে,
হস্তে শূল, অট্টহাসি, ভৈরবীর মত
দিতে দেখা উলঙ্গিনী ঝটিকার বেশে!
মেঘ-ঐরাবত-শুণ্ড সাপটিয়া ভুজে
দোলাইতে মুহুর্মুহু; চৌদিকে ঘুরায়ে
বিদ্যুৎ-অঙ্কুশাঘাতে করিতে অস্থির
মাতঙ্গেরে, বিন্দু বিন্দু খসিত অজস্র
গজমুক্তা, প্রসারিত যামিনী-অঞ্চলে!

উৎকৃষ্ট উপমা যেন কবিগণের স্বাভাবিক বাক্-ভঙ্গি—সে যেন ভাবের অলঙ্কার নয়, তাহার যথাযথ প্রকাশ—যাহা অনির্ব্বচনীয় তাহাকে ভাষায় চিত্রিত করিবার একমাত্র উপায়। 'উপমা' শব্দটি আমি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি—এক বস্তুকে অপর বস্তুর দ্বারা, রূপকে ভাবে এবং ভাবকে রূপে, সাদৃশ্যযোগে ফুটাইয়া তোলার যে কাব্যসৃষ্টি, তাহাকেই উপমা বলিতেছি। এই উপমার মধ্যে কবিকর্ম্মের একটি সনাতন রীতি ও কাব্যপ্রেরণার একটি মূল প্রবৃত্তি রক্ষা করা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় এই জাতীয় কল্পনার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিতে বাংলা-কাব্য মণ্ডিত হইয়াছে—রূপ-রূপক ও অরূপ-রূপকের গাঢ়তম রসে তিনি রসিকচিত্ত আপ্লুত করিয়াছেন। এখানে তিনটি মাত্র এই শ্রেণীর কবিতা উদ্ধৃত করিলাম; যথা,—

কালিদাসের—

কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে
ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধকশোভি বল্কলম্।

বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা
বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে ॥

[ছদ্মবেশী শিব উমার তাপসী-মূর্ত্তি দেখিয়া বলিতেছেন—এই নবীন বয়সে সকল আভরণ ত্যাগ করিয়া বার্দ্ধকশোভি বল্কল পড়িলে কেন? বল দেখি স্ফুটচন্দ্রতারকা সন্ধ্যা যদি হঠাৎ অরুণোদয়ে ধূসর কান্তি ধারণ করে, তবে সে কিরূপ হয়?]

রবীন্দ্রনাথের—

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎ-ছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।
হে হংস-বলাকা,
ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
ওই পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অপ্সর-রমণী
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি,
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমির-মগন,
শিহরিল দেওদার বন।

দেবেন্দ্রনাথের—

কি জানি কি নিধি দিয়া গড়িল চতুর বিধি
প্রথম চুম্বন।
কুহরিয়া উঠে পিক,
শিহরিয়া উঠে দিক,
ভরে যায় ফলে ফুলে শ্যামল যৌবন;
বন-তুলসীর গন্ধে বায়ু হয় মাতোয়ারা,
বিটপীর গায়ে গায়ে চাঁদের কিরণ!

* * *

কে আনিল আলোরাশি হৃদয়-আধারে।
অধরের ফাঁক দিয়া
জ্যোৎস্না পড়ে উছলিয়া
দম্পতীর শয্যার আগারে।

রঙীন বার্ণিশ পেয়ে খাটপালা হেসে উঠে—
কে রে এ চতুর কারিগর ?
দেওয়ালের চিত্রগুলি আবার নূতন হ'ল—
কে রে সুনিপুণ চিত্রকর ?
কনক-পারদ লেগে মলিন দর্পণখানি
ধরিল কি অপরূপ শোভা মনোহর !

সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের কতকগুলি বিশিষ্ট অলঙ্কারের মধ্যে এক ধরণের কল্পনা রহিয়াছে। 'ভ্রান্তিমান' নামক অলঙ্কারের একটি নমুনা এইরূপ—

জ্যোৎস্নারাত্রির বর্ণনায় কবি কল্পনা করিতেছেন, গোপবধূগণ শুভ্র জ্যোৎস্না-ধারাকে দুগ্ধভ্রম করিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ঘটহস্তে গো-গৃহে চলিল; বিলাসিনী-গণ নীলপদ্মকে কুমুদভ্রমে কর্ণাভরণ করিল, ইত্যাদি। এই আলঙ্কারিক কল্পনার একটি অতি উপাদেয় দৃষ্টান্ত আধুনিক কাব্য হইতে উদ্ধৃত করিলাম। কৃষ্ণের লুকাচুরি খেলার উল্লেখ করিয়া সখাগণ বলিতেছে—

গগনে যখন লুকাস্ তখন দেখিতে যে পাই মেঘে মেঘে—
হয় ঘনশ্যাম তোর তনুটির রঙ লেগে।
চিনি চিনি ব'লে যদি দেরি হয়, তবে তায়
হাসিয়া ফেলিস্ রে তুই চপল চপলায় !
মেঘ-আবরণে শিখিচূড়া ঢাকা নাহি যায়—
ইন্দ্রধনুতে মাঝে মাঝে তাই উঠে জেগে।—
চপল, আপন তনুটি গোপন কেমনে করিবি মেঘে মেঘে ?

এই সূত্রে আর একটি অতি সুন্দর কবিতা মনে পড়িতেছে—

তার সিঁথায় রাঙা সিঁদুর দেখে
রাঙা হ'ল রঙন ফুল,
তার সিঁদুর-টিপে, খয়ের-টিপে
কুঁচের শাখে জাগল ভুল !
নীলাম্বরীর বাহার দেখে
রঙের ভিয়ান লাগল মেঘে,
কানে জোড়া দুল দেখে তার
ঝুমকো-জবা দোলায় দুল্,
তার সরু সিঁথায় সিঁদুর দেখে
রাঙা হ'ল রঙন ফুল !

কল্পনার আর-একটি শক্তি প্রায় দেখা যায়;—যাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার কৌশল কবি জানেন। 'শকুন্তলা'-নাটকে দুষ্যন্তের বিমান-যাত্রা-বর্ণনায় আছে—

অয়মরবিবরেভ্যশ্চাতকৈর্নিষ্পতদ্ভির্
হরিভিরচিরভাসাং তেজসা চানুলিপ্তৈঃ।
গতমুপরি ঘনানাং বারিগর্ভোদরাণাং
পিশুনয়তি রথস্তে শীকরক্লিন্ননেমিঃ॥

[রথ যে এখন বারিগর্ভ মেঘপুঞ্জের উপর দিয়া চলিয়াছে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে; কারণ, অর-বিবরের মধ্য দিয়া চাতক যাতায়াত করিতেছে, অশ্বপৃষ্ঠে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতালোক বিলসিত হইতেছে, এবং সর্ব্বশেষে—গতিশীল রথের আলোড়নে মেঘবাষ্প বারীভূত হওয়ায় চক্রনেমি শীকরক্লিন্ন হইয়াছে।]

উপরি-উদ্ধৃত কল্পনা-কীর্ত্তিগুলির অলঙ্কার নির্দ্দেশ করিতে পারিব না; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে একটি নূতন অলঙ্কারের সন্ধান দিব, ইহার নাম দিয়াছি—'কাব্যোক্তি' (যেমন 'স্বভাবোক্তি')। একরূপ কল্পনা আছে তাহাতে 'বহুদিনের লুপ্তাবশিষ্ট আতর ও মাথাঘসা'র গন্ধের ন্যায়, প্রাচীন কাব্য-বর্ণিত নায়ক-নায়িকা বা স্থানবিশেষের নামসঙ্কেতে অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক হয়। ইংরেজ কবি কীট্‌স একদা নাইটিঙ্গেল পাখীর গান শুনিয়া ভাববিহ্বল হইয়া লিখিয়াছিলেন—

—Perhaps that selfsame song that found a path
Through the sad heart of Ruth, when sick for home
She stood in tears, amid the alien corn.

ইহার অনুবাদ অসম্ভব, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ইহার প্রায় অনুরূপ একটি বাংলা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের একটি আধুনিক গানে, এই ধরণের কাব্য-সংস্কার অপূর্ব্ববস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছে। ইংরেজী কবিতাটির মধ্যে যে কল্পনার হঠাৎ উন্মেষে রস গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বর্ষার আকাশ প্রথম হইতেই সেই কল্পনায় অনুরঞ্জিত, তাই কবি গাহিতেছেন—

বহুযুগের ওপার হ'তে আষাঢ় এল আমার মনে,
* * *
সেদিন এমনি মেঘের ঘটা রেবানদীর তীরে,
এমনি বারি ঝরেছিল শ্যামল শৈল-শিরে।

মালবিকা অনিমিখে
চেয়েছিল পথের দিকে,
সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে।

এই কল্পনারই আর একটি অতি সুন্দর প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' কবিতাটি—সেই যে—

অচ্ছোদসরসী-নীরে রমণী যেদিন
নামিল স্নানের তরে—

তারপর ঐ এক 'অচ্ছোদ' ভিন্ন আর কোনও নামের উল্লেখ নাই, কিন্তু তাহাতেই যেন সমগ্র কবিতাটির রস পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ওই একটি নামের সঙ্কেতে, কাদম্বরী-কাব্যের মদনমোহিনী নায়িকার যাহা কিছু রূপ—তাহার দেহমনের অনবদ্য ভঙ্গি, কবি-কল্পনার ইন্দ্রজালে ঘনাইয়া উঠিয়াছে।

কবি-কল্পনার পরিচয়হিসাবে যে কয়েকটি উদাহরণ সঙ্কলন করিলাম, তাহাতে 'কল্পনা' বলিতে কি বুঝায় তাহা কতকটা ধরিতে পারা যাইবে; ইহাতে অবাস্তব-প্রীতি, মনঃকল্পিত কাব্যশোভা, রূপ-অরূপের দ্বন্দ্ব, বর্ণনাভঙ্গি, কবির অন্তর্গত ভাবোল্লাস প্রভৃতি কতকগুলি সাধারণ কবি-ব্যাপারের নমুনা আছে। কিন্তু কবিপ্রতিভার যে আর একটি লক্ষণ আধুনিক কাব্যবিচারে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে সেই সৃষ্টিশক্তির একটু পৃথক আলোচনা না করিলে প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সে আলোচনা পরবর্ত্তী প্রবন্ধের জন্য রাখিয়া দিলাম।

৪। কল্পনা ও সৃষ্টিশক্তি

ভিতরের বা বাহিরের যে-কোনও বস্তু বা তথ্যকে একরূপ ভাবদৃষ্টির সাহায্যে অভিনব আকারে প্রকটিত করার যে কবিবৃত্তি—তাহারই নাম কল্পনা, ইহাই কবির কাব্য-প্রতিভা। এই কল্পনা সত্যের বিপরীত, বা মিথ্যা নহে; কারণ, বিজ্ঞানের সত্য কাব্যের সত্য নয়, একথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই কল্পনারও সত্য-মিথ্যা আছে, তাহার প্রমাণ অন্তরূপ। যেখানে কবিদৃষ্টি দুর্ব্বল বা ভাণমূলক, সেখানে কাব্য শব্দের চারুচাতুরী মাত্র, সেখানে সত্যকার কল্পনা

নাই। কল্পনার মূলে কবির ব্যক্তিগত আন্তরিক উপলব্ধি না থাকিলে, কাব্য কতকগুলি শব্দ ও অর্থগত অলঙ্কার-রীতির কসরৎ হইয়া দাঁড়ায়। উপমা প্রভৃতির মধ্যে কল্পনার অতি সরল ও স্বাভাবিক বিকাশ আছে, তাহার কারণ, একটি মাত্র উপমা বা উপমা-সমুচ্চয়ের দ্বারা যথার্থ কাব্যই গড়িয়া উঠে, উপমাই সেখানে বাণী অর্থাৎ অন্তর্গত ভাবের বাঙ্ময় রূপ—উপমা অলঙ্কার বা প্রসাধন নয়।

তথ্যের সত্য কবির উপজীব্য নয়; কবির দৃষ্টি ভাবানুসারী, এই ভাব-দৃষ্টির শর-সন্ধানে কবি যে লক্ষ্যভেদ করেন, তাহা মানুষের দেহমনপ্রাণের সাড়ায় সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। সাবিত্রী যমের হাত হইতে স্বামীকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন—ইহা যে তথ্য বা ইতিহাস নয়—কবিও তাহাও জানেন, তথাপি একনিষ্ঠ প্রেমের যে শক্তি তিনি কল্পনায় উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা এতই সত্য যে, তাহাকে প্রকটিত করিবার জন্য তিনি যে কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা একটুও অতিরঞ্জিত বোধ হয় না। কল্পনার দ্বারা এই যে সত্য-সন্ধান—মনে হয়, ইহার মধ্যেই সৃষ্টি-ধর্ম্ম রহিয়াছে। কাব্যপ্রেরণায় ও প্রত্যক্ষ কাব্য-রচনায় ইহার লক্ষণ কি? সৃষ্টি কথাটির প্রথম ও শেষ তাৎপর্য্যই বা কি? এইরূপ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে কি দাঁড়ায়, এক্ষণে তাহাই দেখিতে হইবে।

কবি যে স্রষ্টা, তিনি যে কিছু সৃষ্টি করেন—একথা নূতন নয়, আধুনিক কাব্যবিচারে ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ ধারণা। কিন্তু ইহার নানা অর্থ আছে। এই নানা অর্থের মধ্যে কোন্‌টি শেষ পর্য্যন্ত কবি-কীর্ত্তির প্রধান লক্ষণ হিসাবে, কবির দিব্যপ্রযত্নের যথার্থ-ধারণারূপে গ্রহণ করা উচিত—আমি সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া এই সৃষ্টি-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। যাঁহারা Aesthetics বা রসতত্ত্বের উচ্চ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান, তাঁহাদের মতে—'রস'ই "সকল-প্রয়োজন-মৌলীভূত"—"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং", অতএব কাব্যরচনা-ব্যপদেশে কবি রসেরই সৃষ্টি করেন। ইহার উত্তরে প্রথমেই বলিতে হয়, কবি কাব্যসৃষ্টিই করেন, রসসৃষ্টি কাব্যের মুখ্য প্রয়োজন নয়। বস্তুতঃ এই কথাটিই প্রকৃত কাব্য-পরিচয়ের প্রধান ভিত্তি—ইহাই যদি অস্বীকার করা হয়, তবে কাব্যসৃষ্টি বলিতে যাহা বুঝি তাহার আলোচনার উপায় বা প্রয়োজন আর থাকে না। রস একটি নির্ব্বিশেষ

পদার্থ, কিন্তু কাব্য-প্রেরণা এতই বিশিষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট যে, তাহা প্রত্যেক কাব্যে একটি নিজস্ব ও বিলক্ষণ রূপ লইয়া সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। কাব্য-সৃষ্টিতে কবির সমগ্র সাধনা ও চেষ্টা মুখ্যতঃ রসকে লইয়া ব্যাপৃত নয়, একটি অতি অপূর্ব্ব ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে কেমন করিয়া যথাযথ আকারের মূর্ত্তিমন্ত করিয়া তুলিবেন, ইহাই কবির একমাত্র ভাবনা— ইহাতেই তাঁহার আনন্দ। যদি সেই সাধনায় কবি সাফল্য লাভ করেন, সেই সাফল্যের নামই সৃষ্টি। যিনি কাব্যরসিক তিনি কবিকল্পনার এই বিশেষত্বেই মুগ্ধ। যিনি দার্শনিক তিনি সকল বৈচিত্র্যকে একাকার করিয়া হাঁফ ছাড়িতে চান, তাই তাঁহার কাব্যজিজ্ঞাসা রসতত্ত্বে পৌছিয়া তবে নিবৃত্তি হয়। সৃষ্টি অর্থেই বহু; কবির আনন্দ সেই বহুকে উপলব্ধি করিয়া,—দার্শনিকের আনন্দ সেই বিশেষকে নির্ব্বিশেষে পরিণত করিয়া। কবির কাব্যরচনায় পাই—

> কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
> কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
> মেঘ্‌লা দিনে দেখেছিলাম মাঠে
> কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
> ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে,
> মুক্তবেণী পিঠের পরে লোটে।
> কালো? তা সে যতই কালো হোক্
> দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

—ইত্যাদি। গাঁয়ের লোক যাকে কালো বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, কবির চক্ষে সে একটি বিশিষ্ট রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে-রূপ এত বিশিষ্ট যে কবি নিজে তাহার একটি নামকরণ করিয়াছেন। কবির মুগ্ধ হওয়ার প্রধান কারণ—মেয়েটির 'কালো হরিণ-চোখ' বটে, কিন্তু তাঁহার সেই ভাবটি ঠিক স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য স্থান, কাল, এমন কি চাহনির ভঙ্গিটুকু পর্য্যন্ত ধরিয়া দিতে হইল। কারণ, "কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ" ত' কতরূপে মুগ্ধ করিতে পারে, তাহার আকার ও ভঙ্গিমা কত মুহূর্ত্তে, কত অবস্থায়, কত রূপ হইতে পারে,—ঠিক ওই স্থান, ওই কাল, ওই চাহনিটি ধরিয়া দিতে না পারিলে, কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি বা কল্পনার বিশিষ্ট প্রেরণা মাঠে মারা যাইত,— particularity সকল কাব্যসৃষ্টির

প্রাণ, তাহারই অভাবে কল্পনার সত্য রক্ষা হইত না। কবির কাজ এই পর্য্যন্ত; তারপর যে আনন্দ বা রসাস্বাদ অনিবার্য্যরূপে ঘটে, তাহার প্রকৃতি-নির্ণয় দার্শনিকের কর্ম্ম, কবির নয়। অতএব রসবাদীর রসতত্ত্ব যে কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা নয় ইহা নিশ্চিত। কবি যদি সর্ব্ববস্তুতে 'ব্রহ্মাস্বাদ' করিতেন, তবে আর কথা কহিতেন না, 'রসো বৈ সঃ' বলিয়া চুপ করিয়া যাইতেন, কবি-কর্ম্মের কোন প্রয়োজনই থাকিত না। কাব্যসৃষ্টির প্রারম্ভে কবিচিত্তে যে রসোল্লাস হয়—সেই emotion অতিমাত্রায় বস্তুগত ও ব্যক্তিগত, অতিশয় অনন্যসাধারণ ও সুনির্দ্দিষ্ট; এই রসকে রূপ হইতে বিচ্ছিন্ন করা চলে না, ইহা নির্ব্বিশেষ নয়, সর্ব্বত্রই বিশেষের অনুবন্ধী। এজন্য কাব্যবিশেষের ভাষা, ছন্দ-ধ্বনি, শব্দচিত্র প্রভৃতি যাহা কিছু উপাদান—তাহার কোনটিকে বাদ দিবার বা একটু বদ্‌লাইবার যো নাই। এজন্য বিভিন্ন কবিতার যে নাম দেওয়া হয় তাহা নিরর্থক—সেই নাম হইতে কবিতার কিছুমাত্র পরিচয় ঘটে না। যতক্ষণ না কবিতার শেষ অক্ষর পর্য্যন্ত পাঠ করা যায়, ততক্ষণ কবির কল্পনাটি বিশিষ্ট ও পরিচ্ছন্ন আকারে কবিতা হইয়া ওঠে না। একটি উদাহরণ দিব। জ্যোৎস্না-রাত্রির একটি রূপ, বিশেষ করিয়া তাহার স্তব্ধতার মাধুরী, কবি একটি শব্দচিত্রে এইরূপ আঁকিয়াছেন—

> হের, সখি আঁখি ভরি' শুভ্র নীরবতা
> পাহাড়ের দুটি পার্শ্ব জ্যোৎস্না আর মসী।
> নিথর নিশার কণ্ঠে কি দিব্য বারতা,
> কাণ পেতে শোন হেথা বালুতটে বসি'
> নীরবে নদীর জল চলে সাবধানে,
> সুর মিলাইয়ে ওই তারকার সাথে,
> পথ চেয়ে চেয়ে বায়ু মগ্ন কার ধ্যানে—
> সন্তর্পণে হাতখানি রাখ মোর হাতে।
> যাদুকর চন্দ্রকর তালের বাকলে
> হেথা হোথা ভুলিয়াছে রূপার ফলক,
> মাধবীলতার ফাঁকে বকুলের তলে
> কে তরুণী মুঠি ভরি' ধরে চন্দ্রালোক!
> পাখি লুকায়েছে আঁখি পালক-শিখানে—
> আজিকার কথা, বঁধু কহ কাণে-কাণে।

কবিতাটির নাম 'কাণে কাণে'। কিন্তু কবির প্রত্যক্ষ অনুভূতি-ঘটিত কল্পনা, এই কবিতাটির প্রত্যেকটি শব্দ-বর্ণনার—প্রতি বর্ণচ্ছেদটির ভিতর দিয়া, পৃথক ও সমগ্রভাবে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে—ইহাদের একটিকেও বাদ দিলে কবিতার অঙ্গহানি হইবে। একেবারে শেষ কথাটিতে পৌঁছিলে তবে এই বিশিষ্ট অনুভূতির—এই খণ্ড রসের—অখণ্ড-রূপটি সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত হইবে, তার পূর্ব্বে নয়। 'শুভ্র নীরবতা' বা 'কাণে কাণে'—যে নামই থাক না কেন, সম্পূর্ণ বাণীটি যতক্ষণ না পাইতেছি, ততক্ষণ জ্যোৎস্নারাত্রির যে শুদ্ধ রূপটি কবির ধ্যানকল্পনায় ধরা দিয়াছে তাহা যে ঠিক কেমন, সে ধারণা অসম্ভব। তাই বলিয়াছিলাম, কাব্যমাত্রেই এমনি আপনাতে আপনি নির্দ্দিষ্ট যে, আর কোনও উপায়ে সাধারণভাবে তাহার পরিচয় দেওয়া যায় না।

কাব্যসৃষ্টির প্রসঙ্গে অনুকরণের কথা আসে। সৃষ্টি অর্থে অনেক স্থলে মৌলিকতা বা অনুকরণ-বিমুখতার প্রশ্ন ওঠে। উৎকৃষ্ট কাব্যে, বহির্জগৎ বা পূর্ব্বসৃষ্টির সাদৃশ্য না থাকাই যদি সৃষ্টিশক্তির লক্ষণ হয়, তবে কি কবি-কল্পনা অবস্তু-বিলাসের নামান্তর! এরূপ প্রশ্ন এক-কালে বিচারযোগ্য থাকিলেও, এ জিজ্ঞাসা কাব্য-সৃষ্টির সম্বন্ধে বড়ই স্থূল ধারণার পরিচায়ক। এ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে প্রসঙ্গান্তরে যাহা বলিয়াছি, এখানেও তাহাই বলিব। কবিকল্পনা বহির্জগৎ বা বাস্তব সৃষ্টিকে উপেক্ষা করিতে পারে না, বরং বাস্তব অনুভূতির বিশিষ্ট emotion হইলেও—তাহা Ideal Imitation বা কবির মনোমত অনুকৃতি।

তথাপি এই বাস্তব-অবাস্তবের কথাটা এই প্রসঙ্গে একটু আলোচনা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। কবি কীট্সের Beauty-Truth-সূত্রটির কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। ঐ কবির আর-একটি অপূর্ব্ব উক্তি আছে,—"What the Imagination seizes as Beauty must be truth, whether it existed before or not."—অর্থাৎ "কল্পনায় যাহাকে সুন্দর বলিয়া চিনিয়া লই, তাহা সত্য হইতে বাধ্য—তাহা অভূতপূর্ব্ব হউক বা ভূতপূর্ব্বই হউক।" এখানে বাস্তব-অবাস্তবের দ্বন্দ্ব কবি স্পষ্টই অস্বীকার করিয়াছেন। যে ভাবৈকরস চেতনায় সৃষ্টির মর্ম্মস্থল উদ্ঘাটিত হয়, তাহার সাহায্যে আনন্দের অবশ্যম্ভাবী আবেগে যাহাকে উপলব্ধি করি—সেই সুন্দর সারাচিত্তকে জয় করিয়া আত্মার

পদ্মাসনে যখন বিরাজ করেন, তখন সেই যে আত্মসমর্পণ, তাহাই ত সত্যোপলব্ধি। বিচার-বুদ্ধির ও কবিদৃষ্টির এই বিরোধ তর্কে ঘুচিবে না; ইহা কবির মতই উপলব্ধি করিবার—যাহার সে শক্তি নাই তিনি প্রকৃত কাব্য-উপভোগে বঞ্চিত। কবিকল্পনার সত্য বাস্তব-অবাস্তবের সীমারেখায় বিভক্ত নয়—একটি অপূর্ব্ব চেতনায় নির্দ্বন্দ্ব হইয়া বিরাজ করে।

অতএব কবিকল্পনায় বাস্তব-অবাস্তবের প্রশ্ন অবান্তর হইয়া পড়ে। তথাপি কল্পনা বলিতে একটি যে সংস্কার আমাদের মনে আধিপত্য করে, তাহাতে লোকাতিক্রান্ত Ideal-সৃষ্টির প্রতি আমাদের একটি স্বাভাবিক আসক্তি আছে বলিয়া মনে হয়। শেক্‌স্‌পীয়ারের এত উৎকৃষ্ট চরিত্রসৃষ্টির মধ্যেও Caliban-নামক অপূর্ব্ব কল্পনাটি যেন বেশী করিয়া আমাদের সম্ভ্রম আকর্ষণ করে। মনে হয়, Caliban যেন একটি সত্যকার নূতন সৃষ্টি, উহাতে যেন সৃষ্টির নবপর্য্যায়ের আভাস রহিয়াছে। উহা পরিচিত জগতের বহির্ভূত, অথচ মানুষের মনে যে sentiment of reality বা বাস্তব-সংস্কার আছে—তাহার সম্পূর্ণ অনুগত, তাই তাহাকে জীবন্ত, প্রাণধর্ম্মী বলিয়া মনে হয়। অতি স্থূল কল্পনার বা রূপকথার দানব-দৈত্য-পিশাচের মত কোনো অনাসৃষ্টি, আর এই Caliban-এর মত উৎকৃষ্ট সৃষ্টি তুলনা করিয়া দেখিলেই বাস্তব-অবাস্তবের মধ্যে কবিকল্পনা কোথায় তাহার সত্য রক্ষা করিতেছে, কাব্য-সৃষ্টির উৎকৃষ্ট লক্ষণ কি, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কবিকল্পনার এই রহস্য বুঝিতে পারিয়াই Wordsworth ও Coleridge দুইজনে মিলিয়া Lyrical Ballad নামক কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন; তাহাতে Coleridge নিজে অবাস্তবকে বাস্তব করিয়া তুলিবার ভার লইয়াছিলেন—Ancient Mariner মত কবিতায়; Wordsworthএর উপর ভার ছিল অতি-পরিচিত দৈনন্দিন বাস্তবকে অবাস্তবের চমৎকারে মণ্ডিত করার। প্রকৃতিকে লইয়া এই খেলার ভিতরে কল্পনার উপর বাস্তবের প্রচ্ছন্ন শাসন থাকিলেও ইহাতে বাস্তব-অবাস্তবের দ্বন্দ্বকে অনেকটা অস্বীকার করাই হইয়াছে। কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে উৎকৃষ্ট কবিকল্পনার ধারনা এইরূপ দাঁড়ায়। যাহা লোকাতীত, যাহা সাধারণ অর্থে অবাস্তব, অথচ কবির মনে যাহা বৃহত্তর, এবং অতিশয় স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া দেখা যায়, যাহাকে তিনি 'forms more real than living man' বলিয়া ঘোষণা করেন, তাহা সত্যই বাস্তববিরোধী নয়। কারণ,

যাহাকে বাস্তব-জগৎ বলি, তাহার মধ্যে সৃষ্টির যে গূঢ় রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—কবিকল্পনা তাহাকে ভেদ করিতে পারে বলিয়াই এমন বস্তু নির্ম্মাণ করে, যাহা বিসদৃশ হইলেও অনুভূতির উচ্চতর সোপানে অসংগত বা অপ্রাকৃত বলিয়া মনে হয় না; আমাদের মনে বিস্ময় বোধ হইলেও কোনও বিরোধ উপস্থিত হয় না। প্রকৃতির গোপন কক্ষে, মায়া-মুকুরে তাহার যে মর্ম্মের রূপটি প্রতিফলিত হয়, কবিকল্পনার ইন্দ্রজাল তাহাকে আবিষ্কার করে,—সৃষ্টির নিগূঢ় সত্য আর-এক স্রষ্টার কল্পনায় আপনি আসিয়া ধরা দেয়।

এজন্য, বাস্তবকে সম্পূর্ণ অপসারিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে একটি আদর্শ-রমণীয় চিত্তচমৎকারী ভাবস্বর্গ নির্ম্মাণকেই কবিশক্তির পরাকাষ্ঠা বলিলে যথার্থ হয় না। বরং উৎকৃষ্ট কল্পনাই, চিৎ ও জড়, Ideal ও Real, ঐক্যসূত্রে গাঁথা হইয়া যায়। কবিকল্পনা বাস্তবের বাস্তবতাকেই—World of facts-কেই—দিব্য অনুভূতিযোগে অভিনব-সুন্দর করিয়া পুনঃসৃষ্টি করে; কবিশক্তির মহিমা ও মৌলিকতা এইখানে। জগত ও জীবনের যত-কিছু তুচ্ছতা ও অতি-পরিচয়কে কবি-কল্পনার এমন এক নূতনতর চেতনায় উদ্ভাসিত করে, মানুষের চিরন্তন ক্ষুধা—তাহার বাসনা-কামনার মলা-মাটিকেই এমন অক্ষয় ও অসীম সৌন্দর্য্যে ভূষিত করে যে, বাস্তবের কর্কশ সুরগুলাই এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতে বাজিয়া ওঠে; তাহাকে ঠিক Imitation of Nature বলা চলিবে না, কারণ, Nature-কথাটির অর্থই যে এখানে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। কবিকল্পনার আশ্চর্য্য কীর্ত্তির উল্লেখ করিয়া একজন * বলিতেছেন—

"What we have come to value most in art, is not the imitation of nature, but the unprecedented and undreamt of harmonies it creates, the surprise and strangeness of those authentic and yet unforeseeable .visions, those worlds of beauty and truth and wonder which it opens to the imagination. Even in a phrase like

Tiger ! Tiger ! burning bright
In the forests of the night.

* Logan Pearsall Smith.

We seem to recognise the character of something inevitable, something that has a veracity of its own, that must exist, and has always existed, and from which we cannot withhold the name of reality."

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে—"যাহা স্বপ্ন, কাব্যে তাহাই জাগর-লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়; সত্য, সুন্দর ও চমৎকারের কল্পলোক আমাদের মানসগোচর হয়; সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, এ যেন এমনটি হইবারই কথা, এ যেন চিরদিন আছে ও থাকিবে, ইহাকে সত্য না বলিয়া উপায় নাই। ইহাই প্রকৃত কবিকীর্ত্তি, ইহাকে প্রকৃতির অনুকরণ বলা যায় না।"—কিন্তু মনে হয়, কথাটা এমন করিয়া না বলিয়া যদি বলি—কবিকল্পনা বৃহত্তর বাস্তবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, সে বাস্তবের পক্ষে স্বপ্ন-জাগরের বিরোধ নাই, বাহিরের ক্ষুদ্র ও অন্তরের বৃহৎ সেখানে একই অনুভূতি-সত্যের আলোকে শাশ্বত-সুন্দর, তাহা হইলে কবি-কল্পনাকে অদ্বৈত-দৃষ্টির গৌরব দান করা হয়, এবং তাহা যথার্থ। একথা স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি নাই যে—কবি 'adds a new presence to the world,' অর্থাৎ জগতের যে-রূপটি প্রত্যক্ষগোচর, কবি তাহাতে নূতন কিছু সংযোগ করেন—রূপকে অপরূপ করিয়া তুলেন। তাই কবি নিজেই বলিতেছেন—

দিয়েছ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

* * *

মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশী ফিরে তুমি পাও।

এইবার প্রশ্ন উঠিবে, বাস্তব-অবাস্তবের দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করিলে, কবি-কল্পনার সুন্দর-চেতনায় একটি নির্দ্বন্দ্বের অনুভূতি—একটা Universal সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তাহা হইলে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির বৈশিষ্ট্য (Particularity) এই সার্ব্বভৌমিকতা খর্ব্ব করিতেছে না? ওই Universal যদি শ্রেষ্ঠ কল্পনার মূলগত সত্য হয় তবে কাব্য-বিশেষের মৌলিকতার মূল্য কতটুকু? কবির ভাবস্বাতন্ত্র্য এই সত্য-সুন্দরের পরিপন্থী কিনা? ইহার উত্তরে একজন পণ্ডিতের * উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

* C. H. Herford (Essays by the Members of the English Association Vol. VIII)

"The liberty of imagination is incompatible only with the servile kind of imitation. It is the most vital factor in that liberation of the 'Universal' from disturbing particulars (from second rate or outworn substitutes for the Universal) which Aristotle found the essence of poetry to be. This gift, explicitly and for the first time vindicated by the Romantic critics and poets, is rightly used by the Classicists to reach the Universal, the One amid the Manifold, Permanence through Change."
—ইহার অর্থ এই যে, বিশেষের প্রতি কবির যে নিষ্ঠা, অর্থাৎ কবির কল্পনা-স্বাতন্ত্র্য, নির্ব্বিশেষকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করে। শাস্ত্র যাহাকে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ছাঁচের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখে, কবির স্বাধীন কল্পনা সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিয়া যে অনন্ত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে, তাহাতে সেই নির্ব্বিশেষকেই মুক্তি দেওয়া হয়—বহুর মধ্যে যে এক, অনিত্যের মধ্যে যে নিত্য, তাহাকেই আরও ভালো করিয়া উপলব্ধি করিবার সুবিধা হয়। আমাদের কবিও কোনও একটি সন্ধ্যার বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিতেছেন—

আর হবে না কভু।
এম্‌নি করে'ই, প্রভু,
এক নিমিষের পত্রপুটে ভরি'
চিরকালের ধনটি তোমার লও যে নূতন করি'!

—শেষ দুই ছত্রে Universal ও Particularএর সম্বন্ধটি কি সুন্দর করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন!

এইবার আগেকার কথা স্মরণ করিতে হইবে। কবির সৃষ্টি-কৌশল কাব্যের মধ্যেই প্রকটিত হয়, অর্থাৎ, কল্পনার যাহাকিছু উৎকর্ষ বা বৈশিষ্ট্য—কাব্যসৃষ্টি-সম্বন্ধে এই যে এত কথা, তাহার পরিচয় পাই কবিতাবিশেষের রচনা-সর্ব্বস্বের মধ্যে। কবির কল্পনা কাব্যকে এতটুকু ছাড়াইয়া আর কোথাও নাই। অতএব কবি-প্রতিভার সত্যকার প্রমাণ—কাব্যসৃষ্টি বলিতে যাহা বুঝায়—তাহা ঐ বাণীরই সৃষ্টি। একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিগত অনুভূতিকে তাহার যথাযথ বাঙ্ময়রূপে

প্রকাশ করাই কবির সৃষ্টিশক্তির নিদর্শন। এই প্রকাশ-কৌশলের মধ্যেই কবি-প্রতিভার আদি ও শেষ পরিচয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবি যাহা সৃষ্টি করেন তাহা একটি সুপরিচ্ছিন্ন ভাবরূপ; ভাব অর্থে কবির হৃদগত অনুভূতি, রূপ অর্থে তাহার বাঙ্ময় মূর্ত্তি। কিন্তু কবির ওই হৃদ্গত অনুভূতি পৃথকরূপে আমাদের প্রত্যক্ষ নহে, তাহার বাঙ্ময় রূপটিকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। কবির কল্পনা বলিতে আমরা সাক্ষাৎ কবিতা ভিন্ন আর কিছুই বুঝিব না। এই যে কবিতার আকারে কবির হৃদ্গত কল্পনাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহার কারণ, কবি ভাবকে রূপ দিতে পারেন; কেমন করিয়া তাহা পারেন, তাহার উত্তর— কবির দৃষ্টি অতিশয় একাগ্র ও বস্তুনিষ্ঠ, এবং কবির অনুভূতিতে একটি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে। কবি সকল বস্তুই, এমন আপনার মত করিয়া, নূতন করিয়া দেখেন বলিয়াই, সেই সকলের বাণীরূপ এমন জীবন্ত হইয়া ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়ুরোপীয় কাব্যে এই বস্তুনিষ্ঠার, এই তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়-চেতনার উল্লেখ করিয়া সমালোচনাচার্য্য Sainte Beauve বলেন, এই যুগই সর্ব্বপ্রথম মানুষকে Sentiment of Reality-তে দীক্ষিত করিয়াছে। তাই পূর্ব্বোক্ত ইংরেজ সমালোচক বলিতেছেন, এই যুগের কবিগণ বহিঃ-প্রকৃতি সম্বন্ধে এতই সচেতন, রূপবিশেষের বৈশিষ্ট্যে এতই মুগ্ধ যে—

"We find shape and identity perceived with a magical precision and delicacy, the mind fastening as it were with a peculiar intensity of vision upon any counterpart in the visible world of what it has imagined with delight."

এই কবিদৃষ্টিই কাব্যসৃষ্টির মূল প্রেরণা—এই দৃষ্টিই বাণীর জনয়িতা। এ বিষয়ে আর অধিক অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আমি এইরূপ কাব্যসৃষ্টির দু-একটি উদাহরণ দিব। কল্পনা সর্ব্বত্র একজাতীয় নয়, কিন্তু যেখানে যেমন সেখানে তদনুরূপ বাণী-বিগ্রহ-নির্ম্মাণে কবিপ্রতিভা যে সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছে, আশা করি, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

(১) যে রূপযৌবন উমার পক্ষে ব্যর্থ হইল, মদন যাহার সহায়তা করিতে গিয়া ভস্ম হইয়া গেল, অবশেষে কৃচ্ছ্র-তপস্যায় নিয়মক্ষামমুখী হইলে পর গৌরীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল—সেই রূপযৌবনকে মদনের সাহায্যে ছদ্মবেশ করিয়া, ঠিক উল্টা পথে, সেই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে গিয়া আর-

এক নায়িকার মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডি কবি-কল্পনায় কি অপরূপ সৃষ্টিসৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে! চিত্রাঙ্গদা মদনকে বলিতেছে—

মীনকেতু,
কোন্ মহা রাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া
অঙ্গসহচরী করি' ছায়ার মতন—
কি অভিসম্পাত? চিরন্তন তৃষাতুর
লোলুপ ওষ্ঠের কাছে আসিল চুম্বন,
সে করিল পান। * * *
মনে
পড়িতেছে একে একে রজনীর কথা,
বিদ্যুৎ-বেদনা সহ হতেছে চেতনা,
অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতীন,
আর তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে
স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে প্রতিদিন
পাঠাইতে হ'বে আমার আকাঙ্ক্ষা-তীর্থ
বাসরশয্যায়, অবিশ্রাম সঙ্গে রহি'
প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষু মেলি'
তাহার আদর। ওগো, দেহের সোহাগে
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর? হে অতনু,
বর তব ফিরে লও।

যে চরিত্র-কল্পনায় ও নাটকীয় ঘটনা-সংস্থানে এই উক্তি নির্গত হইয়াছে তাহার সম্পর্কে ইহা যে কত সহজ অথচ বিস্ময়কর, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই কল্পনায় মানবাত্মার একটি অভিনব মহত্ত্ব-শিখর আবিষ্কৃত হইয়াছে। কামনা, বাসনা ও দেহতৃষ্ণার মধ্য দিয়াই যে সুখের নরক ও দুঃখের স্বর্গ মানব-প্রাণের অনুভূতি-গোচর হয়, যাহার নৈরাশ্য-বিভীষিকায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আধুনিক ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন—"The soul may be trusted to the end"। মানব-জীবনের সেই বিচিত্র নিয়তি, পৃথিবীর ধূলামাটির সেই কাঞ্চন-দ্যুতি প্রাচীন কবিগণের কল্পনার অগোচর ছিল, কিন্তু আধুনিক কাব্যে তাহা এমন করিয়া স্বপ্রকাশ হইয়াছে।

(২) কবি বলিতেছেন,

মনে হয় ভ্রমিয়াছি দূর সিন্ধুপারে
মহা মরুদেশে—যেখানে লয়েছে ধরা
অনন্ত কুমারী-ব্রত, হিমবস্ত্র-পরা,
নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ, সর্ব্ব আভরণহীন ;
যেথা দীর্ঘ রাত্রিশেষে ফিরে আসে দিন
শব্দশূন্য সঙ্গীতবিহীন ; রাত্রি আসে,
ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে
অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্র জননীর মত।

—মনে হয় ভ্রমণ যদি এমন হয়, তবে সত্যকার ভ্রমণে প্রয়োজন আছে কি? কোনো ভূপর্য্যটক কি এপর্য্যন্ত মহামেরু-দেশের এমন সংক্ষিপ্ত অথচ সত্যকার রূপ, আমাদের মানসচক্ষে, এমন করিয়া তাহার সমস্ত রহস্য পুঞ্জীভূত করিয়া, এমন চিন্ময় করিয়া তুলিতে পারিয়াছে?

(৩) কবির নিজের কথায়, "চিরদিবসের বিশ্ব আঁকি' সম্মুখেই দেখিনু সহস্রবার দুয়ারে আমার।"—সে কেমন দেখা?—

শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়াবটে ;
নদীর এপারে ঢালুতটে
চাষী করিতেছে চাষ ;
উড়ে চলিয়াছে হাঁস
ও পারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরতলে।
চলে কি না চলে
ক্লান্তস্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ-নিহত
আধ-জাগা নয়নের মত।
পথখানি বাঁকা
বহুশত বরষের পদচিহ্ন আঁকা
চলেছে মাঠের ধারে—ফসল-ক্ষেতের যেন মিতা—
নদীসাথে কুটীরের বহে কুটুম্বিতা।

—চির-পরিচিতের এই নব-পরিচয় সৃষ্টিশক্তির আর-এক লক্ষণ।

(৪) কাব্য-সৃষ্টির আর-একটি উদাহরণ দিব। লোক-বিশ্রুত "মর্ম্মর-স্বপ্ন" দেখিয়া কবি-কল্পনায় যে রূপাবলী ফুটিয়াছে, তাহার একটি এইরূপ—

জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে,
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে,
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।

—তাজ মহলের মর্ম্মর-কান্তির কঠিন বাস্তবতা, "ফুটিল যা সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে"—তাহাকে এমন করিয়া 'ভাষার অতীত তীরে' 'দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে', অন্তরতম অনুভূতি কল্পনার অরূপ-রূপে ফুটাইয়া তুলিবার যে শক্তি, তাহার পরিচয়ও বাক্যাতীত—অন্তরে উপলব্ধি করিতে হয়।

এই যে কাব্যসৃষ্টি, যাহার পরিচয় কেবলমাত্র প্রাণের প্রাবল্যে নয়—অতি বিশিষ্ট ও ব্যক্তিগত ভাবসৃষ্টি যাহার প্রাণ, আবার অপূর্ব্ব বাক্‌ভঙ্গিতে যাহার প্রকাশ, যাহা কবির নিজস্ব কল্পনায় অনুবিদ্ধ অথচ নিখিল-মানব-চেতনার অনুগত, যাহা অ-পূর্ব্বপরিচিতের মত চমৎকার, অথচ চিরসত্যের মত হৃদয়-গ্রাহী—ইহারই অভাব লক্ষ্য করিয়া সমলোচকপ্রবর Herford * বলিতেছেন—

"Byron lacks supreme imagination. With boundless resources of invention, rhetoric, passion, wit, fancy, he has not the quality which creates out of sensation, or thought or language, or all together, an action, a vision, an image or a phrase which penetrated with the poet's individuality has the air of a discovery, not an invention, and no sooner exists than it seems to have always existed. A creator in the highest sense Byron is not."

[অর্থাৎ অতি উৎকৃষ্ট কল্পনাশক্তির পরিচয় বায়রণের কাব্যে নাই। তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি অফুরন্ত; বাক্যচ্ছটা, ভাবাবেগ, সূক্ষ্মবুদ্ধি, কল্পনা—এ সকলই তাঁহার প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও তাঁহার এমন শক্তি ছিল না যে, ভাষা বা ভাবনা বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি—ইহাদের যে-কোনও একটি, অথবা সব কয়েকটিকে লইয়া এমন একটি ঘটনাবস্তু বা ভাবদৃশ্য, বা রূপবিগ্রহ বা শব্দচিত্র সৃষ্টি

* Age of Wordsworth.

করিতে পারেন যাহার গঠনে কবির স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বিদ্যমান থাকিলেও স্বকপোলকল্পিত বলিয়া মনে হইবে না। মনে হইবে, এ সকল যেন নিত্যকালের, কবি এগুলিকে প্রকাশিত করিলেন মাত্র। বায়রণ অতি উচ্চদরের স্রষ্টা ছিলেন না।]

তাহা হইলে, কবিপ্রতিভা-সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, কাব্যের বিষয়, উপাদান বা বস্তু যাহাই হউক, কবিকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ এই সৃষ্টিশক্তি। কাব্যবস্তুর বৈশিষ্ট্য, মৌলিকতা প্রভৃতি যতকিছু উৎকর্ষের মূলেও এই সৃষ্টি-প্রতিভা। কবি-সৃষ্টির কতকগুলি সর্ব্ববাদীসম্মত লক্ষণ ও তৎসংক্রান্ত সমস্যার উত্থাপন ও আলোচনা করিয়া পরিশেষে যাহা দাঁড়াইল, আমি তাহাকে কবিশক্তির প্রধান লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাই। কবি কেমন করিয়া ভাববস্তুকে কাব্যবস্তুতে পরিণত করেন, আত্মগত অনুভূতি ও পরিচিত্তের মধ্যে সেই যে অদ্ভুত সেতু-নির্ম্মাণ, ভাবের সেই তির্য্যক প্রতিকৃতি—যাহার নাম বাণী, তাহারই জিজ্ঞাসা কাব্যকথার মূল প্রসঙ্গ বলিয়া মনে রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, কাব্যসৃষ্টি অর্থে এই বাণীরই সৃষ্টি, ইহার সকল কাব্যজিজ্ঞাসার আদি ও শেষ সমস্যা।

কাব্য ও জীবন

আধুনিক কালে ইয়ুরোপীয় সাহিত্যে যে কাব্যবিজ্ঞানের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাতে বহু মনীষী কাব্য-সম্বন্ধে যে সকল উপাদেয় তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ করিতেছেন, সে সকলের মধ্যে একটা কথা বিশেষভাবে সকলকেই আলোচনা করিতে দেখি। সে কথা এই যে, সকল উৎকৃষ্ট কাব্য জীবনেরই সত্য ও সুন্দরতম প্রতিরূপ—জীবন-দীপিকা। কাব্য কল্পনামাত্র নয়, জগতের বিপুল বিস্তারের মধ্যে যে সত্য-সুন্দরের প্রতিবিম্ব শতখণ্ড দর্পণে ভগ্ন ও অসংলগ্নভাবে বিকীর্ণ হইয়া আছে—অত চঞ্চল উর্ম্মি-বন্ধুর নদীবক্ষে চন্দ্রবিম্বের ন্যায় যাহা পূর্ণাবয়ব হইতে পারিতেছে না—তাহারই একটা পূর্ণ প্রতিচ্ছবি কবিকল্পনায় ধরা পড়ে; কবি-প্রতিভাই সেই প্রজ্ঞা, যাহার বলে সৃষ্টির এই অশান্তলীলার—এই দিক্‌ভ্রান্ত-কারিণী কামরূপা প্রকৃতির কটাক্ষ-ঈক্ষণের—অন্তরালে ক্ষণিকের জন্য একটা গভীরতর অর্থ প্রকাশ পায়, জীবন ও জগতের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। এজন্য ম্যাথু আর্ণল্ড্ কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—Criticism of Life; কিন্তু এই বাক্যের সুগভীর তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারায় আজও পর্য্যন্ত এ-সম্বন্ধে তর্কবিতর্কের অবসান হয় নাই। এজন্য ম্যাথু আর্ণল্ড্‌কে দায়ী করা যায় না; নানা উদাহরণ-সহযোগে তিনি নিজেই এই বাক্যের যে অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহাতে criticism-কথাটির আভি-ধানিক অর্থ ধরিয়া আপত্তি করিবার কোনও কারণ নাই। সকল কবিসৃষ্টির মধ্যে একটা আত্মগত criticism যে থাকে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, এবং জীবনের criticism বলিতে যাহা বুঝায়, কবির সৃষ্টিধর্ম্মের সহিত তাহার বিরোধ নাই। হোমার শেক্‌স্‌পীয়ার, গেটে প্রভৃতি মহাকবিগণের কাব্য যে কারণে উৎকৃষ্ট বলিয়া ধারণা হয়—তাহাকে 'criticism of life' বলিয়া অভিহিত করিলে এই বাক্যের অর্থ-সম্বন্ধে কোনওরূপ গোলযোগ হইতে পারে না। মানুষ আপনার কল্পনাবলে যে জগৎ সৃষ্টি করে তাহা যতই মনোহর হউক, তাহাতে মানুষের স্বতন্ত্র কল্পনার মাহাত্ম্য যতই প্রমাণিত হউক, তাহার সঙ্গে ভাগবতী সৃষ্টির গভীরতর সামঞ্জস্য যদি না থাকে, তাহা হইলে এমন একটা সঙ্গতি বা সত্যের হানি হয়, যাহার জন্যে মানুষের অন্তরতম চেতনা আশ্রয়হীন হইয়া পড়ে; সে কাব্য সত্যকার বেদনা, আশ্বাস ও সান্ত্বনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে

না। আবার, এই 'criticism of life' কথাটার তাৎপর্য্য এই নয় যে, যাহা কিছু প্রত্যক্ষ ও পরিদৃশ্যমান, সেই ব্যবহারিক বাস্তব জীবনকেই কাব্যে যথাযথ চিত্রিত করিতে হইবে, অথবা তাহারই সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কারণ ম্যাথ্যু আর্ণল্ড্ একথাও বলিয়াছেন যে, কাব্যে যেমন 'truth of substance' থাকা চাই, তেমনই 'high poetic seriousness' না থাকিলে তাহা উৎকৃষ্ট কাব্য হইতে পারে না। যথাদৃষ্ট জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতামূলক কতকগুলি Idea থাকিলেই কাব্য হইবে না, জীবনের গভীরতম সত্য কবির গভীরতম চেতনায় উদ্ভাসিত হওয়া চাই। "The high seriousness which comes from absolute sincerity"—এই যে কথাটি ম্যাথ্যু আর্ণল্ড্ অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন, ইহার সম্যক অর্থ করিলে তাঁহার 'criticism of life' কথাটির সম্বন্ধে আপত্তির কারণ থাকিবে না।

যে কল্পনায় বাস্তব-জীবন-সম্বন্ধে কোনও গভীর বেদনার অনুভূতি নাই, যাহা—সম্পূর্ণ নির্ভাবনায় জীবনের যতটুকু ভোগ করিতে পারে তাহা হইতেই—নানা রসরূপের সৃষ্টি করে, তাহা যে মিথ্যা, এমন কথা ম্যাথ্যু আর্ণল্ড বলেন নাই। কিন্তু সেরূপ কাব্যে জীবন-সম্বন্ধে 'absolute sincerity' নাই, এজন্য 'high seriousness'-ও নাই। যাহা কবির নিজস্ব খেয়াল-কল্পনার ফল, তাহাতে 'truth of substance' নাই বলিয়া, তাহা ভাগবতী সৃষ্টির রহস্যে অনুপ্রাণিত নয়—তাহাতে sincerity নাই, 'adequate poetic criticism of life' নাই। এই প্রসঙ্গে এই কথাও তিনি বলিয়াছেন—

"For supreme poetical success more is required than the powerful application of ideas to life ; it must be an application under the conditions fixed by the laws of poetic truth and poetic beauty."

অবশ্য এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কবি কাব্যরচনাকালে সজ্ঞানে এমন একটা নিয়ম-পালনের সংকল্প করিয়া বসেন না—কাব্যসৃষ্টির মধ্যেই কবিপ্রতিভার এই গূঢ় প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই কারণে ম্যাথ্যু আর্ণল্ড্ শেলীর মত কবির সম্বন্ধেও এমন কথা বলিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই—"that beautiful spirit building his many-coloured haze of words and images"—"pinnacled dim in the intense inane,"

অবশ্য শেলীর কাব্য-সম্বন্ধে ম্যাথু আর্ণল্ড্-এর এই মত কতখানি কি অর্থে যুক্তিসঙ্গত, মূল কাব্য-জিজ্ঞাসার পক্ষ হইতে সে বিচারের প্রয়োজন আছে; এবং ইহা সত্য যে, কাব্যে যদি কোনও হিসাবে 'criticism of life' না থাকে, তবে তাহাকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে না। কিন্তু সে বিচার এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক।

ম্যাথু আর্ণল্ড্-নির্দ্দিষ্ট এই sincerity-কথাটির অর্থ কি? তিনি প্রমাণ-স্বরূপ যে সকল কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং এই হিসাবে যে সকল কাব্য অপকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে এই কথার একটা স্পষ্ট অর্থ পাওয়া যায়। জীবন ও জগৎ ব্যাপারে যে কবির হৃদয় সাড়া দেয় নাই, যিনি এই সৃষ্টির রহস্যকে উপেক্ষা করিয়া, জাগ্রৎ প্রত্যক্ষকে অবহেলা করিয়া, আত্মরতির মোহবিকারে স্বপ্ন-প্রলাপ রচনা করেন, তাঁহার কাব্যে সত্যকার অনুভূতি নাই; তিনি মিথ্যারই মায়াজাল রচনা করেন। জীবনের চেয়ে সত্যকার কিছু নাই—কবিধর্ম্মও জীবনধর্ম্ম। প্রকৃতির নেপথ্য-গৃহে যাঁহার দৃষ্টি প্রবেশ করে নাই, যিনি এই জীবন-যজ্ঞের হোতারূপে আপনাকে আহুতি করিয়া, সেই জল-স্থল-আকাশ-বিসর্পী বিশ্বপ্রাণ অগ্নির হবিঃশেষ পান করিয়া দিব্যানুভূতি লাভ করেন নাই, তাঁহার কাব্যে যেমন 'truth of substance' নাই, তেমনই sincerity-ও নাই; কারণ তাহা ভাববিলাস, কল্পনাবিলাস, সূক্ষ্ম চিন্তারস-বিলাস মাত্র; তাহার মধ্যে সেই দিব্যশক্তি নাই যাহার বলে কবিই বহির্জগৎ ও অন্তরের অহং—এই উভয়ের দুর্ল্লঙ্ঘ্য ব্যবধান অতিক্রম করিতে পারেন, যাহাতে subject ও object-এর মধ্যে এক অপূর্ব্ব উপায়ে সেতু-যোজনা হয়; এবং, কাব্যসৃষ্টির কতটুকু subjective ও কতটুকু objective—এ প্রশ্নের সমাধানে Psychology-র মূঢ়তা প্রকাশ পায়। কাব্যে আমরা সেই অহং-অনুবিদ্ধ অথচ অহং-নিরপেক্ষ চিরবিস্ময়কর সত্তাকে একটি অপূর্ব্ব অনুভূতির সাহায্যে উপলব্ধি করি; এজন্য কাব্যই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগ। যে কবির কল্পনা এই সৃষ্টিরহস্যেরই অনুগত নয়, যাঁহার বাঁশীর রন্ধ্রগুলি এই জগজ্জীবন প্রশ্বাস-বায়ুতে পূর্ণ নয়, যিনি এই রহস্যের নিকটে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস করিয়া "make me thy lyre"-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারেন নাই, তাঁহার কাব্যসৃষ্টি সন্ধ্যাকাশের বর্ণচ্ছটার মতই ক্ষণস্বপ্নের ইন্দ্রজাল—চিরন্তন হরিত-নীলিমার অমৃতরসে সিঞ্চিত নয়।

আমাদের দেশে বহুকাল পূর্ব্বে যে ধরণের কাব্যবিচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহাকে Metaphysic of Aesthetic Sentiment বলা যাইতে পারে। কাব্যবস্তুকে প্রাধান্য না দিয়া, কাব্যের বহিরঙ্গটাকেই মুখ্য স্থির করিয়া, কাব্যের যে স্বাদ-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহাতে ভারতীয় মনীষার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু সেই বিচারের মধ্যে মধ্যযুগের scholasticism—বিষয় নিরপেক্ষ যুক্তি-প্রবণতাই—সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে। কাব্যের শাঁস-খোসা বাদ দিয়া তাহার দেহগত details-কে কতকগুলি সাধারণ সূত্রে বাঁধিয়া আলঙ্কারিকগণ কাব্যের আত্মার সন্ধান করিয়াছিলেন। এ বিচার কাব্য অপেক্ষা Aesthetics-এর অধিকতর উপযোগী। কারণ, classification বা generalisation কাব্যজিজ্ঞাসার পক্ষে কতটুকু আবশ্যক তাহা, আধুনিক কাব্যসাহিত্যের রস যাঁহারা আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন। এই প্রাচীন কাব্যবিচারে কবি-মানসের পরিচয় নাই—যে সৃষ্টিশক্তি বা Imagination আধুনিক কাব্য-জিজ্ঞাসার একটি প্রধান বিচার্য্য বিষয়—আলঙ্কারিকগণ কুত্রাপি তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করেন নাই। কাব্যের সকল উপাদান ও উপকরণকে একটি নির্ব্বিশেষে রসতত্ত্বের অধীন করিয়া লইলে, একটা philosophy of art দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু তাহা যথার্থ কাব্যজিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য সাধন করে না। কাব্য শুধুই একটা mode of art নয়, a mode of higher interpretation-ও বটে। জগতের প্রাচীনতম উৎকৃষ্ট কাব্য হইতে আধুনিক শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির সম্বন্ধে একথা খাটে। কবির কাব্যনির্ম্মাণে যে সৃষ্টিপ্রেরণা আছে রসসৃষ্টিই তাহার সজ্ঞান উদ্দেশ্য নয়। তবে এ প্রেরণা আসে কোথা হইতে? এবং সে প্রেরণার sincerity কোথায়? এই জীবন ও জগতের সঙ্গে কবি-হৃদয়ের যে নানারূপ স্পর্শ ঘটে তাহাতেই কাব্যসৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিত হয়। এই স্পর্শহেতু যে গভীর ও বিচিত্র বেদনা, যে আকুল রহস্য-বিস্ময় কবিকে অনুভূত করে, তাহাতেই কবিচিত্তে সৃষ্টি-প্রেরণা জাগে; কারণ, বাস্তবের যে নিগূঢ় স্বরূপ তখন কবিকল্পনায় প্রকাশিত হয়, সেই রূপটিকে ধরিবার বা রূপ দিবার যে প্রবৃত্তি, তাহা এত সহজ ও এত প্রবল যে, তাহার জন্য কোনও সজ্ঞান উদ্দেশ্যের প্রমাণ হয় না। এই যে সৃষ্টি—ইহা প্রত্যেক কবির নিজস্ব; ইহা এতই স্বতন্ত্র, ইহার রূপ ও ভঙ্গি এতই বিচিত্র যে, ইহাকে কোনও কতকগুলি বাঁধা-ধরা emotion-এর মার্কা

দিয়া classify করিলেই জিজ্ঞাসার শেষ হয় না। যে-কোনও কাব্য বিশ্লেষণ করিলে যে একই রসতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়, এ কথা আমি অস্বীকার করিতেছি না; কিন্তু কাব্যবিচারে কাব্যের সেই বৈচিত্র্য—কাব্যবস্তু ও তাহার রূপভঙ্গির অসাধারণ স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করিয়া দিলে কাব্যের কাব্যত্বই থাকে না। প্রত্যেক কাব্যের এই যে বৈশিষ্ট্য, ইহার কারণ কি? জীবন বা কাব্যবস্তুর অসীম বৈচিত্র্য এবং তাহার সঙ্গে প্রত্যেক কবির কবিমানসের স্বাতন্ত্র্যই এই বৈশিষ্ট্যের কারণ। শেক্‌স্‌পীয়ার, মিলটন, ব্রাউনিং এই তিন কবির কবিমানস যেমন স্বতন্ত্র, তাঁহাদের কাব্যও সেইরূপ স্বতন্ত্র; আবার, একই কবির বিভিন্ন কাব্যও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিচিত্র বিষয়-বস্তুর সঙ্গে বিচিত্র ভাবের এই যে সম্মিলন, এবং তাহার ফলে প্রত্যেক কাব্য যে অভিনব সৃষ্টিসৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইতেছে, যুগে যুগে যে নব নব রূপ গ্রহণ করিতেছে—এমন কি, রসিকের রসবোধেও যে স্বাদবৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহারই রহস্য-সন্ধান আধুনিক কাব্য-জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়।

কাব্যরস-উপভোগের মধ্যে জগৎ ও জীবনসংক্রান্ত বস্তুবিশেষের emotion সর্ব্বত্র প্রবল। রসবাদীদের মতে তাহা যদি নিম্নাধিকারীর কথা হয়, তথাপি বলিব—কাব্যরস-আস্বাদনে এই বস্তুবিশেষের চেতনা universal-এর অনুভূতির মধ্যেও জাগ্রত থাকে, এবং থাকে বলিয়াই একটি অপূর্ব্ব সংবেদনার সঞ্চার হয়। যাহা particular, তাহা particular থাকিয়াই, একটি অসীমতার ব্যঞ্জনা করে বলিয়া কাব্যরস অনির্ব্বচনীয়। কাব্যবস্তুর সম্পর্কে কাব্যরসের বিচারে একজন সমালোচক বলিতেছেন—

"It will be part of our theory that poetry with varying intensity reveals to us a world which answers to the gravest and deepest requirements of the mind, a world ideal in its harmony and its permanence, in its security and, above all, in its significance, but nevertheless a world real in its substance. That is to say, we must raise our speculation of this art until we can see every poem as the capture and preservation of some perfection of experience."

ম্যাথ্যু আর্ণল্ড্‌ যাহাকে 'poetic truth of substance' বলিয়াছিলেন, এখানে তাহাকেই 'perfection of experience' বলা হইয়াছে। ইহাই কবির অপূর্ব্ব imagination-এর ফল, ইহারই নাম—খণ্ড, অস্পষ্ট ক্ষুদ্র বাস্তবকে পূর্ণ ও অখণ্ড করিয়া তোলা। ইহাই ম্যাথ্যু আর্ণল্ডের কথায়—'powerful poetic application of ideas to life', অথবা 'a criticism of life under the conditions fixed by the laws of poetic truth and poetic beauty।' এইজন্য সত্যকার কবিসৃষ্টি যেমন জীবন ও জগৎকে অতিক্রম করিয়া অবাস্তবের সাধনা করে না, তেমনই জীবনের মর্ম্মগত রহস্য—বাস্তবের গভীরতর reality-কে প্রকাশিত করাই শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম্ম। জীবনের সহিত কাব্যের এই সম্বন্ধ—কবি-প্রতিভার এই সত্যকার সৃষ্টিধর্ম্ম—কাব্যবিচারে সর্ব্বাগ্রে গণনীয়। এই অর্থেই অপর একজন রসবিদ্‌ কাব্য-সমালোচক বলিয়াছেন—

"If the technical art of poetry consists in making patterns out of languages, the substantial and vital function of poetry will be analogous; it will be to make patterns out of life......The poetry of each age must re-interpret and re-incarnate life anew."

আমাদের দেশীয় কাব্যবিচারে রসের উচ্চতত্ত্বের সন্ধান থাকিলেও কাব্যের এই 'substantial and vital function'-এর দিকটা উপেক্ষিত হইয়াছে। এজন্য, Modern Study of Literature বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার পক্ষে এই ধরনের কাব্যজিজ্ঞাসা অনেকটা নিষ্ফল হইয়াছে। বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী—কাব্যের রসপরিণাম-প্রক্রিয়া বুঝাইবার জন্য এই সকল ভাবের পর্য্যায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু scholasticism-এর প্রভাবে এগুলিকে (চিন্তাপ্রণালীর পথে) পশ্চাতে ফেলিয়া, আমাদের আলঙ্কারিকেরা একটি তত্ত্বের উপরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমি মহাকবি ও মহামনীষী গেটের কয়েকটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিব—

"In aesthetic it is hardly correct to speak of the idea of the Beautiful, for by so doing we dissever the Beautiful which after all cannot be conceived as being detached.'

"It matters a great deal whether the poet is seeking the particular for the universal or seeing the universal in the particular. The latter is the nature of poetry. It gives expression to the particular without in any way thinking of or referring to the universal. And he, who vividly grasps the particular will at the same time also grasp the universal, and will either not become aware of it at all, or will only do so long afterwards."
—শেষের কথাটিতে, পূর্ব্বে যে কবিদৃষ্টির কথা বলিয়াছি, যাহার বলে খণ্ড, ক্ষুদ্র ও পরিচ্ছিন্নের মধ্যেই অসীমের আভাস ফুটিয়া উঠে—বাস্তব experience perfect হইয়া দাঁড়ায়—তাহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

আমাদের আলঙ্কারিকেরা এই particular-কে উচিত মর্য্যাদা দেন নাই —দিলে, তাঁহারা যাহাকে 'সঞ্চারী' ভাব বলিয়াছেন, রসবিচারে তাহাকেই মুখ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন; এ সম্বন্ধে গেটের আর-একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এ আলোচনা শেষ করিব। গেটে বলিতেছেন—

"In a work of art, the question 'what' interests a man far more than the 'how', hence comes the practice of laying stress upon particular parts in which, if we pay particular attention, we shall ultimately find that the effect of totality is not wanting, even though it remained unnoticed by every one."

আলঙ্কারিকের কাব্যজিজ্ঞাসায় এই how-টাই বড় হইয়াছে, what-কে তাঁহারা আমল দেন নাই;—এজন্য কাব্যবিচারে, সকল রসগ্রাহী পাঠকের পক্ষে যে প্রশ্ন সহজ ও স্বাভাবিক, কবিকর্ম্মের সকল সৌন্দর্য্য যাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে—তাহার সমাধান বা বিশ্লেষণ নাই; জীবনসমুদ্রের ছায়া-লোক-বিচিত্র উর্ম্মিমালায় যে ক্ষণ-সৌন্দর্য্য কাব্যের ভিতর দিয়া চিরন্তনের ইঙ্গিতরূপে রসিকচিত্ত আকুল করিয়া তোলে, কবিপ্রতিভার সেই সর্ব্বপ্রধান কৃতিত্বের কথা ইহাতে নাই।

কেন নাই? এ প্রশ্নের বোধ হয় উত্তর আছে। অন্ততঃ আমাদের

সাহিত্যে কাব্যের এই substantial ও vital function-এর স্পষ্ট লক্ষণ না থাকার একটা কারণ নির্দ্দেশ করা দুরূহ নয়। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে সাহিত্য-সম্বন্ধে একটা কথা বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। অন্যান্য ইতিহাসের মত সাহিত্যের ইতিহাসেও Mediævalism বলিয়া একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। শেক্‌স্‌পীয়ারের Hamlet বা গেটের Faust-কাব্যের সম্বন্ধে একটা কথা সকলেই বলিয়া থাকেন যে, ওই দুই কাব্যে মানব-মনের modern রূপটি বিশেষ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সাহিত্যের এই modern ভাবধারা বিশ্লেষণ করিলে, যে একটি প্রধান লক্ষণ ধরা পড়ে তাহারই অভাবাত্মক ধারণাই Mediævalism। য়ুরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভাবরাজ্যে যে যুগান্তর সুস্পষ্ট-রূপে দেখা দেয়, যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে Renaissance—একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক তাহার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এইরূপ—"Discovery by mankind of himself and of the world।" ইহার পর হইতেই য়ুরোপের সর্ব্ববিদ্যাবার্ত্তাবিধি—Modern বলিতে যাহা বুঝায়—তাহারই দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। গ্রীক সাহিত্য, কলা ও দর্শনের সঙ্গে আকস্মিক পরিচয়ে মানুষ জগৎ ও জীবনকে আর-এক চক্ষে দেখিতে লাগিল।

"Human life which the mediæval Church had taught them to regard but as a threshold and stepping-stone to eternity, acquired suddenly a new momentousness and value : the promises of the Church paled like its lamps at sunrise and a new paganism ran like wild-fire through Italy."

—এই যুগান্তের পূর্ব্বে সকল বিষয়ে seriousness হয়ত ছিল, কিন্তু scholasticism-এর চাপে জীবনের স্ফূর্ত্তি কুত্রাপি ছিল না। আমাদের দেশেও এইকালে সাহিত্যরচনায় যেমন, তেমনি তাহার আদর্শবিচারে, জীবনের গভীরতম অনুভূতির স্থান বড় বেশী ছিল না। সেকালে কাব্যসৃষ্টিতে সত্যকার imagination বা 'perfection of experience'-এর প্রয়োজন হয় নাই ; জীবনকে কতকটা আড়ালে রাখিয়া বাস্তবমুক্তির সাধনাই ছিল রসচর্চ্চার নিপুণতম কৌশল। আমাদের দেশে, এ যুগে একদিক দিয়া কাব্যের একটা বৃহত্তর মূল্য ছিল—it was a means of escape from

the ills of life। কিন্তু এই artistic monasticism-এর দ্বারা যে মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায় তাহা তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন নয়—এ অবস্থা বেশীক্ষণ টিকে না; তাই জার্ম্মান দার্শনিক Schopenhauer খাঁটি Asceticism-এর পক্ষপাতী। তাঁহার মতে—"The Hindu Sannyasin shows the way।" জীবন ও জগতের সম্বন্ধে যে মনোভাবের ফলে ভারতীয় কাব্য-বিচারে রসবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই, Imagination-এর পরিবর্ত্তে Fancy, এবং স্বাভাবিকতার পরিবর্ত্তে Conceit কাব্যের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে। কাব্যরচনার জন্য কবিগণ যেন একটু সাজসজ্জা করিয়া বসিতেন—মানসচক্ষে বাস্তব-বিস্মৃতির অঞ্জন পরিয়া লইতেন। যে personality ও ব্যক্তিগত জীবনের গভীরতম experience-এর বাস্তব পরিচয় আমরা সকল উৎকৃষ্ট কাব্যে পাই বলিয়া একটি সুগভীর আনন্দ-বেদনায় মুগ্ধ হই, এবং কবির সেই ব্যক্তিগত ভাবদৃষ্টির সাহায্যেই পাঠকের মনেও একটি সুগভীর আত্মপরিচয়ের আশ্বাস জাগে, সে রস এ সাহিত্যে বিরল।

এই বাস্তব-চেতনা বলিতে আমি কি বুঝি এবং বুঝাইতে চাই, তাহা পাশ্চাত্য সাহিত্যের ইতিহাস হইতে এক উদাহরণ দিয়া দেখাইব। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ফরাসী দেশে একজন কবির উদয় হইয়াছিল, ইঁহার নাম Francois Villon—এ নাম বোধ হয় অনেকেরই পরিচিত। একজন সাহিত্য-সমালোচক Villon-র সম্বন্ধে বলেন—

"He is the first poet in France and the greatest rogue in the history of Literature."

ইহার পরেই বলিতেছেন—

"With the advent of Villon mediaevalism breathed its last and with the death of mediaevalism was born the modern poetry of France."

এমন কথা বলার কারণ কি? তাহার উত্তর—

"The two hundred verses of the Grand Testament present for the first time in the literature of France, a distinct and striking personality, a personality distinct because he

is alone a being of real flesh and blood, among a crowd of shadows."

"It is from the contemplation of his own experience that the poet speaks...he looked in his heart and wrote, and his life is the theme of his writing."

সমালোচক আরও বলেন যে, Villon-র কাব্যে মৃত্যু সম্বন্ধে যে গভীর বাস্তব-অনুভূতি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই তাঁহার কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য— Villon-র কবি-যশ ইহার উপরেই প্রতিষ্ঠিত :

"In death he can see nothing but the horrors of dissolution. In brighter moments he may seek to console himself by a kind of philosophy, that all beauty must perish, that life is but fleeting and so on ; but even while he speaks his teeth are chattering, and there rise up before his eyes the creaking gibbets of Montfaucon with his own place prepared and ready, and he hears the hollow croaks of the magpies rising upon the night air." (Villon নিজের জীবনে গুরুতর দুষ্কৃতির জন্য বহুবার কারাদণ্ডে এবং একাধিকবার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।)

উপরি-উক্ত উদাহরণের দ্বারা আমি কাব্যের আদর্শ নির্ণয় করিতেছি না—Villon-র কাব্যই যে আদর্শ কাব্য, এমন কথা বলিতেছি না। আমার প্রধান বক্তব্য এই যে, গভীরতম বাস্তবানুভূতি বা সত্যকার হৃৎস্পন্দনের উপরেই কাব্যপ্রেরণা নির্ভর করে। এই Villon-র কাব্য সম্বন্ধে ম্যাথ্ আর্ণল্ড্ একস্থানে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলে, এ বিষয়ে কিছুই বলিবার প্রয়োজন হইবে না। ম্যাথ্ আর্ণল্ড্ লিখিয়াছেন—

"A voice from the slums of Paris, fifty or sixty years after Chaucer, the voice of poor Villon out of his life of riot and crime, has at its happy moments more of this important poetic virtue of seriousness than all the productions of Chaucer. But its apparition in Villon, and in men

like Villon, is fitful: the greatness of the great poets, the power of their criticism of life, is that their virtue is sustained."

এই কথারই পুনরুক্তি করিয়া বলি, *Hamlet* ও *Faust*-কাব্যে, এই experience, এই truth of substance, এই criticism of life, high and excellent seriousness দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছে; তাই সে কাব্যের মূল্য এত বেশী; এই perfection of experience-ই কাব্যের প্রাণ; ইহাকেই ম্যাথু আর্ণল্ড্ criticism of life বলিয়াছেন। পরবর্ত্তী সমালোচকেরা এ বাক্যের ভিন্ন অর্থ করিয়া নানা বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই criticism of life—epic, drama বা narrative কবিতায় concrete কাব্যনির্ম্মাণেই যে প্রকাশ পাইবে, এমন কথা কেহই বলিবেন না; উৎকৃষ্ট 'লিরিক' কবিতায় ভিন্ন ভঙ্গিতে ইহার প্রকাশ দেখা যায়—Villon-র কবিতাও 'লিরিক'। আবার, শুধু ভাবে বা রূপে নয়, ভাবনামূলক কবিতার মধ্যেও উৎকৃষ্ট কাব্যলক্ষণ থাকিতে পারে। যাঁহারা কবিতাপাঠ কালে ভাবনালেশ-হীন রসাস্বাদের পক্ষপাতী, তাঁহাদের মনে হয়ত এই শেষোক্ত শ্রেণীর কবিতা কবিতাই নয়—কিন্তু এ সকল কবিতার ভাবনাও যে ভাবহীন নয়, ছন্দ ও সুরের সহিত বাক্যযোজনার আবেগেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমি কালিদাসের একটি নিছক কবিতা ও তাহারই সঙ্গে সুইনবার্ণের কয়েকটি ভাবনা-প্রধান শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করিব; ইহার কোন্‌টি কাব্যহিসাবে কতখানি সার্থক হইয়াছে, পাঠক সে বিচার করিবেন। কালিদাসের শ্লোকটি এই—

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতম্
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি॥

[মেঘদূতের বিরহী যক্ষ প্রিয়ার উদ্দেশে বলিতেছে—হে চণ্ডি, আমি শ্যামা-লতায় তোমার অঙ্গসৌষ্ঠব, চকিত হরিণীর নয়নে তোমার দৃষ্টি, চন্দ্রে তোমার মুখকান্তি, শিখিপুচ্ছে তোমার কেশরাশি, এবং ক্ষুদ্র নদীতরঙ্গে তোমার ভ্রূবিলাস দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু হায়! কোনও একটির মধ্যে তোমার সমগ্র রূপসাদৃশ্য নাই।]

সুইনবার্ণের কাব্যের কয়েকটি লাইন এইরূপ—

Love, that for very life shall not be sold,
Nor bought nor bound with iron nor with gold ;
So strong that heaven, could love bid heaven farewell,
Would turn to fruitless and unflowering hell ;
So sweet that hell, to hell could love be given
Would turn to splendid and sonorous heaven
Love that is fire within thee and light above,
And lives by grace of nothing but of love ;
Through many and lovely thoughts and much desire
Led these twain to the life of tears and fire ;
Through many and lovely days and much delight
Led these twain to the lifeless life of night.

এই দুইটি কবিতার কাব্যবস্তু স্বতন্ত্র হইলেও—একটি যেমন প্রিয়া-বিরহিত প্রেমিকের একখানি ভাবচিত্র, অপরটি তেমনই প্রেম সম্বন্ধে কবির অতিশয় আবেগমূলক ভাবনার উৎসার। তথাপি সুইনবার্ণের কবিতায় মানবজীবনের একটি মুখ্য experience-কে যে ভাবনার দ্বারা মণ্ডিত করা হইয়াছে, সেই ভাবনার মূলে এমন একটি দিব্যানুভূতির আবেগ ভাষায়, ছন্দে ও সুরে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাতে জীবন-রস-রসিকের চিত্তেও সাড়া জাগে ; অর্থাৎ এই ভাবনা অতিমাত্রায় ভাবতান্ত্রিক হইলেও, ইহাতে sincerity ও seriousness আছে। অপরপক্ষে, কালিদাসের কবিতাটিতে বিশুদ্ধ কল্পনাবিলাসই আছে, বাস্তবের নামগন্ধও নাই ; এরূপ প্রেমোন্মাদ যদি সত্যকার জীবনে ঘটে, তবে তাহা কাব্যের বিষয় না হইয়া চিকিৎসাশাস্ত্রের অধীন হওয়াই উচিত ; কিন্তু বাস্তবের নামগন্ধ নাই বলিয়াই রসবাদী আলঙ্কারিকের মতে ইহাই একটি উৎকৃষ্ট রস-রচনা !

আধুনিক কালের কাব্যে এই জীবনের অনুভূতি গভীরতর হইয়া উঠিলেও, সকল যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলিতেই, criticism of life, বা higher interpretation of life আছে। কেবল, যখনই কোনও জাতির মধ্যে জীবন-ধর্ম্ম, যে কোন কারণেই হোক, ক্ষীণ হইয়া আসে, অথবা মানসবৃত্তির অতিরিক্ত

প্রাধান্য ঘটে, তখনই সেই জাতির কাব্যে sincerity ও seriousness-এর অভাব হয়। কবিকল্পনা, হয় কেন্দ্রাতিগ ভাব-মার্গে স্বপ্নপ্রয়াণ করে; নয় প্রাণহীন পঙ্কবিলাসে অধঃপতিত হয়। মধ্যযুগের পারলৌকিকতা ও বৈরাগ্যের অন্ধকার হইতে য়ুরোপ বহুদিন মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই. জীবন-ধর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছে। কি কারণে, এবং কতকাল ধরিয়া এই অবস্থা ঘটিয়াছে সে অনুসন্ধান ঐতিহাসিক করিবেন, কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটা passive, পাশব চেতনা —একটা তামসিক দেহধর্ম্মই—আমাদের মধ্যে আজও টিকিয়া আছে; জড়ের সহিত সংঘর্ষে আত্মার যে সজীবতা—হৃদয়কে অবারিত ও প্রসারিত করিয়া, ইন্দ্রিয়দ্বারে বাহিরকে সম্পূর্ণরূপে অন্তরে গ্রহণ করিয়া যে আত্মোপলব্ধি—তাহা হইতে আমরা বহুদিন বঞ্চিত আছি। মধ্যে মধ্যে যে দুই চারিজন মনীষী আবির্ভূত হইয়া জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে সত্য প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে এই রক্তমাংসগঠিত দেহের মধ্যে যে প্রাণদেবতা রহিয়াছেন, তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় ও নিস্তেজ করা হইয়াছে; দেহের মধ্যেই দেহহীন হইয়া থাকিবার— স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি নিরোধ করিয়া অস্বাভাবিক মনোবৃত্তির অনুশীলন করিবার—মানুষ না হইয়া অতিমানুষ হইবার পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। আজিকার দিনেও এই অতীন্দ্রিয়বাদ, এই ভূমা, এই দেহতত্ত্ববর্জ্জিত অধ্যাত্ম-জ্ঞান একটি নূতন রূপে দেখা দিয়াছে। যে monasticism এতকাল ধর্ম্মে-কর্ম্মে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্পকলায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—সেই নিঃসঙ্গ গুহা-বাসীর ধ্যানবিলাসই আজ আবার সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় কাল্‌চারের দুপ্রধর্ষ Idealism য়ুরোপীয় কাব্যকলাকে আত্মসাৎ করিয়া— ভারতীয় ভাববাদ য়ুরোপীয় রূপবাদকে আশ্রয় করিয়া—যে আশ্চর্য্য নবজন্ম লাভ করিয়াছে, তাহাতেও জীবন ও জগতের সঙ্গে দেহগত পরিচয় নাই; 'discovery by mankind of himself and of the world' বলিতে যাহা বুঝায়, সেই জগৎ-সাক্ষাৎকার ও জীবন-চেতনার পরিচয় নাই; তাই এ সাহিত্য প্রাণের উদ্বোধন করিল না। কবির বাঁশিতে অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া যে রাগিণী উৎসারিত হইয়াছে, সে সঙ্গীত একটি অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যলোক সৃষ্টি করিয়াছে; তাহাতে কাব্যের দিক দিয়া ভারতীয় রসবাদের হয়ত হানি হইবে না, কিন্তু জীবনের দিক দিয়া এমন একটি আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে

যাহাতে, বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ একটি পরম সত্যের ভাবস্বর্গে নিশ্চিন্ত হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে।

আমাদের Mediaevalism ঠিক য়ুরোপের Mediaevalism নয়; সেখানকার পারলৌকিকতা কখনও এমন একটি সুদৃঢ় অদ্বৈত-ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে নাই—ইহলোকের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল মাত্র, তাহাকে শেষ করিতে পারে নাই। এজন্য প্রাণের দ্বন্দ্ব কখনও ঘুচে নাই, মানুষ অবশেষে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। তাই যেমনই সহসা দুয়ার একটু খুলিয়া গেল, অমনি য়ুরোপ ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। প্রকৃতির নিষ্ঠুর পীড়নে সেখানে প্রাণধর্ম্ম বা দেহচেতনা কখনও অলস হইতে পারে নাই—প্রাণকে ঘুম পাড়াইয়া মনের অদ্বৈত-মহিমা জয়ী হইতে পারে নাই। এখানে প্রকৃতির শাসন অতিশয় শিথিল হওয়ায় জীবন-সমস্যা অপেক্ষা মৃত্যুর সমস্যাই বড় হইয়াছে; বাস্তব-প্রত্যক্ষের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করিতে হয় নাই বলিয়া, অবাস্তব অপ্রত্যক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার অবসর মিলিয়াছে; যে বীর্য্য জীবনযুদ্ধের জন্য প্রয়োজন হয় নাই তাহাই অধ্যাত্ম-সংগ্রামে নিয়োজিত হইয়াছে। এখানকার মানুষ কল্পনায় আত্মজয় তথা বিশ্বজয় করিয়াছে; বহুপূর্ব্বকাল হইতেই দলে দলে সন্ন্যাসীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; দিগ্বিজয়ী গ্রীকবীরকে ভারতীয় নগ্নক্ষপণক সঘৃণ কৃপাকটাক্ষের দ্বারা পরাস্ত করিয়াছে। এই মনোভাব আমাদের অস্থি-মজ্জাগত। জগতে বাস করিব অথচ জগৎকে ভ্রূক্ষেপ করিব না, দেহ ধারণ করিয়া দেহকে মানিব না—এই প্রবৃত্তি বহুদিন প্রশ্রয় পাইয়া একদিন এমন অবস্থায় দাঁড়াইল যে, তখন প্রাণধর্ম্মকেই সবচেয়ে প্রয়োজন, কিন্তু সে আর সাড়া দেয় না। ভারতবর্ষ, দেহ ও আত্মা, অর্থ ও পরমার্থ এই দুইয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়া নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছিল; কিন্তু একদিন বাহিরের এক দুর্দ্ধর্ষ প্রাণবান জাতি এই ঘুমন্ত পুরীতে আপতিত হইয়া তাহার সুখস্বপ্ন নষ্ট করিল। কিন্তু তখন আর উপায় নাই, প্রাণ স্বাস্থ্য হারাইয়াছে। সেই দিন হইতে ভারতের ইতিহাসে যে অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে আজ তাহারই শেষ পৃষ্ঠা খুলিয়াছে। আজ সেই প্রাণধর্ম্ম যাহাদের মধ্যে জ্ঞানে ও বীর্য্যে পূর্ণবিকশিত হইয়াছে, পশ্চিমের সেই প্রকৃতি-উপাসক জাতি, ব্রহ্মের অণ্ড-ব্যবসায়ীদের শেষ পিণ্ডের ব্যবস্থা করিতেছে। এই মৃত জাতি মৃত্যুধর্ম্মকেই আঁকড়াইয়া আছে, কবির মুখ দিয়া জগৎকে শুনাইতেছে—দেহের চেয়ে আত্মা

বড়; প্রকৃতির শান্ত আনন্দময়ী মূর্ত্তির ধ্যান কর; জাতীয়তা বর্জ্জন করিয়া মহামানবের আসন প্রস্তুত কর; মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতে প্রস্থান কর। এখনও সেই কথা, সেই উচ্চ চিন্তার শূন্যবাদ, সেই বাস্তব-ব্যভিচারী শাশ্বত-সনাতনের পূজা!

ভারতবর্ষ যে-সত্যকে চাহিয়াছিল সে-সত্য প্রকৃতির সত্য নয়, সে-মন্ত্র জীবনের মন্ত্র নয়। প্রকৃতিও সনাতনী; তাহার ধ্বংস ও সৃষ্টিলীলার মধ্যে যে চিরন্তনী ধারার আভাস পাওয়া যায়, সে তত্ত্ব স্বতন্ত্র—তাহাকে ধ্যানের দ্বারা নয়, মূক-মুগ্ধ জীবনাবেগের দ্বারাই উপলব্ধি করিতে হয়। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'—এই বাক্যে যে সত্যের ধারণা আছে, তাহার জয় যে জগতে ঘটে, তাহা মানুষের জীবন-রঙ্গভূমি নয়। সে সত্যের পূজা করিতে হইলে শ্মশানকেই তীর্থভূমি করিতে হয়, সর্ব্বনাশকেই সর্ব্বপ্রাপ্তি বলিয়া মানিতে হয়। যতদিন সৃষ্টি থাকিবে ততদিন শ্মশানচারী দিগম্বরের প্রভুত্ব চলিবে না, তাহার বক্ষে কালীই নৃত্য করিবে; ততদিন উন্মাদবিজৃম্ভিত শাশ্বত-সত্য বা দেশকালাতীত অবাস্তবের সাধনা কখনও জয়ী হইবে না।

এই অবাস্তব ভাববিলাস জীবনকে পঙ্গু করে বলিয়াই সাহিত্যকেও প্রাণহীন করিয়া তোলে; সকল সাহিত্যেই ভাব যখন বস্তুকে ছাড়াইয়া উঠে, তখনই কাব্যের অধঃপতন হয়। আমাদের বর্ত্তমান জীবন এইরূপ ভাব-বিলাসের অতিশয় অনুকূল। কিন্তু একে জীবনশক্তি ক্ষীণ, জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় বহুকাল যাবৎ ঘটে নাই, তাহার উপর ভাবস্বর্গের কল্পধেনুদোহন—ইহার ফলে জীবন-চেতনার মত সাহিত্য-চেতনাও অসাড় হইয়া উঠিতেছে; তাই আমাদের কাব্য কেবল ছন্দ ও বাক্যের কসরৎ—অর্থহীনতাই তার রস, এবং অস্বাভাবিকতাই তাহার মৌলিকতা। জার্ম্মান রোমান্টিকগণের ভাববিলাস যখন অতিচারী হইয়া পরিশেষে প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল, কবি Heine তখনকার সেই সাহিত্যের যে সমালোচনা করিয়া-ছিলেন, আমাদের আধুনিক কাব্য সেরূপ সমালোচনার উপযুক্ত হইতে পারিলেও ধন্য হইত; বরং গেটে এই যে কথাগুলি একস্থানে লিখিয়াছেন, আমাদের কবিদের সম্বন্ধে তাহাই অধিকতর সত্য—

If feeling does not prompt, in vain you strive;
If from the soul the language does not come,

By its own impulse, to impel the hearts
Of hearers, with communicated power,
In vain you strive—in vain you study earnestly.
Toil on for ever ; piece together fragments,
Cook up your broken scraps of sentences,
And blow, with puffing breath, a struggling light,
Glimmering confusedly now, now cold in ashes ;
Startle the schoolboys with your metaphors :
And, if such food may suit your appetite,
Win the vain wonder of applauding children.
But never hope to stir the hearts of men,
And mould the souls of many into one,
By words which come not native from the heart.

—কিন্তু words আসিবে কোথা হইতে?—heart কোথায়? তাই এ সকল কবিতা সম্বন্ধে গেটের ভাষাতেই বলিতে হয়—

Oh ! these fine holyday phrases,
In which you robe your worn-out common-places,
These scraps of paper which you crimp and curl,
And twist into a thousand idle shapes,
These filigree ornaments are good for nothing,
Cost time and pains, please few, impose on no one ;
Are unrefreshing as the wind that whistles
In autumn, 'mong the dry and wrinkled leaves.

কিন্তু এই ব্যাধি একটি নূতন রূপে দেখা দিয়াছে আধুনিক ছোকরা-কবিদের কাব্যে। ইহারা নাকি এই বিলাসের বিরোধী—ইহারা জীবনেরই পূজারী। কিন্তু জীবন কোথায়? পিতৃপিতামহের মধ্যে তাহার যেটুকুও অবশিষ্ট ছিল, ইহাদের মধ্যে সেটুকুও আর নাই। তবু জীবন চাই-ই। য়ুরোপীয় সাহিত্যে জীবনের এত স্ফূর্ত্তি!—আমাদের ভিতরে খুঁজিয়া তাহার এতটুকুও কি মিলিবে না? কিন্তু মেলে না যে! অগত্যা দেহের শেষ-

দশান্তেও যাহা একেবারে শেষ হয় না, সেই যৌন-প্রবৃত্তিকেই ইহারা জীবন-ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিল; এবং অতিশয় অকথা-কুকথাপূর্ণ ব্যাকরণ-অভিধান-বর্জ্জিত ভাষায় কামবিদ্রোহ প্রচার করিল—শীর্ণ শবদেহকে দানোয় পাইল। ইহারই নাম হইল সাহিত্যের জীবনধর্ম্ম! এই সম্পর্কে *Faust* হইতে আরও কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা চলে—

"The Night and Churchyard poets are engaged in an interesting conversation with a newly arisen vampire, from which they anticipate the development of a new school of poetry."

জীবনের নামে এ যুগের তরুণদের এই যে বিকারজনিত পিপাসা—সর্ব্বাঙ্গে পঙ্কলেপন ও ধূলিভক্ষণ—জাতির পক্ষে ইহা যে কতবড় মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডি, সে কথা হৃদয়বান ও চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। জীবনকে চাই, এ জ্ঞান জন্মিয়াছে—পরের জীবন, পরের সাহিত্য দেখিয়া; কিন্তু সত্যকার জীবনধর্ম্ম হইতে যাহারা বঞ্চিত, জীবন যে কি বস্তু তাহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি যাহাদের নাই, তাহারা পরের অনুকরণে যে জীবনধর্ম্মের পরিচয় দিতেছে তাহা কুৎসিত স্বপ্নবিলাস ও নির্জীব কামজৃম্ভণ মাত্র। যাহা নাই, কল্পনায় তাহার ছায়া ধরিয়া একটা উন্মাদ-উল্লাসের মর্ম্মভেদী দৃশ্য আমরা সম্প্রতি রাজনীতির ক্ষেত্রেও দেখিয়াছি। হায় জীবন! বড় বিলম্ব হইয়া গিয়াছে; আরও পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এ পিপাসা জাগে নাই কেন? তখন জাতির দেহটা অন্ততঃ সবল ছিল, এমন মস্তিষ্ক-বিকৃতির সম্ভাবনা ছিল না।

জীবনের সহিত কঠিন প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বেদনা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যেও তেমন করিয়া কবিপ্রেরণার সাহায্য করে নাই; যে বেদনা কবিচিত্তে প্রতিফলিত হইয়া মৃত্যুকেও অমৃত করিয়া তোলে, ভারতের তত্ত্বজ্ঞান তাহাকে অবস্তু বলিয়া চিরদিন দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে, জীবনকে জীবনের দিক হইতে দেখিবার চেষ্টাই করে নাই। তাই ভারতীয় কাব্যে ট্র্যাজেডির স্থান নাই। কিন্তু জীবন ও জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের এই যে বেদনা ইহাই সুরময় হইয়া কাব্যসৃষ্টি করে; এই সুরই মানুষের চিত্তকে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করে—যাহা কঠিন, কর্কশ, রুদ্র ও নির্ম্মম তাহারই শোণিত-মাংস-লব্ধ বেদনায় মানুষ দেবত্বের সন্ধান পায়। কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

Who ne'er in weeping ate his bread,
Who ne'er throughout the night's sad hours
Hath sat in tears upon his bed,
He knows you not ye Heavenly Powers !

এই যে দুঃখ, মনুষ্যজীবনে ইহা ত' নিত্যনৈমিত্তিক, তথাপি ইহা জাতি-বিশেষের বা ব্যক্তি-বিশেষের কাব্যপ্রেরণার বস্তু হয় না কেন? তাহার কারণ, এই দুঃখ যদি শুধু passive পাশব-চেতনার স্তরেই থাকিয়া যায় তবে তাহার seriousness কোথায়? আবার যদি ইহা অবস্থাগুণে দেহচেতনারও আড়ালে থাকিয়া যায়, এবং প্রবল মানসিকতার চাপে চিন্তাবিলাসের বস্তু হয়, তবে তাহার sincerity কোথায়? আজ আমাদের দুঃখ পাইবার শক্তিও নাই, Idea-র জগতে বাস করিবার উপায়ও নাই। আজ সব ফাঁকি ধরা পড়িয়াছে, বঞ্চিত জীবন বহুকালসঞ্চিত ঋণের পরিশোধ দাবী করিতেছে, কিন্তু সে দাবী মিটাইবার ক্ষমতা নাই। আজ সেই ক্ষুধিত ব্যাধিগ্রস্ত জীবন বাস্তবেও যেমন, কাব্যেও তেমনি, তার সেই vital substantial function-এর অভাবে আলেয়ার মত দিক্‌ভ্রান্ত করিতেছে। একদিন এই জীবনকে উপেক্ষা করিয়া যে স্বতন্ত্র কাব্যজগৎ গড়িয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহা যেমন নিষ্ফল হইয়াছে, তেমনি এই জীবনেরই নামে যে অক্ষম মেরুদণ্ডহীন বাস্তব-বিলাস দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে তাহার ফলও শোচনীয় হইয়াছে।

কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে আমি যে আলোচনা করিলাম তাহাতে কাব্য-জিজ্ঞাসার সকল প্রশ্নের মীমাংসার দাবী করি না। আধুনিক কাব্যজিজ্ঞাসার প্রধান প্রয়োজন কি, তাহারই একটা ধারণা খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছি। Literature as a mode of art—বিচার করা এ প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নয়। Literature as a higher interpretation of life and nature—বিচার করিবার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাহাই আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কেবল Aesthetics ধরিয়া কাব্যবিচার করিলে কাব্যের যথার্থ বিচার হয় না; জীবনের সঙ্গে কাব্যের কোথায় কতখানি যোগ আছে তাহা বুঝিতে না পারিলে কাব্যবিচারে নানা অনর্থের সূত্রপাত হয়—সমাজ-নীতি ও ধর্ম্মের কচকচি, অথবা তত্ত্ববিশেষের কুহেলিকায় কাব্যকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমার মনে হয়, কাব্যের সঙ্গে জীবনের এই নিগূঢ়

সম্বন্ধ বুঝিতে পারায়, এতদিনে কাব্যের প্রকৃত সংজ্ঞা ও মূল আদর্শ ধরা পড়িয়াছে—ইহাতে বহু বিতর্কের অবসান হইবে। জীবনের প্রকাশ ও বিকাশ যেমন বিচিত্র, কাব্যের আদর্শও তেমনি সচল। কাব্য জীবনধর্ম্মী বলিয়াই নবনবোন্মেষশালী। আবার রসসৃষ্টিতে যেমন, রসবোধের মধ্যেও তেমনি, এই বিকাশধর্ম্মের লক্ষণ আছে—অভিনব কাব্যসৃষ্টির প্রভাবে রসিকেরও চিত্তবিকাশ হয়। তাই, গেটের মত রসিকও অসঙ্কোচে স্বীকার করেন—

"I begin to find new qualities in the work, and new faculties in myself."

অতএব কাব্যবিচারে কাব্যের এই vital and substantial function-এর কথা যদি বুঝিয়া লওয়া হয়, তবে এক দিকে যেমন তাহার বৈচিত্র্য ও স্বাধীন স্ফূর্ত্তির ধারণা অক্ষুণ্ণ থাকে, তেমনই আর-এক দিকে তাহার স্বপ্রকৃতির ব্যভিচার সহজেই ধরা পড়ে। কি প্রাচীন কি আধুনিক—সকল কাব্যের উৎকর্ষ-বিচারে ইহার যে প্রামাণ্য লক্ষণ আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি তাহা এই—

"Poetry with varying intensity reveals to us a world which answers to the deepest and gravest requirements of the mind : a world ideal in its harmony and its permanence, in its security, and above all, in its significance, but nevertheless a world real in its substance."

আর-একটা প্রমাণ এই যে, আমাদের দেশে আজকাল কাব্যবিচারে যে বাদবিসংবাদ ও ভ্রান্ত ধারণা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে—কাব্যকে এইদিক দিয়া দেখিলে, তাহা মুহূর্ত্তেই দূর হইতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দিব। অভিজাত সাহিত্য বা সাহিত্যের আভিজাত্য বলিয়া যে কথাটা কাব্যবিচারে আজকাল মাঝে মাঝে শুনিতে পাই, সে কথাটা যে কতখানি ভুল, তাহা সহজেই ধরা পড়িবে। কাব্যের উৎকর্ষ-বিচারে ইহাই দেখিলে চলিবে না যে, তাহার মধ্যে Idea-র perfection বা Idealism কতখানি আছে, দেখিতে হইবে তাহাতে perfection of experience আছে কি না। যে কল্পনা কাব্যের আভিজাত্য রক্ষা করিবার জন্য জীবনের কায়াকে ত্যাগ করিয়া তাহার ছায়া লইয়া একটি সূক্ষ্ম মায়াজাল রচনা করে, সে কল্পনা কাব্যের পক্ষেও মিথ্যাচার।

কাব্যবিচারে আভিজাত্য কথাটাই নিরর্থক। কাব্যে সৌন্দর্য্যই তাহার শুচিতা —সেই শুচিতা রক্ষা করিবার জন্য কবিকে ছুৎমার্গ অবলম্বন করিতে হয় না; কেন না, চাই perfection of experience; তাহা যদি হয়, তবে কাব্য সুন্দর হইতে বাধ্য; সেই সৌন্দর্য্যই তাহার শুচিতা। অপরপক্ষে, কল্পনার শুচিতা রক্ষা করিয়া যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, তাহাতে Idealism-ই থাকিবে, perfection of experience না থাকাই সম্ভব, এবং তাহা উৎকৃষ্ট কাব্য হইবে না। এইরূপ বৃথা তর্কের অবসান যাহাতে হয় সেই উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা—নিজে যেমন বুঝিয়াছি তেমন করিয়া বুঝাইতে হয়ত পারি নাই; তথাপি আশা করি, এ আলোচনা একেবারে ব্যর্থ হইবে না।

বাংলা-সাহিত্যে উপন্যাস

(সকল আধুনিক সাহিত্যের মত বাংলাসাহিত্যেও উপন্যাস-নামক একটি বস্তুর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই উপন্যাস-নামক গদ্য-কাব্য য়ুরোপীয় সাহিত্যে অনেক পূর্ব্বেই দেখা দিয়াছে, আমাদের সাহিত্যে গত শতাব্দীর শেষভাগেই ইহা প্রথম পরিস্ফুট আকার ধারণ করে এবং তখন হইতে বাংলাসাহিত্যে ইহা একটি বিশিষ্ট ও বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া আছে।)

(কিন্তু 'উপন্যাস' নামটির অর্থ খুব ব্যাপক, এজন্য আধুনিক সাহিত্যে যাহাকে উপন্যাস বলা হয়, প্রাচীন সাহিত্যে তাহার স্পষ্ট প্রতিরূপ না হইলেও নানা আভাস বা আদল পাওয়া যায়। এইজন্য যাঁহারা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন করেন, তাঁহারা এই উপন্যাসের একটা কালানুক্রমিক বিকাশের ধারা অনুসরণ করিতে পারিয়া তাঁহাদের ঐতিহাসিক মনোবৃত্তির তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকেন। আমাদের সাহিত্যেও উপন্যাসের এইরূপ ধারা আবিষ্কার করিয়া একজন সুপণ্ডিত অধ্যাপক সে বিষয়ে একখানি বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আমি এই প্রবন্ধে সেই গ্রন্থকে উপলক্ষ্য করিয়া বাংলাসাহিত্যে উপন্যাসের ঐতিহাসিক ধারা এবং উপন্যাস-নামক গদ্য-কাব্য সম্বন্ধে কয়েকটি চিন্তা লিপিবদ্ধ করিব। তৎপূর্ব্বে, সাধারণভাবে বিষয়টির দুই দিক্ লইয়াই একটু ভূমিকা করিয়া রাখিলে ভালো হয়।

প্রথমতঃ, বাংলাসাহিত্যে, ঐতিহাসিক, অর্থাৎ প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক পর্য্যন্ত, উপন্যাসের ক্রমবিকাশের কথা। অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে এই দিক্‌টি লইয়াই বিশেষ গবেষণা করিয়াছেন। এই গবেষণার মূলে তিনি একটি তত্ত্বকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়াছেন। তাহা এই যে, কোন বস্তুর ক্রমপরিণতি বুঝিতে হইলে সেই বস্তুর পরিণত রূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই; উপন্যাস যত সুপরিণত রূপ লাভ করিবে, ততই তাহার প্রধান লক্ষণ হইবে বাস্তবানুগামিতা, অর্থাৎ তাহার পাত্র-পাত্রী বাস্তবজীবন ও চরিত্রকেই ফুটাইয়া তুলিবে, তাহাতে অবাস্তব কল্পনা বা রূপকথার প্রাধান্য থাকিবে না। উপন্যাসের ইতিহাস যদি অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে সব সাহিত্যেই আদি উপন্যাস-জাতীয় রচনায় ঐ অবাস্তবতার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে। ক্রমে যতই তাহা বাস্তবানুগামিতার পক্ষপাতী হইয়াছে, ততই

ধাঁটি উপন্যাসের নিকটবর্ত্তী হইয়া উঠিয়াছে। এই তত্ত্বটিকে ধরিয়া তিনি বাংলাসাহিত্যেও, অবাস্তব হইতে বাস্তবের দিকে ঐ জাতীয় রচনার গতি ও প্রবৃত্তি প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, এবং সেই প্রাচীন রচনাগুলিতে যেখানে যেটুকু বাস্তবতার চিহ্ন আছে তাহাতেই উপন্যাসের বীজ আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথমে ইহার সম্বন্ধেই দুই একটি তথ্যের উল্লেখ করিব।

বাংলাসাহিত্যের প্রাচীনতা খুব বেশি নয়। এজন্য গ্রন্থকার এই বীজের সন্ধানে সংস্কৃতসাহিত্য এবং পালিভাষার বৌদ্ধজাতক পর্য্যন্ত তাঁহার ঐতিহাসিক দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়াছেন। ভাষা-সাহিত্যে এবং মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ঐসকল প্রাচীন ভাবকল্পনা ও রচনাভঙ্গির প্রভাব অবশ্য স্বীকার্য্য হইলেও—কি প্রাচীন, কি প্রাক্-আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে 'আধুনিক উপন্যাসে'র বীজ থাকিতে পারে না—ছিলও না; তাই ইহা প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য। কল্পনার সঙ্গে কিছু কিছু বাস্তবের মিশ্রণ সকল কালেই সম্ভব —কিন্তু সেইজন্য সেইটুকু বাস্তবের ছিটাফোঁটাকে উপন্যাসের অপরিস্ফুট আদি-রূপ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন সাহিত্যের সহিত আমাদের বাংলাসাহিত্যের সাহিত্যিক যোগসূত্র এমন দৃঢ় বা অবিচ্ছিন্ন নয় যে, তাহা হইতে একটি অব্যাহত ধারার অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। অধ্যাপক মহাশয় তাহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। অতএব বাংলাসাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব যে এইরূপ একটি ক্রমবিকাশের ধারায় হয় নাই, তাহাই সর্ব্বাগ্রে মনে হইবার কথা; এবং তাহা যে কি সূত্রে, কেমন করিয়া হইয়াছে তাহাও এত সুগোচর যে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। য়ুরোপীয় সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা যদি কিছু থাকে, বাংলার সাহিত্যে সেরূপ কিছু নাই। আমি যথাস্থানে সে আলোচনা করিয়াছি।

অতঃপর উপন্যাসের এই ক্রমবিকাশ এবং বাস্তবানুগামিতাই যে তাহার চরম লক্ষণ, সে বিষয়ে সংক্ষেপে এই ভূমিকায় কিছু বলিয়া রাখি। সাহিত্যের ইতিহাস ঠিক রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ইতিহাস নয়—একটা জাতি বা সমাজের সামাজিক বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ছাপ সাহিত্যে পড়িয়া থাকে; সাহিত্যে তাহার যে আত্মপরিচয় যুগে যুগে প্রকাশমান হইয়া থাকে, তাহার একটা বিশেষ সুরও আছে। কিন্তু উপন্যাস প্রভৃতি যে সকল কাব্যকলার উদ্ভব এক এক কালে হইয়া থাকে, তাহার গতি-প্রকৃতি অতিশয় স্বতন্ত্র, এবং ক্রমবিকাশ

বা ক্রমোৎকর্ষের যে ঐতিহাসিক ধারণা তাহা দ্বারা সেইসকল শিল্পকীর্ত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ করিলে 'রসবস্তু' বা আর্টের প্রতি অতিশয় অবিচার করা হয়। কোন একটা পরিণাম বা পরিণত রূপ বা নির্দ্দিষ্ট আদর্শের অভিমুখে শিল্পীর সৃষ্টি-প্রয়াস যে নিরন্তর অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে তাহা কেবল আপেক্ষিক সাফল্য লাভ করিয়াছে, এমন মতবাদ সকল শিল্পকলার পক্ষেই উদ্ভট ও অযথার্থ হইয়া দাঁড়ায়। যদি এমন একটা সংজ্ঞাই এখন হইতে স্থির করিয়া লওয়া হয় যে, 'উপন্যাস' কোনও একটা বিশেষ আকার ও প্রকারের সাহিত্যশিল্প, তাহার প্রধান লক্ষণই বাস্তবানুগামিতা, তবে তাহারও ইতিহাসের প্রয়োজন নাই। কোন এককালে সেই ধরণের 'রসসৃষ্টি'ই নব নব রসের যে একটি বিশিষ্ট রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহা সেই কালেরই, এবং তাহার যে বিশিষ্ট রস, সেই রসটিকে আমরা আস্বাদন করিয়া ধন্য হইব—তাহার বিষয়েও আমরা রসবিচারে ব্যাপৃত হইব। আমি এ সম্বন্ধেও পরে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু বাস্তবানুগামিতা বা কল্পনানুগামিতা—ইহার কোনটাই রসবিচারে গ্রাহ্য নয়। উপন্যাস যদি একটা আধুনিক রসরূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে, এবং বাস্তবানুগামিতাই সেই রসের একটা উপাদান-কারণ হয়, তবে আমাদের রসাস্বাদ-শক্তিই আর-এক দিকে প্রসারলাভ করিয়াছে—ইহাই বুঝিব; রসরূপের অনন্ত বৈচিত্র্য উপলব্ধি করিয়া রসিকচিত্ত আশ্বস্ত হইবে। কিন্তু তজ্জন্য ওই বাস্তবানুগামিতাকেই উপন্যাসমাত্রের একমাত্র রসপ্রমাণ বলিয়া, অন্যবিধ উপন্যাসকে হীনরস বলিয়া প্রতিপন্ন করিব কেন? সাহিত্যের রস-বিচারে, এইরূপ ঐতিহাসিক মনোবৃত্তি ও ক্রমবিকাশ-তত্ত্বের শাসনাধীন হইলে যে সকল ভ্রম অনিবার্য্য—এই গ্রন্থখানিতে তাহা প্রচুর পরিমাণেই রহিয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার ধারাটিকে ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই,—তিনি উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন—যথা, ঐতিহাসিক উপন্যাস, রোমান্স, সামাজিক উপন্যাস প্রভৃতি, এবং ইহাদের প্রত্যেকটির বিশিষ্ট রস-প্রয়োজনের সহিত বাস্তবানুগামিতার প্রয়োজন মিলাইতে গিয়া যথেষ্ট বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। বাংলাসাহিত্যে উপন্যাসের এই বিভিন্ন রীতি প্রায় একই কালে আবির্ভূত হইয়াছে, এজন্য গ্রন্থকার-ধৃত সেই বাস্তবানুগামিতার ধারাটি একমুখে যে বহে নাই তাহার প্রমাণ—প্রত্যেক রীতিতেই সেই রীতির উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচিত হইয়াছে। সেইরূপ কোন উপন্যাসে যদি বাস্তব অপেক্ষা কল্পনার

আধিক্য লক্ষিত হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, বাস্তবানুগামিতাই এইরূপ সাহিত্যের একমাত্র রসপ্রমাণ নয়। কিন্তু যদি কেহ তাহাতেও সন্তুষ্ট না হন, অর্থাৎ রোমান্স-গন্ধী বলিয়া কোন উপন্যাস উৎকৃষ্ট নয়, এবং অতিরিক্ত বাস্তবানুগামী বলিয়াই তাহার তুলনায় অতিশয় নিকৃষ্ট রচনাও উপাদেয় হয় (ইহার প্রমাণ ঐ গ্রন্থে আছে), তাহা হইলে সেখানে সাহিত্যিক রস-সমালোচকদের পরিবর্ত্তে আমরা একজন অতিশয় সংকীর্ণ-রুচিগ্রস্ত পাঠকের পরিচয় পাই।

(আমি উপন্যাস বলিতে অবশ্য রূপকথা বা কল্পনাসর্ব্বস্ব কাহিনীই মনে করিতেছি না। উপন্যাসে মানুষের জীবনই প্রধান লক্ষ্য হইবে; অতিকায় দানব, রাক্ষস, জিন, পরী বা দেবতাদের কাহিনী উপন্যাস নহে। কিন্তু মানুষের জীবনও কি একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ? ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও কবি সকলেরই দৃষ্টি—সেই একই রসদৃষ্টি, যে দৃষ্টিতে মনুষ্য-জীবনের অতল অসীম রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। সে দৃষ্টি এমনই যে, তাহাতে বাস্তব অবাস্তবের ভেদ থাকে না; এবং অতিশয় বাস্তব ও অতিশয় অবাস্তব—দুইই একটি পরম বাস্তবের রূপে আমাদের অন্তরগোচর হয়। যে শক্তিতে ইহা সম্ভব তাহাই কবির সৃষ্টিশক্তি; সেই শক্তি যদি থাকে, তবে উপাদান-উপকরণ যেমনই হোক্, সেই সৃষ্টিতে মানুষের জীবনই এক অপূর্ব্ব সত্যানুভূতির আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।) কালে কালে মানুষের রুচির পরিবর্ত্তন হয়—একই রসকে ভিন্ন পাত্রে পরিবেশন করিতে হয়—তথাপি সেইরূপ পাত্র-পরিবর্ত্তন সেই রসের উৎকর্ষ-অপকর্ষের কারণ হয় না। যদি হইত, তাহা হইলে সাহিত্য-কলার যত অনুপম সৃষ্টি এ পর্য্যন্ত বিশ্বসাহিত্যে অমর হইয়া আছে—তাহাদের রস-আস্বাদনে একালের রসিকচিত্ত বিমুখ হইত।

(২)

উপন্যাসের সাধারণ ইংরাজী নাম Fiction—নভেল নয়; এবং উপন্যাসের নানা art form বা রসরূপ সাহিত্যের কাব্যবিভাগে দেখা দিয়াছে—পদ্যে, ও পরে গদ্যে তাহার যে সার্থকতা রসিকমাত্রই স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ত' এই 'বাস্তব'-'অবাস্তব' বিচারের উপর নির্ভর করে না। যাহা আর্ট বা কাব্যহিসাবে সার্থক হইয়াছে তাহা যে চিরকাল 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত হইয়া

আছে! ঐ মাপকাঠিতে যদি তাহার সে রসরূপ ধরা না দেয়, তবে মাপকাঠিই যে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে। সকল সাহিত্যিক সৃষ্টিই কাব্য—উপন্যাসের জাতি বা গোত্র যেমনই হউক, তাহা যদি কাব্য না হইয়া থাকে তবে তাহা কিছুই হয় নাই। বাস্তব জীবনের লজিক উপন্যাস-নামক কাব্যেরও লজিক নয়—কোনও লেখকই কবিদৃষ্টি হারাইয়া—কেবল 'বাস্তবানুগামী' হইয়া—কোনপ্রকার সাহিত্যসৃষ্টির গৌরব লাভ করিতে পারেন নাই। এই সৃষ্টিশক্তিই কবিত্ব, এবং কল্পনার প্রকৃতি অনুসারে, অর্থাৎ রসদৃষ্টির ভঙ্গি অনুসারে, উপন্যাসের প্রকৃতিও বহুবিধ হইয়াছে। এই বিভিন্নতার জন্য কালধারার প্রভাব কতখানি দায়ী—কোন্ যুগে, অর্থাৎ কোন্ ঋতুতে, কোন্ জাতের ফুল ফুটিয়া থাকে, সে জিজ্ঞাসা স্বতন্ত্র; কিন্তু প্রত্যেক ফুলের নিজ নিজ বর্ণে ও রূপে ফুটিয়া উঠিবার অধিকার আছে; শুধুই এক এক যুগে নয়—একই যুগের একাধিক কবির স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে তাহারা স্বতন্ত্র আকারে ফুটিয়া উঠে; সেখানে কালানুক্রমিক বিকাশের কথাও অবান্তর। উপন্যাস যদি মানুষের জীবনালেখ্য হয় তবে তাহা বহির্জগৎ ও মনোজগতের সামঞ্জস্যমূলক বা পরস্পর পরিপূরক একটি চিত্রলিপিই নয়—সেই দুই-ই যেমন বাস্তব, তেমনই তাহারা মানুষের জীবনকাহিনীর একটা অংশ মাত্র; এই দুই জগতের উপরে আর-একটা বৃহত্তর জগতের ছায়া সর্ব্বদা ব্যাপ্ত হইয়া আছে—তাহারই যাদুশক্তির প্রভাবে বাস্তব ও অবাস্তব দুই-ই সমান মূল্যবান্ হইয়া উঠে। কবিচিত্তে সেই জগতের ছায়া পড়ে—এবং তাহাতে সেই শক্তির যে ক্রিয়া ঘটে তাহারই নাম কল্পনা। এই কল্পনাই কবির সৃষ্টিশক্তি, এবং কল্পনার প্রকৃতিভেদে জীবনের আলেখ্য নানা রসরূপ ধারণ করে। কাব্যে, মহাকাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে সর্ব্বত্রই এই কল্পনা জীবনের নানারূপ ব্যাখ্যা নানা ভঙ্গিতে আমাদের রসচেতনার গোচর করে—সেই চেতনার গভীরতা ও পরিধি সকল ক্ষেত্রে সমান নয়, কিন্তু সর্ব্বত্র অনুভূতির সত্য আছে। সে কল্পনা বা কবিশক্তি যদি জীবনের কোন রূপকে বাস্তব-অবাস্তবের উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিতে পারে, তবেই তাহা সার্থক হয়; অতএব কল্পনা যেমন মিথ্যা নয়, তেমনই কোন সাহিত্যিক সৃষ্টিই কাব্য না হইয়া পারে না।

উপাদানের বাস্তবতাই কোন সাহিত্যিক সৃষ্টির নিরিখ হইতে পারে না। কবির কল্পনা যদি সেই বাস্তবকে রূপান্তরিত না করে তবে আমরা সেই

বাস্তবতায় মুগ্ধ হই কেন? যে বাস্তবকে আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই, তাহাকে বাস্তব বলিয়া অনুভব করি কেমন করিয়া? আবার, যে বাস্তব প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিয়াও কিছুমাত্র চিত্ত-চমৎকার অনুভব করি না, উপন্যাসে তাহাকেই নিখুঁত প্রতিফলিত হইতে দেখিয়া এমন মুগ্ধ হই কেন? ঐরূপ বাস্তব চিত্রকেই ইংরাজীতে বলা হয়—একটা 'creation' অর্থাৎ উহা রচনা করিতে উৎকৃষ্ট সৃজনশক্তি বা কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা বাহিরের বাস্তব হইলেও, ইহার জন্য এক ধরণের কল্পনারই প্রয়োজন হইয়াছে, কেবল কতকগুলি তথ্য সঙ্কলন করিয়া প্রমাণসহ তাহা বিবৃত করিলেই ঐ বাস্তবকে আমরা অন্তরে অনুভব করিতাম না; এখানে বাস্তবেরও অন্তর্নিহিত একটা গভীরতর বাস্তবকে—বাস্তবের যেন প্রাণমূর্ত্তিটিকে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। তেমনই মহাকাব্যের যে কল্পনা তাহাও জীবনের অন্তর্লোকের আর-এক প্রকার অবাস্তবকে আমাদের হৃদয়গোচর করে, সেখানেও সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব-অবাস্তব, প্রাকৃত-অপ্রাকৃত, রূপক ও যথার্থ—সর্ব্ববিধ উপকরণ-উপাদানের সাহায্যে, একটা একাগ্র কবিদৃষ্টি যে ভাববস্তুকে রূপ দেয় তাহাকে কবি বাস্তবের মতই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—তাই তাঁহার সেই দৃষ্টি কখনও ম্লান বা মূল্যহীন হয় না। আমি এখানে এমন একটি মহাকাব্যের দৃষ্টান্ত দিব, যাহার মত উৎকট কল্পনা আর কোথাও দেখা যায় নাই। আমি দান্তের (Dante) মহাকাব্যের কথা বলিতেছি। সে যুগে নভেলের সৃষ্টি হয় নাই, তাই তখনকার জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র উপন্যাসে প্রতিফলিত হইতে পারে নাই;—কিন্তু দান্তের মহাকাব্যই নাকি মধ্যযুগের খৃষ্টান য়ুরোপের আত্মার বাণী বহন করিতেছে, সে যেন সেই যুগকে একটি সুসম্পূর্ণ বাণীমূর্ত্তি দান করিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে দান্তের কল্পনা কি একটা গূঢ়তর ও বৃহত্তর বাস্তবকে দৃঢ়রূপে ধরিতে পারে নাই?

বাস্তবানুগামিতা কোন এক শ্রেণীর উপন্যাসের বিশিষ্ট লক্ষণ হইলেও, তাহাকেই 'fetish' করিয়া 'উপন্যাসে'র আদর্শ ও অগ্রগতি বিচার করা কোন সাহিত্যরসিকেরই শোভা পায় না।! বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে 'রোমান্সের আতিশয্য' আছে, ঐতিহাসিক 'তথ্যানুগামিতা' নাই। তাহা হইলে উপন্যাস হিসাবে উহাকে সাবালক বলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র তো 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' লেখেন নাই, সেকথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। সত্যকার সাহিত্যস্রষ্টার

মত তিনি তাঁহার স্বকীয় কবিদৃষ্টি এবং জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁহার নিজের আত্মিক রসোপলব্ধির প্রেরণায় যাহা রচনা করিয়াছিলেন,—জাতি (class) হিসাবে তাহাদের নাম যাহাই হউক, তাহাদের সেই রসরূপের নাম—'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না; কারণ সকল সৃষ্টিই অনন্যসদৃশ (unique)। এজন্য কোন আর্ট-কর্ম্মকে লইয়া Zoology-র মত শ্রেণীভাগ (classification) চলে না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস—মহাকাব্য, নাটক, গীতিকাব্য, নভেল—কোন শ্রেণীভুক্ত নয়, অথচ সকল শ্রেণীর লুকাচুরি তাহাতেও আছে, কারণ, তাহাতে জীবনের সমগ্রতা-বোধেরও প্রেরণা রহিয়াছে; তাহা বাস্তব-অবাস্তবের ভেদ মানে না, অর্থাৎ তাহা উৎকৃষ্ট কাব্য ও উৎকৃষ্ট সৃষ্টি; সেইজন্যই তাহা সাহিত্য-ব্যাকরণের সূত্র মানিয়া চলে না,—তাহা নিয়তিকৃতনিয়মরহিত। কিন্তু যেহেতু তাহারা ইতিহাস মানে না—সম্ভব-অসম্ভবের হিসাব রাখে না, অতএব, একপ্রকার গদ্যকাব্য হিসাবে উৎকৃষ্ট হইলেও, তাহারা উপন্যাসের নাবালক বয়স কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই!}

এক্ষণে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে উপন্যাসের বীজ বা অঙ্কুরোদ্‌গম সম্বন্ধে কিছু বলিব। দেশ, কাল ও পাত্রের সম্বন্ধঘটিত একটা মহানিয়ম সকল সৃষ্ট বস্তুর উপর আধিপত্য করিতেছে, তাহার ফলে সকলই ক্রমপরিণতিশীল, ইহা সত্য হইলেও, আর্টের ক্ষেত্রে এভোলিউশন-বাদ পুরাপুরি খাটে না—আধুনিক বাংলাসাহিত্যই তাহার একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ সাহিত্যে আর্টের যে নবতম রূপাবলী প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বহুলাংশেই আগন্তুক—একই যুগের আধারে একই শিখা দীপ হইতে দীপান্তরে সংক্রমিত হইয়াছে। আর্টের পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়। প্রত্যেক যুগেরই একটা বিশিষ্ট আর্ট-আইডিয়া (art idea) থাকে, তাহা সেই যুগের মধ্যেই নিঃশেষে পরিণতিলাভ করিয়া ঝরিয়া যায়। অজন্তার চিত্রাবলীতে একটা যুগের যুগোচিত আর্ট-আইডিয়া চরম-পরিণতি-শেষে ঝরিয়া গিয়াছে—তাহার সহিত পরবর্ত্তী কোন যুগের চিত্রাঙ্কন-রীতির এভোলিউশন-ঘটিত সম্বন্ধ না থাকিবারই কথা। পুরাকালে এবং তাহারও যুগবিশেষে যে সকল সাহিত্যিক রূপ (art form) দেখা দিয়াছিল তাহাদের সঙ্গে আধুনিক উপন্যাসের দূরতম সম্বন্ধও নাই; অতএব সেরূপ সম্বন্ধস্থাপনের চেষ্টা নিতান্তই নিরর্থক। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, আর্টের ক্ষেত্রেও ক্রমবিকাশের প্রাকৃতিক নিয়ম যদি বলবৎ হয়, তবে

কোন উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক শিল্পসৃষ্টিও আর স্বয়ংপূর্ণ হইতে পারে না—কবি-প্রতিভার কোন গৌরবই আর থাকে না।

ইংরেজী সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, অর্থাৎ তাহার উৎপত্তি ও পরিণতির যে একটি কালক্রম পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়া থাকেন, তাহার পক্ষে উক্ত সাহিত্যে প্রচুর সাক্ষ্য বিদ্যমান; এজন্য তাহা হইতে একটা ক্রমবিকাশের ধারণা হওয়া অসঙ্গত নয়, যদিও সাহিত্যিক রূপকর্ম্মের বিচারে এইরূপ উৎক্রান্তিবাদ আশ্রয় করার পক্ষে বাধাও যথেষ্ট আছে, কেহ কেহ তাহা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি ইংরেজী তথা য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রবৃত্তিই স্বতন্ত্র, সেখানে যাহা যে কারণে যে কালে সম্ভব হইয়াছে, আমাদের সাহিত্যেও তাহা সেই কারণে সেই নিয়মে সম্ভব নয়। সকল বস্তুর আদিম রূপ প্রায় এক হয় বলিয়া আমাদের ভারতীয় সাহিত্যেও ওই স্তরের রূপসাদৃশ্য অসম্ভব নয়, তাই বলিয়া তাহার বিকাশের ধারা বা পরিণতির নিয়ম এক না হইবারই কথা। নভেল নামক বিলাতী উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ—তাহার character বা ব্যক্তি-চরিত্রাঙ্কন; ইহার মূলে আছে সমাজ বা গোত্র-চেতনার বিপরীত একরূপ ব্যক্তি-চেতনার উন্মেষ। সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে যদি ভাব-প্রেরণার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকে, তবে এবিষয়ে আমাদের সাহিত্যের প্রেরণা সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। আমাদের জাতির তুলনায় য়ুরোপীয় জাতিসকলের ব্যক্তি-চেতনা বা স্বাতন্ত্র্যবোধ যে কিছু উগ্র তাহা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ তাহাদের সাহিত্যে বহুদিন পর্য্যন্ত ব্যক্তি-আদর্শের প্রতিষ্ঠা না করিলেও, অতি পূর্ব্বকালেই য়ুরোপীয় সাহিত্যে পৌরুষের যে আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের আদর্শ তাহা হইতে অতিশয় বিলক্ষণ। তথাকার প্রাচীন সাহিত্যে যে দুইটি কাব্যরূপের বিকাশ হইয়াছিল, সেই 'এপিক' ও 'ট্র্যাজেডি'র মধ্যে এমন একটি বস্তুর দর্শন পাওয়া যায়, যাহা আমাদের সুপরিপুষ্ট প্রাচীন সাহিত্যের নাটকে বা মহাকাব্যে কখনও স্থান লাভ করে নাই। এই বস্তুর নাম দেওয়া যাইতে পারে—পুরুষের আত্মশক্তির দুর্দ্দমনীয়তা-বোধ, বা বিশুদ্ধ পৌরুষ, যে পৌরুষ কোন দৈব বা অধ্যাত্মশক্তির বশ্যতা স্বীকার করে না। একজন আধুনিক ইংরেজ কবি একালে এই কয়টি কথায় সেই আদর্শের জয়গান করিয়াছেন—

> "It matters not how strait the gate,
> How charged with punishments the scroll,
> I am the master of my fate,
> I am the captain of my soul ;"

—এখানে সেই প্রাচীন 'হিরো'-আদর্শ ও আধুনিক 'ব্যক্তি'-আদর্শ চমৎকার মিলিয়াছে ; তাহাতে আরও প্রমাণ হয় যে, এককালে যাহা কেবল বীর-চরিত্রের আদর্শ ছিল তাহার মধ্যেই ব্যক্তিমাত্রের আত্ম-স্বাতন্ত্র্যবোধ নিহিত আছে। আমাদের সাহিত্যে, বিশেষতঃ প্রাক্-আধুনিক সাহিত্যে, এইরূপ ব্যক্তিত্ব-ঘোষণার দৃষ্টান্ত সুলভ নহে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বিদ্রোহমাত্রেই এইরূপ শক্তির প্রমাণ নয়—সে বৃত্তির মূলে প্রবল ধর্ম্মবিশ্বাস থাকিতে পারে ; আবার, প্রেমের মত প্রবল হৃদয়াবেগের বশে সমাজ বা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করার যে দৃঢ় সাহস তাহাতেও আত্মচেতনা অপেক্ষা আত্মবিস্মৃতির মাত্রাই অধিক।

পৌরুষের এই য়ুরোপীয় আদর্শ তথাকার সমাজ-জীবনকে যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, ভারতীয় জীবনে তেমন না হওয়াই স্বাভাবিক। য়ুরোপে মধ্যযুগের জমিদার-তন্ত্র ও যাজক-তন্ত্র এই চেতনাকে অনেক পরিমাণে নিপীড়িত করিয়া রাখিলেও সে জাতির প্রকৃতিগত সেই স্পৃহা কখনও সম্পূর্ণ দমিত হয় নাই ; তাই রাষ্ট্রে ও সমাজে বার বার বিপ্লব ঘটিয়াছে, এবং শেষে সেই চেতনাই পূর্ণ মুক্তি লাভ করিয়া সাহিত্যেও নূতনতর রস-রূপের প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। এই কারণে বিলাতী সাহিত্যে নভেল নামক উপন্যাসের লক্ষণ—তাহার বীজ বা পূর্ব্বাভাস—একটা ক্রমবিকাশের ধারণা জন্মাইতে পারে। তথাপি ক্রমবিকাশ-কেই সাহিত্যের রূপ-বিবর্ত্তনে একটা অব্যর্থ নিয়ম বলিয়া গণ্য করা যায় না। কালে কালে সাহিত্যে যে সকল রস-রূপের উদ্ভব হয়—গৌণভাবে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক চেতনা তাহাদের মূলে যতটুকুই বিগুমান থাকুক, শেষ পর্য্যন্ত কবির প্রতিভাই তাহাদের স্রষ্টা এবং নিয়ামক। এক একটি মৌলিক প্রতিভা, বাহ্য প্রতিবেশ প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াই, অভিনব রসদৃষ্টির অধিকারী হয়, এবং তাহার সৃষ্ট সেই কাব্যজগৎ হইতেই নূতন ভাবধারা উদ্ভূত হইয়া সাহিত্যের ইতিহাসে এক একটি ঋতুর সৃষ্টি করে—যেন মাটির সঙ্গে, বাস্তবের সঙ্গে, সামাজিক বা রাষ্ট্রিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যতিরেকেই সাহিত্যের একটা

স্বতন্ত্র জীবন শুরু হইয়া থাকে। তথাপি জাতির স্বধর্ম্ম ও প্রাকৃতিক প্রতিবেশ প্রভৃতির কারণে সেই প্রতিভারও—শুধু ব্যক্তিগত নয়, একটা জাতিগত বৈশিষ্ট্য থাকিবেই; আমাদের সাহিত্যে যেমন কোন কালেই হোমার বা শেক্‌স্‌পীয়ারের আবির্ভাব হয় নাই, তেমনই য়ুরোপীয় সাহিত্যেও রামায়ণ রঘুবংশের মত কাব্যের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। অতিশয় আধুনিক কালে পৃথিবীময় ভাবের যে আদানপ্রদান বা সামাজিক সংস্পর্শের অবাধ সুযোগ ঘটিয়াছে, তাহাতে বহুদূরান্তরিত বিবিধ ভাবধারার সংমিশ্রণে, বর্ণসঙ্করের মত সাহিত্যেও যে রূপসঙ্কর অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, সেই সকল রসসন্ততির জাতি-নির্ণয় যেমন দুষ্কর, তেমনই তাহাদের ভিতরে কোন একটা ধারার সন্ধান পাওয়া যাইবে না, সকল ধারাই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

অতএব শেষ পর্য্যন্ত এমন কথা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্যের রূপ-বিবর্ত্তনে দুইটি বস্তুই প্রধান—কবিপ্রতিভা ও তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্য, এবং—কালের ধারা নয়—এক একটা ঋতুর আবির্ভাব। সাহিত্যের জগতে এই ঋতুগুলি যেমন অসংখ্য তেমনই তাহাদের কোন কালানুক্রম বা নির্দ্দিষ্ট আবর্ত্তন-চক্র নাই, বরং তাহাদের মধ্যে অভূতপূর্ব্বতা বা আকস্মিকতার লক্ষণই প্রবল। সাহিত্যে নব নব ঋতুর সৃষ্টিও যেমন শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভারই ধর্ম্ম—ঋতুর নিয়ত পরিবর্ত্তন তাহার উন্মেষের পক্ষেও বড় প্রয়োজন, তেমনই, তাহার আত্মিক প্রবৃত্তিতে যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে তাহাও সে প্রতিভার এক অলঙ্ঘনীয় নিয়তি; এ যেন একই আধারে একটা নিত্যসত্তার সহিত অনন্ত অনিত্য রূপের লীলা-বিলাস। ইহার একটি দৃষ্টান্ত আধুনিক বাংলাসাহিত্যেই জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মত এমন অভিনব ও বহুরূপী প্রতিভার উদয় আমাদের সাহিত্যে আর হয় নাই, এমন সর্ব্বাশ্রয়ী রসচেতনার প্রমাণ আর কোথাও মিলিবে না। কিন্তু তাঁহার ভাবকল্পনার সেই সার্ব্ব-ভৌমিকতা—তাহার সেই অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যেও, তিনি একান্তভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয় আদর্শের এমনই বশীভূত যে, তাঁহার সেই মুক্তির কারণও—সেই বন্ধন। আমার এই কথাগুলি একটু বড় হইয়া পড়িল তাহা বুঝিতেছি, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনাকালে কেবল কতকগুলি বাহ্যিক ঘটনার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে গূঢ়তর ও ব্যাপকতর সত্যকে হারাইতে হয়, বিশেষের

আলোচনাতেও সমগ্রের চিন্তা অপ্রাসঙ্গিক নয়, বরং তাহাতেই অনেক রহস্যের সমাধান হইতে পারে।

(৩)

উপন্যাস বিশেষ করিয়া আধুনিক বাংলাসাহিত্যের জিনিষ,—বাংলা গদ্যের ইতিহাস যেমন বেশি পূর্ব্বে টানিয়া লওয়া যায় না (গবেষকগণ সেরূপ হাস্যকর চেষ্টাও করিয়া থাকেন), তেমনই বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস অথবা তাহার বিকাশধারাকে আধুনিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন নিকট বা দূর-কাল হইতে টানিয়া আনা পাণ্ডিত্যমূলক গবেষণার একটি জবরদস্তি মাত্র। একটা অতিশয় সংক্ষিপ্ত কালের মধ্যে বাংলাসাহিত্যে উপন্যাসের যে নানা রূপ দেখা দিয়াছে, তাহাতে একটা ঋতুর কথাই উঠিতে পারে—সে ঋতুকে কবি-প্রতিভার উন্মেষক একটা যুগসন্ধিক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করাই সঙ্গত। সে একটা বৃহৎ accident-এর মত ;—নানা ঘটনার যোগাযোগ ও নানা অবস্থার অপ্রত্যাশিত সংযোগে, য়ুরোপীয় কাব্য-সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে, আমাদের রস-চেতনায় যে সাড়া জাগিয়াছিল তাহাতেই আমাদের সাহিত্যে উপন্যাস দেখা দিয়াছে। এই সাড়া মুখ্যতঃ ভাবকল্পনার বা সাহিত্যিক প্রেরণার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ—সমাজ বা ব্যক্তি-জীবনের বাস্তব অবস্থার সহিত তাহার সম্পর্ক খুবই সামান্য। তথাপি এই নূতনের প্রেরণায় আমাদের পুরাতন ভাব-সংস্কারে কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছিল, কি কারণে আমাদের উপন্যাসে বিলাতী উপন্যাসের ধারা রক্ষিত হয় নাই—সত্য ও কল্পনা, বাস্তব ও আদর্শ তাহার কতখানি সহায়তা করিয়াছে—এ সকল বুঝিবার জন্য সেই যুগ বা ঋতুর পরিচয় ছাড়াও, প্রাচীন সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্মের ইতিহাস হইতে জাতির প্রাণমনের বিশিষ্ট ভঙ্গি, তাহার রক্তগত সাধনা ও সংস্কৃতির বীজ সন্ধান করিবার প্রয়োজন আছে। আর সকল দিক অগ্রাহ্য করিয়া কেবল কোথায় কতটুকু বাস্তবতা বা জীবধর্ম্মের অকুণ্ঠিত প্রকাশ আছে তাহাই খুঁটিয়া খুঁটিয়া সংগ্রহ করা ও তাহা হইতে আধুনিক বাস্তববাদ, জীবন-বাদ, ব্যক্তি আদর্শ প্রভৃতির প্রবণতা প্রমাণ করা—অর্থাৎ, তাহা দ্বারা উপন্যাসের ক্রমবিকাশের সূত্র নির্ম্মাণ করা—সেও একটা মনগড়া উপন্যাস বা

উপ-বিন্যাস। সাহিত্যের কোন একটা রস-রূপ—ছাঁদ বা ছাঁচ—এক সাহিত্য হইতে অপর-এক সাহিত্যে সংক্রামিত হইতে পারে; কিন্তু যেহেতু এক জাতির জীবনধারা অপর জাতি হইতে স্বতন্ত্র, একের বাধাবিঘ্ন যেমন, অপরের তেমন নয়—সেই হেতু, জীবনের সঙ্গে যদি সাহিত্যের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই থাকে, তবে সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি ভিন্ন হইতে বাধ্য। ভারতবর্ষ ও য়ুরোপ এই দুইয়ের জীবন-ধারায় প্রবৃত্তির পার্থক্য যেমন আছে, তেমনই উভয়ের আধ্যাত্মিক বিকাশের ধারাও এক নহে। খ্রীষ্টধর্ম্ম য়ুরোপের পক্ষে পরধর্ম্ম; পাশ্চাত্যের প্রতিবেশপুষ্ট যে জীবন, সেই জীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া এই প্রাচ্যধর্ম্মের বীজ যেরূপে তথাকার জলমাটিতে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইয়াছে, ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ সে পথে সে ধারায় হয় নাই; কারণ, এখানকার অধ্যাত্মসংস্কার এই দেশেরই মাটি ও জলবায়ুর ফল—এদেশের সকল ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম; এজন্য আমাদের সামাজিক জীবনেও যেমন, ভাবজীবনেও তেমনই, একটা মূল আদর্শের বিকাশ সমান ও সুসমঞ্জস ধারায় বহিয়া আসিয়াছে। আধুনিক সাহিত্যের যে রূপগুলি খাঁটি প্রতিভার সৃষ্টি—যেগুলি দুর্ব্বল বা বিকলাঙ্গ নয়, অজীর্ণ ও অমেধ্য অনুকরণও নয়, তাহাদের মধ্যে জাতির গভীরতর আত্মিক সংস্কার ও বহুকালাগত বিশিষ্ট সংস্কৃতির প্রভাব থাকিবেই। সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডের, বিশেষ করিয়া চীন ও ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সভ্যতা—এ দুই দেশের মানব-ইতিহাসের ধারা—য়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গের ধারণায় কিছুতেই স্পষ্ট হইয়া উঠে না, তাহাকে একরূপ পাশ কাটাইয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। মিশর হইতে পারস্য পর্য্যন্ত একরূপ বুঝিতে পারা যায়—মানবসভ্যতার জন্মস্থান, তাহার আদিকেন্দ্র ও পরিধি ওই ভূভাগের মধ্যেই সমাপ্ত হইয়া আছে, তাহার পর আর দৃষ্টি চলে না। আধুনিকতম বিদ্বান ঐতিহাসিকও পৃথিবীর ইতিহাস লিখিতে বসিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু লিখিবার আবশ্যকতা বোধ করেন না—তাহার কারণ, ভারতবর্ষের সকল-কিছুই কিম্ভূত রকমের; ব্রহ্মার চারিমুখ ও গণেশের গজমুণ্ড দেখিয়া, তাঁহারা বোধ হয় ভারতবর্ষকে মানবসভ্যতার ইতিহাসের বহির্ভূত বলিয়াই মনে করেন। সেকালের এক বিখ্যাত বিলাতী সাহিত্যিক William Archer-এর একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থে এই মনোভাব অতিশয় খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল, ভদ্রলোক একটি infant terrible-এর মতই তাঁহার

স্বদেশীয় পণ্ডিতসভায় নিজেদের মনের কথা ফাঁস করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের দেশের ইংরেজী-শিক্ষিত পণ্ডিতেরা তাঁহাদের বিলাতী গুরুদের মতই ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সাধনা সম্বন্ধে নাস্তিক, তাঁহাদের কেহ যদি আধুনিক বিদ্যায় অর্থাৎ বিজ্ঞানের পরা-তত্ত্বে পূর্ণ অধিকার লাভ করিয়া উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করেন তবে তাঁহার সেই নাস্তিকতার দম্ভও অভ্রভেদী হইয়া উঠে। এত কথা বলিলাম এইজন্য যে, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যেও য়ুরোপীয় আদর্শ আরোপ করিয়া এবং তাহারই অনুসারে কোনও একটি লক্ষণকে মূল্যবান ও অপর সকলকে মূল্যহীন বিবেচনা করিয়া সাহিত্য-সমালোচনার যে পাণ্ডিত্য তাহারও মূলে এই মনোভাব বিদ্যমান। এইজন্যই এ সাহিত্যে নভেলের বীজ খুঁজিতে গিয়া সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যকে, এবং তৎপ্রভাবিত বলিয়া আরও অনেক কিছুকে গালি দিতে হয়। নভেলের মধ্যে ব্যক্তি ও সমাজঘটিত যে নব-মনোভাবের প্রেরণা রহিয়াছে তাহা এই অতি প্রাচীন সমাজের মানব-মনে সুদীর্ঘ কালেও সম্ভব হয় নাই কোন্ গূঢ়তর কারণে—গ্রন্থকার তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই; অথবা তিনি কেবল বিলাতী বিদ্যারই সাধনা করিয়াছেন, ভারতবর্ষের সাধনা ও সংস্কৃতির সহিত কোনরূপ সাক্ষাৎ পরিচয় তাঁহার ঘটে নাই; যদি তাহা ঘটিত, তবে একটা বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হইতে পারিতেন—তাহা এই যে, এদেশের ব্যক্তিত্ব-সাধনার বা ব্যক্তি-মন্ত্র আরও গূঢ়, আরও দুর্দ্ধর্ষ; সে সাধনা সাক্ষাৎ সমাজ-সম্পর্কিত নয়, বরং সকল সামাজিক প্রয়োজনকে তুচ্ছ করিয়া তাহা অতি নির্জ্জন ব্যক্তি-মানসের দুর্গম দুর্গে আপনাকে দৃঢ়-রক্ষিত করিয়া আছে। এই ব্যক্তিত্ব-চেতনা বা আত্ম-স্বাতন্ত্র্যবোধ য়ুরোপীয় বা অন্য কোন সমাজের মত একটা মানস-বৃত্তি বা চিত্তের চারিত্রিক প্রবৃত্তিই নয়,—ইহার মূল এমন স্থানে এমন দৃঢ় হইয়া আছে যে, ইহাকে কোন যুগ-প্রভাব এখনও বিচলিত করিতে পারে নাই। এই কারণে ধর্ম্ম-সাধনায়, আচারে-অনুষ্ঠানে, কাব্য-সাহিত্যে, কারুশিল্পে,—যাবতীয় বার্ত্তা-বিধিতে—যাহা কিছু ভারতীয় তাহাই অতিশয় অনন্যসাধারণ।

(৪)

বিলাতী সাহিত্যে নভেলনামক উপন্যাসের জন্ম—ব্যক্তি-আদর্শ, মানুষ-মাত্রের সমান অধিকার প্রভৃতি নূতনতর চেতনার উন্মেষ হইতে ঘটিয়াছে, এবং

তাহাও যে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিপ্লবের ফল—আমাদের এই জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির পূর্ব্বক্ষণে তেমন কিছুর পরিচয় পাওয়া যায় না। যে জাতীয় উপন্যাসকে একজন বিলাতী সমালোচক 'Epic of Democracy' বা—সাহিত্যিক 'Declaration of Independence' বলিয়াছেন, এ দেশের উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-সমাজে তাহার কোন সজ্ঞানতাই ছিল না।

আমাদের আধুনিক সাহিত্যে মহাকাব্যের পরে যে নূতন গীতিকাব্যের যুগ সহসা আবির্ভূত হইয়াছিল, কবিকল্পনার গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে ফিরিয়াছিল, ইংরেজী রোমাণ্টিক কাব্যের প্রভাবই তাহার কারণ। এই যুগে রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম গল্পে ও কবিতায় জীবনের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ প্রকাশ-গুলিকে একটা মহিমা দান করিয়াছিলেন, অতিশয় সাধারণ মানবচরিত্রকে নূতন আদর্শের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার একটি প্রবন্ধে ('পঞ্চভূতে'র 'মনুষ্য') কবিকল্পনার এই নূতন দায়িত্বের কথা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন—'dignity of man as a man'-এর ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাও অনেক পরের কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও অতি উচ্চ আদর্শবাদী, তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত 'ব্যক্তি-মানুষের' পরিবর্ত্তে 'মনুষ্যত্ব'কেই একটি ভাবস্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তখনও অতি বিশুদ্ধ বাস্তবতা বাংলাসাহিত্যে প্রকট হইয়া উঠে নাই।

'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলাসাহিত্যের প্রথম উপন্যাস,—কিন্তু ইহার জন্ম কোথা হইতে কেমন করিয়া হইল, এবং উহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা অনুবর্ত্তী একাধিক ঐ জাতীয় রচনার দর্শন মেলে কি না—এ সকলের সদুত্তর দেওয়া দুরূহ। সেকালের বাঙালী-জীবনেই এরূপ উপন্যাসের জন্মকারণ সন্ধান করিতে গিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

> "তখন সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করিবে তাহা ইংরেজী সভ্যতার সহিত সংস্পর্শজনিত আমাদের সমাজ ও পরিবারের মধ্যে একটা তুমুল বিক্ষোভ ও আন্দোলন। এই বিক্ষোভ ও আন্দোলনই আমাদের নব-উপন্যাস-সাহিত্যের প্রথম এবং প্রধান উপাদান হইয়া দাঁড়াইল।" (পৃঃ ২৫)

ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে ইহাই ত হওয়া উচিত। অধ্যাপক মহাশয় যে বিক্ষোভ ও ভাববিদ্রোহের কথা বলিয়াছেন তাহার মূলে ছিল ব্যক্তিত্ব-চেতনার উন্মেষ, কারণ তাহাই নভেলনামক বাস্তবানুগামী উপন্যাসের

অনুকূল। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও—সংস্কৃত পুরাণ, শাস্ত্র, ভাষা প্রভৃতির শাসনমুক্ত গণমনোভাবের জাগরণ হওয়া সত্ত্বেও—'আলালে'র মত এমন 'সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণাবয়ব' নভেলের আদর্শও ভাসিয়া গেল; তাহার সেই—'বাস্তবানুগামিতা'কে নিষ্ফল করিয়া যে উপন্যাস বাংলাসাহিত্যে দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইল, তাহা শুধুই একটা ভিন্ন বস্তু নয়, তাহার ভিতর দিয়াই বাংলা গদ্যসাহিত্য ও বাংলা গদ্যভাষা প্রকৃষ্ট প্রাণধর্ম্মে সঞ্জীবিত ও অতুলনীয় ভাবকল্পনায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহা বাস্তবানুগামী নভেল নয়—ভাবকল্পনা-ময় রোমান্স; এবং তাহাও প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ, ভাষার সংস্কৃত ঐশ্বর্য্য বা Sanskrit Eloquence ও ভারতীয় মধ্যযুগের কাল্পনিক ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়াছে। এই ঘটনাটি এতই প্রত্যক্ষ ও অবিসংবাদিত যে, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' নির্ণয় করিতে হইলে, এবং তাহার পূর্ব্বাপর বিকাশের নিয়মটিকে বুঝিতে হইলে—'বাস্তব' ও 'বাস্তবানুগামিতা'র সকল ভরসা বিসর্জ্জন দিতে হয়; অর্থাৎ বিলাতী সাহিত্যের নজির একেবারেই চলে না। 'ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে' সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া বাঙালী কেবল স্বপ্ন দেখিয়াছিল। বাঙালী জাতির প্রকৃতিতে যে অসাধারণ ভাব-প্রবণতা আছে তাহারই কারণে, এবং ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের অপূর্ব্ব রূপ-রস আস্বাদন করার ফলে, তাহার সুপ্ত সাহিত্যিক প্রতিভা, বাস্তব-রস-রসিকতায় নয়—কল্প-জগৎ-সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল; সেই কল্পনাশক্তির বলেই সে গদ্যে ও পদ্যে যে কাব্য-জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহা যেমন সার্থক সাহিত্যের গৌরবে, তেমনই একটা বৃহত্তর ও গূঢ়তর সত্যের মহিমায়, শুধু অটুট হইয়া নাই,—জাতির ভবিষ্যৎ যাত্রাপথের দিক নির্ণয় করিয়াছে।

বাংলাসাহিত্যে উপন্যাসের ক্রম-বিবর্ত্তন হয় নাই—'সম্পূর্ণাবয়ব' 'সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর' উপন্যাস—যথার্থ creation-এর মতই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভায় 'বৃন্তহীন পুষ্পসম' ফুটিয়া উঠিয়াছিল—সে যেন একেবারে কবচকুণ্ডলধারী কর্ণের মতই আমাদের ভাষায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। ইহাকেই বলে সৃষ্টি, ইহা কোন বিশেষ আয়োজনের অপেক্ষা রাখে নাই—সে যুগের পূর্ব্বে এমন বস্তুর দর্শন কোথাও মেলে নাই। তাই 'দুর্গেশনন্দিনী'র আবির্ভাব একটা স্পষ্ট যুগান্তর সূচনা করিয়াছিল, সেকালের ইংরেজীশিক্ষিত পণ্ডিতমহলে একটা বড় আশার সঞ্চার করিয়াছিল। সে যেন সত্যই একটা আবির্ভাব—যেমন আকস্মিক তেমনই

বিস্ময়কর। তথাপি ইহারও কারণ নির্দ্দেশ করা দুরূহ নয়। প্রথম কারণ,—কবির স্বকীয় প্রতিভা, যাহার মত কারণ আর নাই; দ্বিতীয় কারণ—ঐ যুগেরই বিলাতী সাহিত্যে উপন্যাসের অভূতপূর্ব্ব অভ্যুদয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে—পারিবারিক, সামাজিক, রোমান্স, ইতিহাস—যে লক্ষণই থাকুক, তাহাতে জীবনকে দেখিবার যে দৃষ্টিভঙ্গি আছে তাহা সর্ব্বত্রই এক। সে দৃষ্টি কবির দৃষ্টি; তাহার ফলে যাহা সৃষ্টি হইয়াছে তাহা উৎকৃষ্ট উপন্যাস, বা মানব-জীবন-কাহিনীর উৎকৃষ্ট গদ্যকাব্য; বাংলাসাহিত্যে ইহাই উপন্যাসের আদি-রূপ এবং ইহার কোন পূর্ব্বধারা অথবা কোন অপরিণত রূপ সন্ধান করিতে যাওয়াই পণ্ডশ্রম।

(৫)

যে কালে নব্য বাংলাসাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল—উনবিংশ শতাব্দীর সেই শেষার্দ্ধে বাস্তবানুগামিতা সাহিত্যিক প্রতিভার সহচর হয় নাই—সে প্রেরণা যদি কোথাও কিছুমাত্র লক্ষিত হইয়া থাকে, তবে তাহা জাতির সমগ্র চেতনায় সঞ্চারিত হয় নাই—তাহাতে জাতির জীবনে নবজাগরণ তথা বাংলাসাহিত্যে সেই Renaissance ঘটে নাই। এই 'উপন্যাস' যেমন বাংলাসাহিত্যে গদ্যের মতই একটা অভিনব বস্তু—তেমনই প্রকৃত বাংলা উপন্যাসের আদি-স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র কেবল ঔপন্যাসিক নহেন, তিনি সেই Renaissance-এর নায়ক। এই Renaissance-এ মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি কেবল সাহিত্যিক রূপ-কর্ম্মে ও কাব্যের নবজীবন সঞ্চারেই সীমাবদ্ধ ছিল; পরে কবি মধুসূদনকেও অতিক্রম করিয়া ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, কেবল সাহিত্যে নয়—জাতির সমগ্র মনোজীবনে, তাহার আত্মিক উৎকণ্ঠা ও আকূতিতে—নবচৈতন্য সঞ্চার করিয়াছিলেন। বঙ্কিম-মধুসূদনের পূর্ব্বে শুধু যে উপন্যাসের জন্ম হয় নাই তাহা নয়, নব্য বাংলাসাহিত্যেরই জন্ম হয় নাই—সত্যকার সৃষ্টিশক্তির নিদর্শন কোথায়ও দেখা দেয় নাই। 'আলালের ঘরের দুলাল' যে প্রবৃত্তির পরিচয় দেয়, তাহাতে সেই প্রবৃত্তির যেটুকু সাফল্য লক্ষ্য করা যায়—তাহাতেই সেই একখানিমাত্র পুস্তককে সেই যুগের যুগপ্রবৃত্তির নির্দ্দেশক তো বলা যায়ই না, উপরন্তু তাহার সাহিত্যিক মূল্য অপেক্ষা

ঐতিহাসিক মূল্যই অধিক, এবং সে মূল্যও পরবর্ত্তী সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির বিচারে খুব সামান্যই বলিতে হইবে। জাতির গভীরতর চৈতন্যে তখনও সাড়া জাগে নাই—নবজন্মের সূচনামাত্র হইয়াছে, নবজীবনের উন্মাদক ভাবধারা তখনও আগল ভাঙে নাই, তাই তখনও প্রতিভার জন্মও হয় নাই। বঙ্কিম-যুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে উপন্যাস রচনার যে প্রবৃত্তি দেখা যায় তাহাতে মৌলিকতা বা সৃষ্টিশক্তির একান্ত অভাবই অতিশয় লক্ষণীয়—প্রায় সবগুলিই অনুবাদ বা অনুসরণ। কিন্তু তথাপি তাহার সাধারণ প্রবৃত্তি বাস্তবানুগামিতা নয়—রোমান্স-রস-পিপাসা। সেকালের রসিকচিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল যে ধরণের 'উপন্যাস' তাহা 'আলালের ঘরের দুলাল' নয়—'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'কাদম্বরী', 'পৌল-বর্জ্জিনী'; এবং 'টেলিমেকাস', 'রাসেলাস' ছাড়াও—মধুসূদন মুখোপাধ্যায় নামক এক লেখক বহু গল্পের অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য্য কৃষ্ণকমল 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' নামে বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে যে উপন্যাস রচনা করেন তাহাও ভাষায় ও রচনা-ভঙ্গিতে বঙ্কিম-পূর্ব্ব যুগের সূচনা করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তকখানির পরিচয় দিয়া ও তাহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া ঐতিহাসিকের একটা বড় উপকার করিয়াছেন—এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কালের বিশিষ্ট গল্প-লেখক ও সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছিলেন—

> "এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আমি যেন ভাষা-রাজ্যের আর এক দেশে উপস্থিত হইলাম, এ ত' 'কাদম্বরী' নয়, 'বেতালপঁচিশ' নয়, তারাশঙ্করও নয়, প্যারীচাঁদও নয়,—এ যে এক নূতন সৃষ্টি, ইহাতে কাদম্বরীর আড়ম্বর নাই, বিদ্যাসাগরের সরসতা নাই, অক্ষয়কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারীচাঁদের গ্রাম্য সরলতা নাই, অথচ যেন সকলই আছে, এবং উহাদের ছাড়া, আরও যেন কিছু নূতন আছে। আমি বারবার তিনবার পাঠ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই ভাষার বিশেষত্ব আয়ত্ত করিতে পারিলাম না......বিশেষত্ব এই যে, সংজ্ঞাপদে এবং বিশেষণে, স্থলে স্থলে সংস্কৃতের মত; ক্রিয়াপদগুলি অনেকস্থলেই খাঁটি বাঙ্গালা...আমার বিশ্বাস, 'দুরাকাঙ্ক্ষে'র ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী।"

বাংলাসাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম যে সার্থক উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা নভেল নয়, ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়,—তাহা রোমান্স-জাতীয় বস্তু; তাহার পূর্ব্বে আর কোন জাতীয় উপন্যাসই জন্মগ্রহণ করে নাই—ইহা একটি অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক সত্য। য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘাতে এ

জাতির চেতনায় যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল—তাহার প্রাণমূল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া যে আধ্যাত্মিক সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতর দিয়া বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে শক্তির স্ফুরণ দ্বারা সেই সঙ্কট হইতে সে রক্ষা পাইবার সাধনা করিয়াছিল—সেই প্রবল, গম্ভীর ও উদ্বেল ভাবাকুলতাকে বঙ্কিমচন্দ্র একটা সুগঠিত ও সুনিরূপিত আদর্শবাদে সংহত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং তাহার প্রেরণায় তিনি একটি অপূর্ব্ব বাণীকে উপন্যাসের আকারে অসামান্য রূপলাবণ্যে মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাই বাংলাসাহিত্যে উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাবকে বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে বাস্তবানুগামিতার মাপকাঠিখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে; আর যে-যুগের পক্ষে তাহার যে প্রয়োজনীয়তাই থাকুক—বঙ্কিম হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে-যুগ, সেই যুগের প্রধান প্রবৃত্তি বাস্তবানুগামিতা নয়।

সাহিত্যের ষ্টাইল

(১)

আধুনিক সাহিত্য-বিচারে সবচেয়ে বড় কথা বা মূল প্রশ্ন যাহা তাহার বিলাতী নাম—'ষ্টাইল'। আমাদের দেশে যাঁহারা ইংরেজী সাহিত্যের রীতিমত চর্চ্চা করিয়া থাকেন, এই ষ্টাইল কথাটি তাঁহাদের নিত্যব্যবহার্য্য, অতএব অতি পরিচিত শব্দ। আবার পারিভাষিক অর্থ ছাড়াও অন্যবিধ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ আমাদের বৈঠকী আলাপেও হইয়া থাকে—সাহিত্যপ্রসঙ্গে তো কথাই নাই। সাহিত্য-বিচারে আমাদের পক্ষেও এই শব্দটির প্রয়োগ যেমন অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, তেমনই এই কথাটির গূঢ় তাৎপর্য্য উত্তমরূপে ধারণা করিয়া না লইলে, যে বস্তুকে আধুনিক সাহিত্য বলা যায় তাহার সম্যক বিচার হইবে না। আমাদের আধুনিক সাহিত্য আধুনিক সমালোচনা-পদ্ধতির আমলে যতদিন না আসিতেছে ততদিন সাহিত্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্তি দূর হইবে না; এজন্য আমি এই ষ্টাইল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা করিব, এবং এ আলোচনায় আমি মুখ্যতঃ বিদেশী পণ্ডিতের সাহায্য লইব।

ষ্টাইল কথাটির কোনও বাংলা প্রতিশব্দ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিব না; ইংরেজী শব্দটিকে রক্ষা করিতে বিশেষ আপত্তি নাই তাহার কারণ ইতিমধ্যেই এই শব্দটি আমাদের শিক্ষিত সমাজে, যে অর্থেই হউক, সুপরিচিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই শব্দের দ্বারা যাহা বুঝায় তাহা আমাদের দেশীয় সমালোচনাশাস্ত্রে সম্পূর্ণ নূতন; আধুনিক সাহিত্যও যেমন একালের জিনিস—সেই সাহিত্যে বিশিষ্ট গুণও তেমনি একটি সম্পূর্ণ আধুনিক ধারণা; অতএব তাহার জন্য নূতন শব্দ গ্রহণ করিতে আপত্তি নাই—বিদেশাগত বহু নূতন বস্তু তাহাদের নাম-সহ আমাদের দেশে বসতি স্থাপন করিয়াছে। তথাপি সংস্কৃত ভাষার দৌলতে ইহারও একটা উপযুক্ত প্রতিশব্দ সৃষ্টি করা যাইতে পারে এবং করিলে আমাদের ভাষার শব্দসম্পদ বৃদ্ধি পাইবে। আমি উপস্থিত, নামের পরিবর্ত্তে বস্তুটির ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা হইতে একটি নাম পরে তৈয়ারী করিয়া লওয়া দুরূহ হইবে না—সে ভার আমি শব্দশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণের উপরে দেওয়াই সমীচীন মনে করি।

একটি সংস্কৃত শব্দ আলঙ্কারিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং তাহার অনুসরণে অনেকে ষ্টাইল অর্থে 'রীতি' শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু 'রীতি' শব্দটি বিশেষ করিয়া ভাষারই দোষগুণবাচক। রচনার ভাষাগত ভঙ্গিকেই রীতি বলা হইয়াছে। কিন্তু ষ্টাইল ভাষারই ভঙ্গিই নহে। আমাদের দেশে এখনও, সাহিত্যামোদী শিক্ষিত ব্যক্তি কাহারও লেখার প্রশংসা করিতে হইলে যাহা বলিয়া থাকেন, তাহা সাধারণতঃ এইরূপ—"অমুক লেখে বেশ! অমুকের ভাষাটি চমৎকার!" তাহা ছাড়া—বিদ্যাসাগরী ভাষা, বঙ্কিমী ভাষা—প্রভৃতি নানা ভাষার উল্লেখও আমরা করিয়া থাকি। এই সকলের মধ্যে ঐ রীতিগত ষ্টাইলের ধারণাই প্রচ্ছন্ন আছে; এবং এইরূপ স্থলে আমরা ভাষা বা রীতি না বলিয়া ইংরেজী ষ্টাইল কথাটিও ব্যবহার করি। কিছুকাল পূর্ব্বে—বঙ্কিমচন্দ্রের যুগেও—রচনার উৎকর্ষ প্রমাণ করিতে সেকালের সমালোচকেরা এই ভাষারই দোষ-গুণের উল্লেখ করিতেন; ষ্টাইল বলিতে যে-গুণ বুঝায়, তাহার ধারণাও যেমন ছিল না, তেমনই সাহিত্য-বিচারে ভাষাকেই সর্ব্বপ্রধান মনে করা হইত। একালেও এ ধারণা প্রবল আছে; জনৈক সমালোচক বাংলা গদ্যের উৎকর্ষ প্রদর্শনকালে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরের রচনা তুলনা করিয়া, যে আদর্শে বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই মনে হয়, সাহিত্য-বিচারে ষ্টাইলকে তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছেন; অগ্রাহ্য করিবার কারণও এই মনে হয় যে, ভাষার দোষ-গুণের ঊর্দ্ধে যে বিশিষ্ট গুণ রচনার সর্ব্বস্ব, সেই গুণ সম্বন্ধে লেখকের কোনও ধারণা নাই। এইজন্য এই সকল সমালোচকেরা রচনার ভাষার বিশুদ্ধি ও পারিপাট্যবিচারেই ব্যাপৃত থাকেন।

কিন্তু ভাষার সম্বন্ধে এইরূপ অতিরিক্ত মনোযোগ সত্ত্বেও সেকালের সাহিত্য-রসিকের মনে ষ্টাইল জিনিসটার একটা ধারণা যে অজ্ঞাতসারেও বিদ্যমান ছিল, তাহা অনুমান করিতে পারি। তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী' সম্বন্ধে স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন—

> "তারাশঙ্করের ঝঙ্কার খুব। ঝঙ্কারে সুরতাল ডুবিয়া থাকে। শুনিতে মধুর, কাজে লাগে বড় কম। কাদম্বরী পাঠে মুগ্ধ হইতাম, বিস্মিত হইতাম—কিন্তু কখনও নিজের জিনিষ বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। কাদম্বরী চমক দিত কিন্তু প্রাণে লাগিত না।"

লেখকের অভিপ্রায় বোধ হয় এই—'কাদম্বরী'র ভাষার শব্দগত মাধুর্য্য বা ধ্বনিচাতুর্য্য কানে ভাল লাগিলেও চিত্ত স্পর্শ করে না,—কেন যে, তাহা তিনি

বুঝিতে পারেন নাই। ভাষার মধ্য দিয়াই, ভাষাকে অতিক্রম করিয়া, যে গুণ সাহিত্যকে সত্যকার সাহিত্য করিয়া তোলে, প্রাণকে স্পর্শ করে—সে গুণ 'কাদম্বরী'র নাই; তাহার কারণ উহার ভাষা খাঁটি নয়, কৃত্রিম; ব্যাকরণ, অভিধান, অলঙ্কার, বাক্যঝঙ্কার সবই উহাতে আছে, কিন্তু তথাপি উহার রচনা-রূপ খাঁটি নয়, তাই রসিকের রস-পিপাসা মিটাইতে পারে না। লেখক বোধ হয় ইহাই বলিতে চান, কিন্তু পাকের দোষ কোথায়, তাহা ধরিতে পারেন নাই—ভাষার এত গুণ সত্ত্বেও রচনা কেন মনোহারী হয় না, তাহাতে বিস্ময় বোধ করিয়াছেন, কিন্তু কারণ বুঝিতে পারেন নাই—কথাটা বলিয়াও বলিতে পারেন নাই। আবার, লেখক তাঁহার মনোমত উৎকৃষ্ট রচনার গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইরূপ—

> "কিন্তু অন্নদামঙ্গলের ছন্দ, ঈশ্বর গুপ্তের লহর, অক্ষয়কুমারের গাম্ভীর্য্য, বিদ্যাসাগরের প্রসাদগুণ তখন হইতেই প্রাণে বাজিত, প্রাণে লাগিত, প্রাণে বসিয়া যাইত।"

—প্রাণে বাজিত,—লাগিত,—বসিয়া যাইত,—ব্যাখ্যা করিবার কি প্রাণান্ত চেষ্টা! ছন্দ, লহর, গাম্ভীর্য্য ও প্রসাদগুণ—এক এক লেখকের এক এক বৈশিষ্ট্য; অথচ, ইহার প্রত্যেকটি এবং একাধিক বা সবগুলি যে-কোনও অপর লেখকের থাকিতে পারে; কারণ এই গুণগুলি লেখকের গুণ নয়, ভাষারই গুণ। ভাল লাগে না কেন, তাহাও যেমন লেখক ভাল করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই, ভাল লাগে যে কেন বুঝাইতে গিয়া তেমনই যে সকল গুণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আধুনিক সাহিত্য-বিচারে অতিশয় তুচ্ছ। আধুনিক কালেও সমালোচনার আদর্শ ইহা অপেক্ষা উন্নত হয় নাই, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি—সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে যে তত্ত্ব বা রহস্য রহিয়াছে তাহার সম্বন্ধে কোন ভাবনা নাই বলিলেই হয়। ষ্টাইলের তত্ত্বই সেই তত্ত্ব, আমি যথাসাধ্য তাহারই আলোচনা করিব।

প্রথমেই ইংরাজী ষ্টাইল শব্দটি সাহিত্যিক সমালোচনায় যতগুলি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাই দেখা যাক। এ সম্বন্ধে একজন বিশিষ্ট ইংরেজ সমালোচকের প্রবন্ধ হইতে আমি প্রমাণ সংগ্রহ করিব এবং মূলতঃ এই ষ্টাইলের বিচারণায় তাঁহারই অনুসরণ করিব।

ষ্টাইল শব্দটি তিনটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথম—ভাষায় ব্যক্তিবিশেষের বিচিত্র বাক্-ভঙ্গি। ইহাও আমাদের সেই 'রীতি' নহে।

রীতি যেমন হউক—সাধু বা প্রাকৃত, সমাসবহুল বা সমাসবর্জ্জিত—যেমনই হউক, এক এক লেখকের লেখায় যে—personal idiosyncrasy of expression, ভাষায় যে ব্যক্তিঘটিত লক্ষণ দ্বারা আমরা অনায়াসে লেখককে চিনিতে পারি—লেখার সেই ভঙ্গি-চিহ্নকে ষ্টাইল বলে। কিন্তু এই অর্থের ষ্টাইল কোনও লেখার উৎকর্ষ প্রমাণ করে না—মাত্র ব্যক্তিটিকে ধরাইয়া দেয়। কিন্তু ইহাতে যে ব্যক্তিত্বের চিহ্ন রহিয়াছে—ঐ ব্যক্তিত্বই যখন গভীরতরভাবে রচনায় প্রকাশ পায়, শুধুই ভাষার ভঙ্গিরূপে নয়—তখন আসল ষ্টাইলের কথা আসে, এবং ষ্টাইল সম্বন্ধে তাহারই বিস্তারিত আলোচনা পরে আবশ্যক হইবে।

দ্বিতীয় যে অর্থে ষ্টাইল কথাটি প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা এইরূপ উক্তির মধ্যে আছে, যথা—"লেখকের পাণ্ডিত্য আছে, ভাবচিন্তার ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু ষ্টাইল নাই।" অর্থাৎ তাঁহার রচনা সুসম্বদ্ধ সুপরিস্ফুট সুডৌল নহে; তিনি ভাল করিয়া গুছাইয়া সাজাইয়া আপনার বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এখানে ষ্টাইলের অর্থ—রচনানৈপুণ্য—"the power of lucid exposition of a sequence of ideas"। ষ্টাইলের এই অর্থকে একটু গভীর করিয়া দেখিলে কয়েকটি মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এই যে অর্থে ষ্টাইল শব্দটি ব্যবহার করা হয়, ইহাতে লেখকের মেধা বা মানস-শক্তি—চিন্তাবস্তুকে সুপরিস্ফুটভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি—বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা হয়। যে সকল রচনায় লেখকের মুখ্য অভিপ্রায় থাকে—the expression of intellectual ideas, সেখানে ষ্টাইলের পক্ষে ভাষার যে গুণ আবশ্যক, তাহা বাক্-ভঙ্গির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা অপরূপত্ব নয়; অতএব যাহাকে সৃষ্টিধর্ম্মী রচনা বা খাঁটি সাহিত্য বলা যায়—যেমন কাব্য উপন্যাস প্রভৃতি, তাহার ষ্টাইল এ ষ্টাইল নয়। এখানে লেখকের সাধনা হইবে বিষয়টিকে সুস্পষ্ট ভাষায় যুক্তিযুক্তভাবে প্রতিপন্ন করা। অতএব, এইরূপ রচনার সম্বন্ধেই ভাষার দোষ বা গুণ, দুর্বোধ্যতা বা প্রাঞ্জলতা প্রভৃতির কথা উঠিতে পারে: সে ভাষার আর কোনও উৎকর্ষ-লক্ষণ নাই। এইরূপ রচনার ভাষাই রীতিগত দোষগুণের আকর হইতে পারে, এবং ইহার যে ষ্টাইল, তাহা আভ্যাসিক বা শিক্ষণীয় হইতে পারে; অন্তত কতক পরিমাণে শিক্ষা করা যায়। ইহারই প্রয়োজনে, ভারতবর্ষে ও য়ুরোপে, প্রাচীনকাল হইতে আদর্শ ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা চলিয়া আসিয়াছে। ষ্টাইলের ভাল-মন্দ বিচার,

ভাষার বিশুদ্ধ মার্জ্জিত সুসংস্কৃত রূপ, ও রচনারীতির আদর্শ—এইরূপ রচনার পক্ষেই খাটে। কিন্তু কাব্য উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্যকর্ম্মের পক্ষে এরূপ আদর্শ যে খাটে না, তাহার কারণ, সে ক্ষেত্রে ভাষার ভাষাগত কোনও আদর্শ নাই; সেখানে চিন্তা নয়, ভাব; argument নয়, intuition, perception—ভাব, কল্পনা, অপরোক্ষ অনুভূতি বা আন্তর-দৃষ্টির অভিজ্ঞতাই রচনার বিষয়বস্তু; যদি সেই অনুভূতি বা দৃষ্টি অব্যর্থ হয়, ভাব-বস্তু সুকল্পিত বা লেখকের সম্যক আত্মগোচর হয়, তবে তাহার যে বাঙ্ময় প্রকাশ ঘটে, তাহার ষ্টাইল তাহারই, কোনও বহির্গত আদর্শ দিয়া তাহার বিচার চলে না। কারণ এ জাতীয় রচনা—is not concerned with ideas in the logical sense, এখানে ভাবই ভাষার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে—অর্থসমন্বিত হওয়া অপেক্ষা মূর্ত্তিধারণ করাই তাহার অধিকতর প্রয়োজন; এবং সেই ভাব এতই বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র, যে ভাষা তদনুরূপ বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র হইতে বাধ্য। সে ভাষা মানস ক্রিয়া বা মস্তিষ্ক-চালনার ভাষা নয় বলিয়া—তাহার গুণও প্রাঞ্জলতা নয়, দোষও দুর্ব্বোধ্যতা নয়; একেবারে কবির অন্তঃকরণ হইতে পাঠকের অন্তঃকরণে সেতু-নির্ম্মাণ করাই তাহার সার্থকতা; যে কোনও প্রকারে, শব্দ-অর্থের সাহায্যে, অশরীরী ভাবকে শরীরী করিয়া তুলিতে পারিলেই—সেই রূপকে পাঠকের চিত্তগোচর করাইতে পারিলেই—তাহার কাজ শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। রূপের সেই বৈশিষ্ট্যই তাহার সর্ব্বস্ব, তাই তাহার ভাষাও অসাধারণ, এবং ভাব ও ভাষার অভেদত্বই তাহার ষ্টাইল—ভাষাগত কোনও স্বতন্ত্র বস্তু নয়। কোনও কাব্য যদি সত্যকার সুকাব্য হয়, তবে তাহার সকল অঙ্গেই একটি বৈশিষ্ট্য জাজ্বল্যমান থাকিবে—সে কাব্যের সব-কিছু তাহারই মত, তাহার ষ্টাইল ভাল বা মন্দ নহে—"the novel or the poem has the excellence proper to it"। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' যদি কাব্য হইয়া থাকে, তবে তাহার ষ্টাইলও তাহারই মত—অর্থাৎ সার্থক হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস যদি সত্যকার কাব্য হইয়া থাকে, তবে তাহার ষ্টাইল ভাল নহে, এমন কথা হাস্যকর; কারণ, "the novel or the poem that is well conceived and badly written is a chimera"। অতএব, ষ্টাইলের এই যে দ্বিতীয় অর্থ, যাহা চিন্তাধর্ম্মী রচনার পক্ষে খাটে, সে অর্থে খাঁটি সৃষ্টিধর্ম্মী সাহিত্যের ষ্টাইল-বিচার চলে না।

এই ষ্টাইল কথাটি তৃতীয় এক অর্থে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, যেমন, যদি বলি—কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের রচনায় অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা, অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা, এবং হাস্যকর কল্পনা থাকিলেও, তাঁহার লেখায় ষ্টাইল আছে, তাহা হইলে ষ্টাইলের আর একটি অর্থ দাঁড়ায়। বাংলায় আমরা ইংরাজী ষ্টাইল শব্দটি এখনও এইরূপ অর্থে প্রয়োগ করিতে শিখি নাই; তথাপি ইংরেজী হইতেই এই অর্থটি গ্রহণ করিবার প্রয়োজন আছে—কারণ এই অর্থে ষ্টাইলের দৃষ্টান্ত সকল সাহিত্যেই সুলভ। আমরা পূর্ব্বে ষ্টাইলের দুই অর্থ পাইয়াছি—(১) লেখক ও রচনা, এক বা উভয়ের, অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য; এই অর্থে ষ্টাইলের গভীরতর লক্ষণ—ভাব ও শব্দার্থের ঐকান্তিক সারূপ্য। (২) মনঃপ্রধান রচনার সুস্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা। কিন্তু এই তৃতীয় অর্থে, ষ্টাইল ইহার কোনটাই নয়—কাব্য-সাহিত্যে অবশ্য দ্বিতীয়টির প্রয়োজন নাই, কিন্তু প্রথমটির যে লক্ষণ—বাক্যের সহিত ভাবের সুসামঞ্জস্য—তাহাও এখানে রচনার গুণ নহে; বরং ভাব এখানে এমনভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, যে, উপমাই হউক বা সহজ ভাষাই হউক, তাহা যেন ভাবের শব্দার্থসঙ্গত রূপ নয়—সে ভাষা ভাবকে তির্য্যকভাবে প্রকাশ করিয়াছে। এই অর্থে ষ্টাইল যে কি বস্তু তাহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও দেবেন্দ্রনাথের কবিতার এমন সকল পংক্তি হইতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে,—যথা—

> দাও দাও একটি চুম্বন—
> মিলনের উপকূলে, সাগর-সঙ্গমে
> দুর্জ্জয় বানের মুখে ভাসাইয়া দিব সুখে
> দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন।

এ ভাষা উপমার ভাষা বটে, তথাপি যে ভাবটি ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে সেই ভাবের তুলনায় এই উপমাও নিরুপমা। উপমা কবি-ভাষার একটা বড় উপাদান, এবং দেবেন্দ্রনাথের ভাষারও বৈশিষ্ট্যের একটা কারণ তাঁহার উপমাগুলি। তথাপি উদ্ধৃত উপমাটি যদি কেবল তাহাই হইত, তবে ইহাকে প্রথম অর্থের ষ্টাইল বলিতাম, অর্থাৎ "personal idiosyncrasy of expression"। কিন্তু এই উপমার ভঙ্গি ব্যক্তিগত ভঙ্গিকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে—অতি গভীর অনুভূতির আবেগ ব্যক্তিত্বের বন্ধন ভাঙিয়া ভাষাকে অপরূপ করিয়া তুলিয়াছে। সাধারণত উপমা যত যথাযথ হয়, ততই তাহা সার্থক;

উপমান ও উপমেয়, এই উভয়ের মধ্যে একটি সর্ব্বাঙ্গীণ সৌসাদৃশ্য থাকাই উচিত। এখানে ভাব উপমায় রূপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু যাহার সম্পর্কে এই উপমা তাহার সহিত ইহার রূপগত; এমন কি গুণগত সাদৃশ্যও নাই—অনুভূতির গভীর তল হইতে হঠাৎ কেমন করিয়া তাহার রূপ ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ সমালোচক এই জাতীয় ষ্টাইলের উদাহরণস্বরূপ Marlowe-র কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

See where Christ's blood streams in the firmament......

অথবা

Sweet Helen make me immortal with a kiss.

Her lips suck forth my soul : see where it flies.

ইহার কোনও ব্যাখ্যা না করিয়া তিনি কেবল বলিয়াছেন—"when we say Marlowe had style, we are referring to a quality which transcends all personal idiosyncrasy, yet needs—or seems to need—personal idiosyncrasy in order to be manifested. Style in this absolute sense is a complete fusion of the personal and the universal"। এই যে সর্ব্বগুণনিরপেক্ষ ষ্টাইল, ইহাতে লেখকের বিশিষ্ট ব্যক্তিগত ভঙ্গি থাকিলেও, এবং সেই ভঙ্গির দ্বারাই তাঁহাকে চিনিয়া লইতে পারিলেও, অনুভূতির গভীরতা ও ব্যাপকতার জন্য ইহা ব্যক্তি-সীমা পার হইয়া যায়—বাক্যবিশেষের মধ্যে নির্ব্বিশেষের ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠে। দেবেন্দ্রনাথের ওই পংক্তি কয়টির মধ্যেও সেই ষ্টাইল রহিয়াছে।

(২)

এতক্ষণে ষ্টাইল-প্রসঙ্গের একটা গোড়া-পত্তন হইল মাত্র; অতঃপর ষ্টাইলের নানা অর্থ ত্যাগ করিয়া উহার স্বরূপ সন্ধান করিবার জন্য বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

রচনার ভাষাগত যে লক্ষণকে লেখকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বলা হইয়া থাকে, তাহাই যদি ষ্টাইলের সর্ব্বস্ব হইত, তবে ষ্টাইল বলিতে বিশেষ কিছু বুঝাইত না। কারণ, এই ব্যক্তিত্ব লেখকের ভাষাতেও যেমন পরিস্ফুট, তেমনই তাহা মৌলিক ভাব-কল্পনার—ভিতরকার বস্তুটিরই—অনিবার্য্য ভঙ্গি। লেখার যে ঐশ্বর্য্য

ষ্টাইল-রূপে প্রতিভাত হয়, তাহা কেবল ভাষার ভঙ্গি-বৈচিত্র্যই নয়। অনেক সময়ে ভাষার এইরূপ ভঙ্গি ভিতরকার দৈন্য ঢাকিবার একটা কৃত্রিম কৌশলমাত্র হইতে পারে; অনেকে ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের ভাষাকে এমন একটি ভঙ্গিমা দিবার চেষ্টা করে যাহাতে পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এবং রচনার শেষে নাম-স্বাক্ষরের মত, রচনার ভাষাতেই আপনাকে জাহির করিবার সুবিধা হয়; ষ্টাইল এই ধরণের ব্যক্তিত্ব-প্রচারের কৌশল নহে, কেবল লেখককে চিনাইয়া দিবার মত কোনও লক্ষণ ভাষায় থাকিলেই তাহা ষ্টাইল পদবাচ্য নয়—একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

তথাপি ষ্টাইল-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে এই ভাষার ব্যক্তিগত ভঙ্গি হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে; কারণ ষ্টাইল যাহাই হউক, এবং সেই ব্যক্তিত্ব যতই গভীর হউক, ষ্টাইলের আদি ও চরম পরিচয়—ভাষায়। ব্যক্তিগত বাক্-ভঙ্গি ষ্টাইলের সহিত নিত্যসংযুক্ত—এই লক্ষণ লেখকের প্রতিভার শক্তিভেদে উৎকৃষ্ট বা অনুৎকৃষ্ট ষ্টাইলের সূচনা করে। সাধারণত আমরা যখন বলি, ইহা বিদ্যাসাগরী ভাষা, বা ইহা বঙ্কিমী ভাষা, তখন তাহা ভাষারই সম্পর্কে হইলেও—একরূপ ষ্টাইলের ইঙ্গিতও তাহাতে আছে। সেই দুই ভাষাতে লেখকের ব্যক্তিত্ব-চিহ্ন আছে; যদিও একটু পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে, বিদ্যাসাগরের ষ্টাইল যতটা ভাষাগত, বঙ্কিমের তাহা নহে—আসল ভাবগত ব্যক্তিত্বের পরিচয়, বা সত্যকার ষ্টাইলের লক্ষণ, বঙ্কিমের রচনাতেই অধিকতর পরিস্ফুট। তথাপি আমি এখানে ভাষার সম্পর্কেই ষ্টাইলের গুণ বিচার করিতেছি—মনে রাখিতে হইবে, ইহাও বাহ্য। বিদ্যাসাগরের ভাষায় এই বাহ্য লক্ষণ যত প্রকট, বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত রচনায় তত নহে। তথাপি বিদ্যাসাগরের ভাষায় সত্যকার ব্যক্তি-ভঙ্গিও আছে। তাহার কারণ, বঙ্কিমের মত তাঁহার রচনাগুলিতে একটি মৌলিক ভাবদৃষ্টির প্রকাশ-চেষ্টা না থাকিলেও, বাংলা গদ্যের যে ছাঁদটি তিনি ধরিতে পারিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার নিজেরই ভাষা-বোধ ও রুচির অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। তাঁহার বাক্-পদ্ধতিতে—শব্দের চয়ন ও গ্রন্থনে—একটা ব্যক্তি-মানসের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে; শুধু তাহাই নয়, কতকগুলি বিশেষ শব্দ ও প্রয়োগরীতির প্রতি তাঁহার পক্ষপাত আছে দেখা যায়। এইজন্য তাঁহার রচনা পড়িলেই চেনা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেও এই ভাষাগত ভঙ্গি তো থাকিবারই কথা: কিন্তু তাহার বৈশিষ্ট্য কেবল বাক্যযোজনপদ্ধতির

নয়—এত সহজে তাহাকে. চিনিয়া লওয়া যায় না; কারণ, সে ভাষায় একটা অতি মৌলিক মানস উপাদান বা ভাব-ভঙ্গি আছে—ইহাই ভাষাকেও অতিক্রম করিয়া পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করে; পড়িবার সময় ভাষাই আমাদিগকে মুগ্ধ করে বটে, কিন্তু খুব প্রকট চাক্ষুষভাবে নহে; ভাষার অন্তরালে যে ব্যক্তি রহিয়াছে—যে অনন্য-সাধারণ Personality বা চিৎ সত্তা রহিয়াছে—তাহাই আমাদিগকে সমধিক পাইয়া বসে। আমি এই দুইজনের রচনা হইতে দুইটি নিদর্শন উদ্ধৃত করিতেছি—এমন দুইটি স্থান নির্ব্বাচন করিলাম, যাহাতে উভয়ের ভাষার স্বাতন্ত্র্য সহজেই লক্ষ্যগোচর হইবে, এবং সেই সঙ্গে, ভাষার ভঙ্গি ও ষ্টাইল, এই দুই বস্তুর পার্থক্যের একটা স্থূল ধারণাও হইবে।

বিদ্যাসাগর—রাম পম্পাশব্দ শ্রবণগোচর করিয়া সীতাকে বলিলেন, প্রিয়ে! পম্পা পরম রমণীয় সরোবর, আমি তোমার অন্বেষণ করিতে করিতে পম্পাতীরে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম প্রফুল্ল কমলসকল মন্দ মারুত দ্বারা ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া সরোবরের নিরতিশয় শোভা সম্পাদন করিতেছে; উহাদের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া রহিয়াছে; মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া গুন গুন স্বরে গান করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে; হংস সারস প্রভৃতি বহুবিধ বারিবিহঙ্গগণ মনের আনন্দে নির্ম্মল সলিলে কেলি করিতেছে। তৎকালে আমার নয়নযুগল হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বিনির্গত হইতেছিল; সুতরাং সরোবরের শোভার সম্যক্ অনুভব করিতে পারি নাই; এক ধারা নির্গত ও অপর ধারা উদ্গত হইবার মধ্যে মুহূর্ত্তমাত্র নয়নের যে অবকাশ পাইয়াছিলাম, তাহাতেই কেবল এক এক বার অস্পষ্ট অবলোকন করিয়াছিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্র—রজনী ঘোর তমোময়ী, তাহাতে সেই অরণ্য অতি বিস্তৃত। একে জনশূন্য, অতিশয় নিবিড়, বৃক্ষলতা-দুর্ভেদ্য বন্য পশুরও গমনাগমনে বিরোধী—বিশাল, জনশূন্য, অন্ধকার, দুর্ভেদ্য, নীরব। রবের মধ্যে দূরে ব্যাঘ্রের হুঙ্কার, অথবা বন্য শ্বাপদের ক্ষুধা, ভীতি বা আস্ফালনের বিকট শব্দ। কদাচিৎ কোন বৃহৎ পক্ষীর পক্ষকম্পন, কদাচিৎ তাড়িত এবং তাড়নাকারী বধ্য ও বধকারী পশুদিগের দ্রুতগমন শব্দ। সেই বিজন অন্ধকারে, ভগ্ন অট্টালিকার উপর বসিয়া একা ভবানন্দ। তাহার পক্ষে যেন পৃথিবী নাই, অথবা কেবল ভয়ের উপাদানময়ী হইয়া আছে। সেই সময়ে ভবানন্দ কপালে হাত দিয়া ভাবিতেছিলেন; স্পন্দ নাই, নিশ্বাস নাই, ভয় নাই। অতি প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। মনে মনে ভাবিতেছিলেন, যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্য হইবে। আমি ভাগীরথীজলতরঙ্গসমীপে ক্ষুদ্র গজের মত ইন্দ্রিয়স্রোতে ভাসিয়া গেলাম—ইহাই আমার দুঃখ।

কেবলমাত্র ভাষাহিসাবে বিচার করিয়া দেখিলে বিদ্যাসাগরের ভাষা—সরল, শুদ্ধ, মসৃণ, অতিশয় বিশদ ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা—যে উপাদানে গঠিত, সেই বাক্ বা শব্দ ভাণ্ডার—বিদ্যাসাগরের সমগোত্রীয়,

কিন্তু রীতি সেইরূপ বিশুদ্ধ ও মসৃন নহে। শব্দযোজনায় উভয়ের রুচি এক নয়; তাহার কারণ, উভয়ের প্রয়োজন ভিন্ন। বিদ্যাসাগরের প্রয়োজন ছিল সম্পূর্ণ বহির্গত বা objective; তাঁহার রচনায় কোনও মৌলিক কল্পনা বা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি—এক কথায়, কোনরূপ প্রবল ও গভীর আত্মভাব-প্রকাশের, অথবা একটা কিছু নূতন-সৃষ্টির অভিপ্রায় নাই। যে অতিশয় সুপ্রচলিত ও সহজ সাহিত্যের রীতি ও রচনার আদর্শ তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে পাইয়াছিলেন —বাংলা গদ্যনির্ম্মাণের প্রয়োজন তাহাতেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল; সেই পূর্ব্বসৃষ্ট সাহিত্যকে আদর্শ করিয়া তাহার রচনারীতি এবং কাব্যভাব পর্য্যন্ত তিনি যে ভাবে বাংলা গদ্যের সেই অতিশয় অপরিপুষ্ট দেহে যোজনা করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব; কেবলমাত্র ভাষার বিশুদ্ধি ও সৌন্দর্য্য, সাবলীল গতি ও স্বচ্ছন্দ শব্দার্থ, ইহাই ছিল তাঁহার সাহিত্যিক সাধনা। রামমোহন রায় প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তীগণের নিষ্ফল প্রয়াসের সহিত তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, তিনি সে সাধনায় কতখানি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; তিনি ভাষাকে অসাহিত্যিকের কৃচ্ছ্র-সাধনা হইতে উদ্ধার করিয়া বাংলা গদ্যসাহিত্যের পথ মুক্ত করিয়াছিলেন—তাঁহার ষ্টাইল সাহিত্যের ষ্টাইল নয়, ভাষার ষ্টাইল। এই ভাষার ষ্টাইল অতঃপর বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ষ্টাইলে উন্নীত হইল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভায়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেই আমরা সর্ব্বপ্রথম অতি উৎকৃষ্ট ষ্টাইলের দেখা পাইলাম। অতএব ভাষাহিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসারের অনুবর্ত্তী, তাঁহার নিকটে ঋণী বটে; কিন্তু সেই ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বই সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছে—এ জন্য ভাষা একটি ষ্টাইল-রূপ ধারণ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বাহ্য ব্যক্তি-ভঙ্গি যেমনই থাকুক, তাহা ঐ ব্যক্তিভাব বা ব্যক্তি-সত্তার সহিত এমনই দৃঢ়সংপৃক্ত যে, সেই ভঙ্গিকে ভাষা হইতে পৃথক করিয়া রচনামাত্রের আদর্শরূপে নির্দ্দেশ করা যায় না। বিদ্যাসাগরের ভাষায় সে ব্যক্তিত্ব নাই, তাই তাঁহার ভাষা এক পক্ষে বড় উপকারী হইয়াছে—বাংলা গদ্যের আদ্যরীতিরূপে বহু লেখকের উপজীব্য হইয়াছে। এইজন্যই 'বিদ্যাসাগরী ভাষা' কথাটার যে অর্থ হয়, 'বঙ্কিমী ভাষা' কথাটির ঠিক সেই অর্থ হয় না; বিদ্যাসাগরের ভাষা একটি অনুকরণযোগ্য আদর্শ, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা সে হিসাবে কার্য্যকরী নহে—সে ভাষা একটা রীতিমাত্র নহে বলিয়া তাহার অনুকরণ অসম্ভব।

উপরি-উদ্ধৃত উদাহরণ দুইটিই বর্ণনামূলক। বিদ্যাসাগরের রচনায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টির লক্ষণ নাই; উহা আমাদের চিত্তে কোনও অভিনব অনুভূতি বা ভাবের একটি অতিশয় নূতন, অসাধারণ, অপূর্ব্বকল্পিত রূপের প্রতিষ্ঠা করে না—এক কথায়, উহা particular নয়, উহা সাধারণ। তাহার কারণ, লেখক যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতা বা আত্মভাবদৃষ্টির ফল নহে—উহার মধ্যে ব্যক্তি-চৈতন্যের সেই নিবিড় স্পর্শ নাই, ভাব-কল্পনার সেই রহস্যময় বিদ্যুৎচমক নাই—সকল সৃষ্টিধর্ম্মী সাহিত্যের যাহা বিশিষ্ট লক্ষণ। বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-সাধনায় সে প্রেরণা বা উদ্দেশ্য ছিল না—তাঁহার প্রতিভা বা শক্তি সে স্তরের নহে। অতএব বিদ্যাসাগরের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনা করাই অসঙ্গত, আমি কেবল অলোচনার সৌকর্য্যার্থে এই তুলনা করিয়াছি। আমার প্রতিপাদ্য ইহাই যে, যে লেখার মূলে বস্তুর সহিত ব্যক্তির যথার্থ সাক্ষাৎকার-জনিত প্রেরণা নাই, তাহাতে ভাষার রীতি-সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে, ষ্টাইল থাকিতে পারে না—অন্ততঃ যে ষ্টাইলের সন্ধান আমরা এক্ষণে করিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা হইতে যে দৃষ্টান্ত দিয়াছি, তাহার মূলে আছে স্থানকালপাত্রগত একটি বিশিষ্ট ভাবের প্রেরণা; সে ভাব লেখকের কল্পনাবলে তাঁহারই মানসে এমনই একটা প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা অনন্যসদৃশ্য, অসাধারণ; এজন্য সেই ভাব আপনাকে যথাযথ প্রকাশ করিবার জন্য—আপন রূপায়তন দেহ ধারণ করিবার জন্য—প্রতি ছত্রে প্রতি কথায়, বর্ণনার প্রত্যেক উপকরণকে আশ্রয় করিয়া এবং ভাষাকে যেন নিজ দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া যুগপৎ এমন ধ্বনিময় ও অর্থানুভূতিময় হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে যে শব্দ বা বাক্য সংযোজিত হইয়াছে—যে উপমা, পুনরুক্তি, বাগ্‌বাহুল্য, এমন কি, বাক্যের অমসৃণতা পর্য্যন্ত এই ভাষায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার একমাত্র লক্ষ্য সেই ভাবকে যথাযথ রূপ দেওয়া—ভাষার বিশুদ্ধতা বা রীতি-সৌষ্ঠবেরও উপরে স্থান পাইয়াছে ভাবের স্বচ্ছন্দ ও সুসঙ্গত প্রকাশ। এ পংক্তিগুলিতে কবি স্থানকালোদ্দিষ্ট একটি বিশিষ্ট মানবহৃদয়ের নির্জ্জন নিশীথান্ধকার ভাষায় সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন, তাহার মূলে আছে একটি ব্যক্তির একাগ্র ও অনন্য-সুলভ ভাবদৃষ্টি। এজন্য এই রচনার যে ষ্টাইল, তাহাকে কোনও একপ্রকার বাক্যরীতি-রূপে রচনা হইতে পৃথক করিয়া ধারণা করা যায় না। অথচ ইহাও ঠিক যে, লেখকের এই ভাবদৃষ্টি একটি বিশিষ্ট বাক্‌ভঙ্গিকে আশ্রয় করিয়া

আছে। অতএব ষ্টাইল অর্থে যে ব্যক্তিগত বাক্‌ভঙ্গি বা 'Idiosyncrasy of expression'-ও বুঝায় তাহা এখানে কেবল ভাষাতেই প্রকট নহে—ভাবে ও ভাষায় মিলিয়া তাহা এমন হইয়া আছে যে, দুয়েরই অন্তর্গত সে যেন একটা তৃতীয় বস্তু, এবং ইহাকেই নির্দ্দেশ বরিয়া বলা যাইতে পারে—"Style is the man himself"।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্যক্তিগত বাক্‌-ভঙ্গিকে এক অর্থে ষ্টাইল বলা গেলেও—যেমন, বিদ্যাসাগরী বা বঙ্কিমী ভাষা, কোনও রচনার উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক লক্ষণ কেবল তাহাই নহে; বরং তাহাকে 'এহ বাহ্য' বলিয়া আরও ভিতরে আসল ষ্টাইলের সন্ধান করিতে হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, ভাষাগত বৈশিষ্ট্য দুই কারণে হইয়া থাকে; এক—ভাবাকে লইয়া কলা-কৌশলের অভিলাষ; সেখানে প্রয়োজনটা সম্পূর্ণ বহির্গত। দুই—অতিশয় মৌলিক ব্যক্তিগত প্রেরণার বশে, লেখকের যাহা নিজস্ব অতএব অনন্যসাধারণ অনুভূতি তাহাকে বাক্যে যথাযথরূপে প্রকাশ করার প্রয়োজনে ভাষায় একটি অনুরূপ ভঙ্গি অনিবার্য্য হইয়া উঠে। প্রথমটির সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক হইবে না—সাধারণ লেখকের ঐরূপই হইয়া থাকে, এবং অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত রীতি প্রভৃতি উহার সম্বন্ধেই খাটে। এই রীতি ও ষ্টাইলের প্রভেদ সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা পরে করিব। কিন্তু দ্বিতীয়টির ব্যাখ্যা ও বিচার সাহিত্য-সমালোচনার প্রায় সমগ্র ক্ষেত্রটি জুড়িয়া আছে—আমি অতঃপর যতদূর সম্ভব তাহারই কথা বলিব।

(৩)

যে রচনা সৃষ্টিধর্ম্মী, অর্থাৎ যাহাকে আমরা খাঁটি সাহিত্য বলি—যেমন, কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি, তাহার প্রধান লক্ষণ এই যে, তাহাতে ভাবকেই রূপ দেওয়া হয়। সেই রূপ আমাদিগকে আকৃষ্ট করে এইজন্য যে, তাহা অতিশয় স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট, অনন্যসদৃশ; তাহা particular,—সামান্য বা একাকার নয়; তাহা তাহারই মত, তাহার তুলনা সে-ই। ভাবগত সৃষ্টির লক্ষণও তাহাই—কোনও দুইটি বস্তু একরূপ নহে, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র সত্তায় অন্যটি হইতে পৃথক। সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে—কবি ও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে—মূল প্রভেদ এই যে, একজন সর্ব্বত্র অসামান্যকে আবিষ্কার ও প্রকাশ করিতেছে, অপর জন সর্ব্বত্র

সামান্যের সন্ধান ও প্রতিষ্ঠা করিতেছে। বিজ্ঞান মানুষ-জাতির সামান্য ধর্ম্ম উদ্ধার করিয়া ফিজিয়লজি, সাইকলজি প্রভৃতি প্রণয়ন করিতেছে; কবি মানুষ-ব্যক্তির অসামান্যতায় মুগ্ধ হইয়া 'চরিত্র' সৃষ্টি করিতেছে,—ওখানে তত্ত্ব, এখানে রূপ। বিজ্ঞানের মতে মানুষের একই নাম—সর্ব্বনাম 'মানুষ'; কাব্যে মানুষের ঐরূপ সর্ব্বনাম নাই, সেখানে এক একজনের এক এক নাম—রাম, যুধিষ্ঠির, অ্যাকিলিস, হ্যাম্‌লেট। ইহার নাম—রূপ, ইহাকেই বলে—সৃষ্টি। এইজন্য একজন আধুনিক মহামনীষী বলিয়াছেন, যাহা সাহিত্যের সৃষ্টি, আর্টের সৃষ্টি—যে সকল রূপ কবি-মানসপ্রসূত, তাহাদের সম্বন্ধে Zoology-র শ্রেণী-বিভাগ চলে না। এই রূপ—কেবল চরিত্রসৃষ্টিতে নয়, যাহা কিছু সাহিত্যে রূপ-পরিগ্রহ করে, তাহাই—particular বা অনন্যসদৃশ, অসামান্য। কবি যদি কোনও সন্ধ্যার বর্ণনা করেন, সে সন্ধ্যার রূপ সত্য ও সার্থক হইতে হইলে তাহা সর্ব্ব-নামের সন্ধ্যা হইবে না, আর সকল সন্ধ্যা হইতে তাহা বিলক্ষণ ও স্বতন্ত্র হইবে; এবং হয় বলিয়াই তাহার রূপ লক্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক হয়; আমরা বলি, হাঁ, ইহা একটি সৃষ্টি বটে! রসতত্ত্বের কথা এখানে তুলিব না, নতুবা বলিতাম, এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের জন্যই তাহা রসিকের চিত্তে রসোদ্রেক করে—নির্ব্বিশেষ নয়, বিশেষের দ্বারাই রসোদ্রেক হয়; রসরূপে যাহা নির্ব্বিশেষ, সৃষ্টিরূপে তাহাই বিশেষ; এবং সাহিত্যের রসাস্বাদ বিশিষ্ট-রূপেরই রসাস্বাদ। এই প্রসঙ্গে আমি আমাদের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ কবির সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিতেছি—

আজ এই দিনের শেষে
সন্ধ্যা যে ঐ মাণিকখানি পরেছিল চিকণ-কালো কেশে,
গেঁথে নিলেম তারে
এই তো আমার বিনি-সুতার গোপন গলার হারে।

একটি কেবল করুণ পরশ রেখে গেল একটি কবির ভালে;
তোমার অনন্তমাঝে এমন সন্ধ্যা হয়নি কোনো কালে,
আর হবে না কভু।
এম্‌নি করেই প্রভু,
এক নিমিষের পত্রপুটে ভরি
চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি।

—এ কবিতায় রস-রহস্যের বা সৃষ্টিরহস্যের যে একটু সন্ধান মেলে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, যাহা চিরন্তন, যাহা দেশে ও কালে খণ্ডিত নয়

বলিয়া কেবল ভাবের মধ্যে উঁকি দেয়—রূপে ধরা দেয় না, তাহা কেমন করিয়া কবির দৃষ্টিতে অসামান্য হইয়া উঠে—

তোমার অনন্তমাঝে এমন সন্ধ্যা হয়নি কোনো কালে
আর হবে না কভু।

—এই অসামান্যের রসাবেশে, এই 'আর হবে না কভু'র বিস্ময়ানন্দে কবির পক্ষে রূপসৃষ্টি সম্ভব হয়।

কিন্তু রূপের এই অসামান্যতার কারণ কি? অতি সংক্ষেপে বলিতে গেলে প্রত্যেক অনুভূতিই ব্যক্তিগত বলিয়া অনন্যসদৃশ। আমি যাহা যেমন দেখি, তুমি তাহা ঠিক তেমন দেখ না, তাই প্রত্যেক দেখায় এক একটি বিশেষ রূপের জন্ম হয়। ইহার মধ্যে আরও গভীর কথা আছে। প্রথম, দেখিবার যে শক্তি দ্রষ্টার না থাকিলে কোন সত্যকার রূপ ধরা পড়ে না, তাহা সকলের নাই; তাহাকেই দিব্যদৃষ্টি বা কবি-প্রতিভা বলা যায়। সেই সাক্ষাৎকার যখন সম্পূর্ণভাবে হয়, তখন লেখকের মানসে তাহা যেমন স্পষ্ট, তেমনই নূতন অনুভূত হয়—ইহাই স্বাভাবিক; সে দেখা তেমন করিয়া আর কেহ দেখে নাই, এবং তাহাকে প্রকাশ করিতে হইলে রচনার রূপও অতিশয় নূতন ও অনন্যসদৃশ হইতে বাধ্য। যাহার সে দিব্যদৃষ্টি নাই, যাহার মানসে এইরূপ ঘটনা ঘটে নাই, তাহার দ্বারা কিছুই 'সৃষ্টি' হইতে পারে না; সেই জন্য তাহার বর্ণনা প্রাণহীন, মামুলী ও সাধারণ হইয়া থাকে। তাহার রচনার ভাষায় চাতুরী যতই থাকুক তাহাতে ষ্টাইল থাকিবে না। অতএব এই যে প্রকাশ-ভঙ্গিমা বা ভাবের ভাষা-রূপ, তাহা এমন একটি সৃষ্টি, যাহা লেখকের ব্যক্তিসত্তা বা আন্তর-দৃষ্টির সহিত অবিচ্ছেদ্য হইয়া আছে, লেখা হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া লওয়া যায় না; এই জন্য আসল Idiosyncrasy of style অনুকরণ করিবার নয়; তাহা যদি সম্ভব হইত, তবে একজনের ব্যক্তিত্ব অনায়াসে অপরের হইতে পারিত—চোখ-মুখ ভিন্ন, কিন্তু কণ্ঠস্বর এক হইতে পারিত।

এই যে ষ্টাইল, ইহা ভাষারই লক্ষণ বটে, এমন কি ভাষা হইতে ইহা যে অভিন্ন তাহা বলাই বাহুল্য; কারণ যাহা সাহিত্যের গুণ, তাহাকে ভাষা হইতে পৃথক করিবে কেমন করিয়া? ষ্টাইলকে যেমন ভাষা হইতে পৃথক করা যায় না, তেমনি ভাষাও ষ্টাইলের সমাবয়বী,—এ কথা বুঝিয়া লইবার পর যাহাকে

Psychology of Style বা সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্যক্তি ও নির্ব্যক্তির তত্ত্ব বলা হইয়া থাকে, তাহারই আলোচনা করিতে হইবে।

যাঁহারা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন লেখক, তাঁহাদের রচনার প্রেরণা কোনও চিন্তা নয়—পরন্তু একটি ভাব বা অনুভূতি, একথা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার উল্লেখ করিতে হইয়াছে। এই ভাব বা অনুভূতির কারণ—কোন-কিছুর সাক্ষাৎকার-জনিত একটা অতিশয় প্রবল চিত্ত-স্ফূর্ত্তি। সেই অনুভূতি একটা সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ-পরিণামী সংবাদের আকারে ধরিয়া দিবার নয়; কবিচিত্ত ও সেই ভাবোদ্দীপক বস্তু, এই দুইয়ের মিলন অতিশয় অপরোক্ষ—তাহাদের মধ্যে কোনরূপ চিন্তার মধ্যস্থতা নাই; কবির কাজ এই চিন্ময়কে বাঙ্ময় করিয়া তোলা—যাহা বাক্যের অগোচরে ধরা দিয়াছে তাহাকেই বাক্যের দ্বারা গোচর করা। অতএব কবির ভাষা বিজ্ঞান-দর্শনের ভাষা নয়—এই ভাবকে মূর্ত্তি দিতে হইলে, ব্যাখ্যা বা বিবৃতিই যথেষ্ট নয়; তাঁহার বাক্যযোজনা—ভাবেরই অঙ্গযোজনা, তাঁহার ভাষা ভাবেরই প্রত্যক্ষ প্রতিরূপ; তাহা expository নয় — creative; সেই বস্তুকে কেবল ব্যাখ্যা অথবা নির্দ্দেশ করা নয়, তাহাকে ঠিক যেমন তেমনি করিয়া দেখাইতে হয়—অপরেরও অনুভূতি-গোচর করিতে হয়। He is not really defining but compelling you to feel in a certain way, অতএব রচনাকালে কবির প্রধান সমস্যা—How shall he compel others to feel the particularity of his emotion? এই 'particularity of emotion' কথাটাই সবচেয়ে বড় কথা, এবং ষ্টাইলেরও প্রধান সার্থকতা এই precise communication—পরচিত্তে তাহার অতিশয় যথাযথ সংক্রামণ। Particularity-র কথা আগে বলিয়াছি; তাহার কারণও বলিয়াছি। বস্তু এক হইলেও ব্যক্তির দৃষ্টিতে তাহার যেটুকু অসামান্য তাহা যেমন particular, তেমনই তাহাই emotion-এরও কারণ। যেখানে এই particularity নাই সেখানে বুঝিতে হইবে, প্রেরণা নিষ্ফল হইয়াছে—তাহা দ্বারা যথার্থ সৃষ্টি সম্ভব নয়। ইহাই—psychology of style। কিন্তু ইহার সঙ্গে আর একটা বড় প্রশ্ন জড়িত হইয়া আছে। এই যে particularity বা দৃষ্টি ও সৃষ্টির বিশেষত্ব—ইহা কি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বাংশে ব্যক্তিগত বা personal?

ষ্টাইল personal না হইয়া পারে না, তাহা বুঝিলাম, কিন্তু সেই ষ্টাইলের

যে রচনা তাহা কি জীবন ও জগতের একটা অতিশয় সংকীর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, একদেশবদ্ধ রূপ? এ কথার উত্তরে বলা হইয়া থাকে, বিশুদ্ধ ষ্টাইল-তত্ত্বের দিক দিয়া আমরা ঐ ব্যক্তিতত্ত্বকেই বিশেষ মূল্য দিয়া থাকি বটে, এবং সকল সাহিত্যসৃষ্টির মূলে যে particularity আছে তাহার কারণ ঐ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা mode of experience বটে; কিন্তু উৎকৃষ্ট রসসৃষ্টির আর একটা রহস্য আছে, তাহা রহস্যই। কবির সেই দৃষ্টি যদি অসাধারণ দিব্যদৃষ্টি হয়, তবে তাহা জগৎ ও জীবনকে আপনার সেই অনুভূতিকেন্দ্রে এমন সমগ্র-ভাবে মণ্ডলায়িত করে যে, অতিশয় particular-এর ভিতর দিয়াই universal বা নির্ব্বিশেষের ব্যঞ্জনা সম্ভব হয়। যেখানে এইরূপ ঘটে, সেখানে ষ্টাইলের পরাকাষ্ঠা হয়; আমরা সাহিত্যসৃষ্টিতে সাধারণতঃ দুইটি প্রবৃত্তি লক্ষ্য করি— realistic ও romantic; একটিকে বস্তুনিষ্ঠ, অপরটিকে ভাবনিষ্ঠ বলা যায়। লেখকের দৃষ্টিকেও subjective ও objective—তন্ময় ও মন্ময় বলিয়া একটা ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, এবং তদনুসারে ষ্টাইল কথাটিও দুই বিভিন্ন অর্থের দ্যোতনা করে। কিন্তু—the highest style is that wherein the two current meanings of the word blend; it is a combination of the maximum of personality with the maximum of impersonality; এইরূপ যেখানেই হয়, সেখানে কাব্যের রূপ-বিশেষে—subjective বা objective যে কোনও ভাবের প্রকাশে—a perfect condensation of a whole universe of experience ঘটে; কয়েকটি ছত্রে বা শতখানেক শব্দে, কবির বিশ্বানুভূতি যেন কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠে—কাব্যের স্থানকালপাত্রগত বিশেষ ভাবটির মধ্যেই জীবন ও জগতের বৃহত্তম ও গূঢ়তম নিয়তি ক্ষণবিম্বিত হইয়া উঠে। এই যে ষ্টাইল, ইহার ব্যক্তিত্ব-গুণ যেমন অবিসংবাদিত, তেমনই ইহার ভাষারও কোন জাতি নাই—সেখানে precise communication যেন বাক্‌পদ্ধতির সকল ভঙ্গি অগ্রাহ্য করিয়া personal ও impersonal-এর মিলন-ভূমি হইয়া দাঁড়ায়; ইহাকেই বলে "complete projection of personal emotion into the created thing"—সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার পূর্ণ আত্ম-প্রবেশ। সেখানে ভাষার কোনও নির্দ্দেশযোগ্য লক্ষণ নাই—অতিশয় আলঙ্কারিক ভাষা, গুরু-গম্ভীর উদাত্ত বাক্‌বিভূতি হইতে অতিশয় সাধারণ গদ্যময় কথ্য ভাষার স্তরে, সে ষ্টাইলের

উঠিতে ও নামিতে বাধে না। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ শেক্‌স্‌পীয়ারের 'অ্যাণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা' নাটকের শেষ দৃশ্যে মৃত্যু-স্বয়ম্বরা ক্লিওপেট্রার উক্তি—ভাষা সেখানে কোথায় উঠিতেছে ও নামিতেছে!—

Give me my robe, put on my crown ; I have
Immortal longings in me. Now no more
The juice of Egypt's grape shall moist this lip.

ইহার কিছু পরেই—

The stroke of death is as a lover's pinch
Which hurts and is desired.
Dost thou not see my baby at my breast,
That sucks the nurse asleep ?

অথবা লীয়ারের সেই আর্ত্তনাদ—

Thou wilt come no more.
Never, never, never, never !
Pray you, undo this button.

—এখানে ভাষার রীতির তো কথাই নাই—ভাষা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; অসহ্য অরুন্তুদ বেদনার ভাষা নাই, তাই নির্ভাষাকেই কবি এখানে কাজে লাগাইয়াছেন; ইহাই ষ্টাইলের পরাকাষ্ঠা। ষ্টাইলের অনেক রূপ আছে বটে যাহা—individual mode of experience বা ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির ফল; কিন্তু তাহারও উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ভর করে—according as the mode of experience expressed is more or less significant and universal; অর্থাৎ সেই ষ্টাইল তত শ্রেষ্ঠ যাহা মানব-জীবন বা মানব-হৃদয়জগৎকে গভীর ও সমগ্রভাবে প্রতিফলিত করিবার যত অধিক উপযোগী। এইরূপ ষ্টাইলের সহিত আর কোনও প্রকার ষ্টাইলের তুলনাই হয় না। "This is the style that is the very pinnacle of the pyramid of art ......at once the supreme achievement and the vital principle of all that is enduring in literature, the surpassing virtue that makes for many of us some few dozen lines in Shakespeare the most splendid conquest of the human

mind." এখানে ইহার অনুবাদ দিলাম না; পরে ভাষার রীতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় ইহার মর্ম্ম আপনিই পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। Psychology of Style সম্বন্ধে ইহার অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন—এমনিই প্রসঙ্গের একটু বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি, কারণ ইহার সহিত কাব্যতত্ত্ব বা রসতত্ত্বের যোগ রহিয়াছে, আমার প্রসঙ্গ তত গভীর নহে। এক্ষণে, Problem of Style বা ষ্টাইলের মূল সমস্যা—আন্তর-অনুভূতিকে বাঙ্ময় করিয়া তোলার যে সমস্যা—সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

[৪]

পূর্ব্বে সাহিত্যের প্রধান ধর্ম্ম কি তাহা বলিয়াছি—ভাবকে ভাষায় রূপ দেওয়া, তাহাই ষ্টাইলের আসল সমস্যা। কারণ, যাহাকে রূপ দিতে হইবে তাহা লেখকের অত্যন্ত নিজস্ব দৃষ্টির ফল, অতএব তাহার ভাষাও লেখককে নিজেই প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে, শব্দ-যোজনা ও শব্দার্থ-ব্যঞ্জনায় সেই ভাবকে তাহার সম্পূর্ণ অনুরূপ মূর্ত্তি দিতে হইবে; ভাবও যেমন অভিনব ও মৌলিক, শব্দবিন্যাস ও বাক্‌পদ্ধতিতে সেইরূপ অভিনবত্ব অবশ্যম্ভাবী। আবার যাহাকে ভাষায় রূপ দিতে হইবে তাহা কোনরূপ চিন্তাবস্তু নয়—একটা ভাব বা ভাবাবস্থাকে এক চিত্ত হইতে অপর চিত্তে সংক্রামিত করাই সাহিত্যসৃষ্টি। এরূপ ভাবকে কোনও সুস্পষ্ট সুনির্দ্দিষ্ট অর্থবাচক শব্দে বাঁধিয়া দেওয়া যায় না, তাহা হইলে তাহা ভাব না হইয়া একটা অর্থ-সমন্বিত তত্ত্ব হইয়াই দাঁড়াইবে—কোনও একটা চিন্তার আকার ধারণ করিবে। সকল তত্ত্বই একটা নির্ব্বিশেষ সাধারণ কিছুকেই প্রকাশ করে, কিন্তু ভাব তাহার ঠিক বিপরীত, বিশেষত্ব বা particularity-ই উহার সর্ব্বস্ব। অতএব বাক্যের সেই নির্দ্দিষ্ট অর্থ-বন্ধন শিথিল করিয়া কোনও একটি অতিশয় বিশিষ্ট ভাবের ভাষা-রূপ নির্ম্মাণ করাই সাহিত্যের সমস্যা; তাহাই ষ্টাইলের সমস্যা। এই ভাষা যে কিরূপ হইবে তাহা বাহির হইতে নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়—এই সাহিত্যিক রচনার যে গুণকে ষ্টাইল বলে তাহা কোনও শাস্ত্রবিধির অধীন নহে। রচনার ষ্টাইল কি হইবে তাহা লেখকের আন্তর অনুভূতিই নির্ণয় করিয়া লয়, এবং যখন ভাষায় লেখকের সেই অনুভূতি আমাদেরও পূর্ণপ্রত্যক্ষ হইয়া উঠে, তখনই আমরা বুঝিতে পারি—এ রচনার ইহাই যথার্থ ভাষা, যথাযথ বাণী-রূপ। যখন তাহা বুঝি, তখন

আমরা সেই রচনার সমগ্র বাঙ্ময় রূপকে ভাবের সমগ্রতার সঙ্গেই মিলাইয়া দেখি—শব্দ বা বাক্যের কোনও পৃথক্ মূল্য স্বীকার করি না ; ভাবটিকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ যদি সুসমঞ্জস ও অঙ্গাঙ্গী হয়, তবেই তাহাদের চয়ন ও যোজনা সার্থক হইয়াছে মনে করি। যে ভাষায় সত্যকার ষ্টাইল আছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিয়া—সমগ্র ভাবরূপের কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া—তাহার শব্দগুলিকে ব্যাকরণ, অভিধান বা শব্দশাস্ত্রের কষ্টিপাথরে পৃথকভাবে যাচাই করিতে যাওয়া সাহিত্যনীতি-বিরুদ্ধ। লেখকের আন্তর-অনুভূতি যদি সুস্পষ্ট ও সুসম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে ভাষায় তাহার যে প্রকাশ—সেই ষ্টাইল অনবদ্য হইবেই। সাহিত্যের ভাষা ভাব-রূপের ভাষা, তাহা পাঠকের অপরোক্ষ অনুভূতি বা প্রত্যক্ষ অনুভূতির সহায় ; এজন্য সাধারণ শব্দসম্পদের সাহায্যেই সেই ভাষা নির্ম্মাণ করিবার—অর্থবাচক বাক্যকেই রূপসৃষ্টির উপাদান করিবার—কৌশল সম্বন্ধে, কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা করিব ; ইহাও বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার নয়, মুখ্যত কতকগুলি দৃষ্টান্ত পাঠকের দৃষ্টিগোচর করিব।

ভাষার উপাদান—কথাটা ঠিক হইল না ; কারণ, তাহা হইলে উপাদানগুলিকে পৃথক করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করা সম্ভব হইত ; অলঙ্কারশাস্ত্র তাহাই করিয়াছে, উহা এক রকম বৈয়াকরণ-বৃত্তি, সাহিত্য-বিচার নয়। এ কথা কখনও বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, ভাষা অংশত ও পূর্ণত সেই এক বস্তু—ষ্টাইল। অতএব এই ষ্টাইলের উপাদান বলিতে নানারূপ বাগবন্ধ বুঝিব বটে, কিন্তু কোনরূপ বাঁধা-বুলি বুঝিব না। যেহেতু, অপরোক্ষ অনুভূতিকে পরোক্ষ ভাষার উপাদানে মূর্ত্তি দেওয়াই ষ্টাইলের সমস্যা, অতএব সেই ভাষানির্ম্মাণে বাক্যগুলিকে যতদূর সম্ভব রূপাত্মক করিয়া ব্যবহার করিতে হয়—ভাবকে অবিকল যথাযথরূপে প্রকাশ করিবার জন্য ভাষাকে সাধারণ ধর্ম্ম হইতে একটা ভিন্নধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে হয় ; শুধু বস্তু-নির্দ্দেশ বা তথ্যবর্ণন নয়—কেবল বিবৃতি বা জ্ঞাপন মাত্র নয়—মূল বস্তুকে তাহা দ্বারা একেবারে চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিতে হয়, ভাবকে এক চিত্ত হইতে অপর চিত্তে সংক্রামিত করিতে হয়। এক্ষণে সেই উপায়গুলির কয়েকটি, দৃষ্টান্ত সহযোগে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

কবিচিত্তে ভাবের উদ্রেক নানা কারণে হয় ; তাহার মধ্যে বাহিরের বস্তু,

ঘটনা বা দৃশ্যই একটা অতি সাধারণ কারণ। ভাব যদি এইরূপ ইন্দ্রিয়ার্থ-ঘটিত হয়, তবে তাহার রূপসৃষ্টির জন্য সেই বস্তুকেই ভাবমণ্ডিত করিয়া ভাষায় তুলিয়া ধরা যায়। বস্তুর সঙ্গে ভাবের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধসূত্রেই বস্তুর সেই ভাব-রূপ ভাষায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। নিম্নোদ্ধৃত কবিতার লাইনগুলিতে কবি একটি চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে একটা দৃশ্যবস্তু কয়েকটি রেখামাত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে—যেন কোন চেষ্টা নাই, কেবল কয়েকটি বস্তু সাজাইয়াছেন মাত্র—

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁসে।

বাঁধের জলরেখা ঝলসে, যায় দেখা,
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।
চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি,
কে জানে কত শত নূতন দেশে।

কবির ভাবদৃষ্টি বাহিরের বস্তু-রূপের কয়েকটি এমন রেখা নির্ব্বাচন করিয়াছে, যাহাতে সেই দৃষ্টি আমাদের চক্ষেও লাগে; যেখানে ভাব আরও ঘন ও গাঢ় হইয়া বস্তুকে ঘেরিয়া থাকে, সেখানে এইরূপ চিত্রাঙ্কনে বস্তুর রূপ ভাষাতেও এমন ভাবমণ্ডিত হয় যে, সেখানে সেই বস্তু শুধুই বস্তু নয়, ভাবেরই যেন বিগ্রহ বা symbol হইয়া দাঁড়ায়—The object becomes at once the cause and symbol of the emotion : যেমন—

নামিছে নীরব ছায়া ঘন বন-শয়নে,
এদেশ লেগেছে ভাল নয়নে।
স্থির জলে নাহি সাড়া, পাতাগুলি গতিহারা,
পাখী যত ঘুমে সারা কাননে,—
শুধু এ সোনার সাঁঝে বিজনে পথের মাঝে
কলস কাঁদিয়া বাজে কাঁকনে।
এ দেশ লেগেছে ভাল নয়নে।

এখানে বস্তু অপেক্ষা ভাবের ব্যঞ্জনাই অধিক, এবং চিত্রগত দৃশ্যগুলি—ভাবের প্রতীক বা symbol রূপে গ্রথিত হইয়াছে।

ভাব যদি মূলে অশরীরী বা অবাস্তব হয়, অর্থাৎ তাহা যদি অন্তর হইতেই উদ্রিক্ত হয়, তবে তাহাকেও রূপ দিতে হইলে লেখকের মানস-ভাণ্ডারে প্রচুর ইন্দ্রিয়ার্থঘটিত রূপ-স্মৃতি সঞ্চিত থাকা আবশ্যক—তাহা হইতেই, অতি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য-সন্ধানে, ভাবের রূপ-রচনা করিতে হয়; সেখানে ভাষা রূপকাত্মক হইয়া উঠে, এবং কাব্য-সাহিত্যের প্রায় বারো-আনা এই রূপক, রূপক-খণ্ড, বা উপমার ভাষা আশ্রয় করিয়া থাকে। উপস্থিত এইরূপ ভাষার দুইটি মাত্র উদাহরণ দিলাম—

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ-রতন আশা করি,
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয় রে এবার ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে অমর হয়ে রব মরি'।

অথবা

জীবন আমার
এত ভালবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।
স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

রবীন্দ্রনাথের 'সোণার তরী', 'বালিকা-বধূ' প্রভৃতি বহু কবিতা পূর্ণ রূপকের দৃষ্টান্ত।

এই দ্বিতীয় ধরণের ভাবপ্রকাশরীতিই কাব্যের ভাষাকে কতকগুলি বিশেষ উপাদান-উপকরণের ভাষা করিয়া তুলিয়াছে—নানা উপমা, সাদৃশ্য-যোজনা ও চিত্রকল্পনা (imagery) ভাবপ্রকাশের উপায়স্বরূপ ভাষার অঙ্গীভূত হইয়াছে। Rhetoric বা অলঙ্কারশাস্ত্র এগুলিকে ভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার ভূষণরূপে গণ্য করিয়াছে, এবং ইহাদের নানা শ্রেণীবিভাগ ও প্রয়োগবিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে; অর্থাৎ ইহারা যে ভাষার অলঙ্কার নয়, ভাবেরই অব্যর্থ বাণী-রূপ—বিশিষ্ট ভাবের বিশিষ্ট ভাষা, তাহা না বুঝিয়া এগুলিকে লইয়া একটি শাস্ত্র খাড়া করিয়াছে—নানাবিধ অলঙ্কার-রচনার কলা-কৌশলই কবিত্বের প্রমাণ বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। বলা বাহুল্য, আমরা ষ্টাইল ঘটিত যে সমস্যার আলোচনা করিতেছি তাহাতে ভাষার এই সকল উপাদান কোনও

প্রকার অলঙ্কার নহে—ভাবপ্রকাশের যথাযথ উপায়মাত্র; ভাবের ভাষা-হিসাবেই তাহাদের যাহা কিছু মূল্য।

সাহিত্যসৃষ্টির—অর্থাৎ ভাবকে ভাষার রূপ দিবার ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। অশরীরী ভাবকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের ভাষায় অনুবাদ করিতে না পারিলে সাহিত্যসৃষ্টি অসম্ভব; কারণ—the whole of literature consists in the communication of emotion। আমরা যাহাকে কাব্যগত thought বা ভাবনা বলি, তাহাও "systematised emotion," অর্থাৎ নানা ভাবের সংযোগে উৎপন্ন একটি ভাব-পদ্ধতি বা ভাববন্ধ; এই ভাব মুখ্যত রূপধর্ম্মী—রূপাভিমুখী; কারণ ভাব অপরোক্ষ অনুভূতির ব্যাপার—চিন্তা-সম্পর্করহিত; এ জন্য ইহা ক্রমাগতই রূপ হইয়া উঠিতে চায়; রূপানুভূতিই প্রত্যক্ষ অনুভূতি; কবির ভাষায়—"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ, রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।" ভাব যত সরল ও একমুখী তাহার শব্দাবয়বও তেমনই ঋজু ও স্বল্প—গীতি-কবিতা তাহার দৃষ্টান্ত; একটি উপমা, একটি পদ বা একটি শ্লোকেও তাহা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। আবার এই ভাব যদি জটিল বহুব্যাপক হয়—ভাষাতে তাহা একটি জটিল বৃহৎ বহু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট শরীর ধারণ করে—the writer's emotions are systematised into a self consistent whole; ভাব তখন আপন প্রয়োজনমত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ আখ্যান, নাটকীয় রূপ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া লয়; সেই তাহার বাঙ্ময় দেহ; এবং ভাব ও দেহের—বিম্ব ও প্রতিবিম্বের মধ্যে যদি অংশত বা সমগ্রত কোনও অসামঞ্জস্য কোথাও না থাকে, তবে ভাষাগত যত কিছু উপাদানের সেই সামঞ্জস্যকেই খাঁটি ষ্টাইল বলিতে হইবে।

কিন্তু এই ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কাব্যদেহ-নির্ম্মাণকল্পে শব্দ বা বাক্যই আদি উপাদান; সেই শব্দ ও বাক্য মুখ্যত রূপাত্মক কেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমাদের মনে হইতে পারে, এমনভাবে বাক্যযোজনা নিশ্চয় অতিশয় দুরূহ ব্যাপার—ভাবকে রূপময়ী ভাষায় যথাযথ প্রকাশ করা কবির পক্ষে একটা কৃচ্ছ্রসাধন। কিন্তু আসলে, কবিশক্তির পরীক্ষা ভিতরেই হইয়াছে—ভাব যদি কবিচিত্তে সুস্পষ্ট ও সুসম্পূর্ণ হইয়া ধরা দেয়, তবে তাহার ভাষা সে আপনিই সৃষ্টি করিয়া লয়। যে ভাব এইরূপ রূপসম্পর্করহিত তাহা ঠিক ভাব নয়, তাহা একটা চিন্তাবস্তু, তাহাতে সৃষ্টিকামনা থাকে না। অতএব এই যে ভাবের

ভাষা-রূপ-সৃষ্টি, ইহা আমাদের আলোচনার পক্ষে একটি সমস্যা হইলেও, কবির পক্ষে তাহাই একপ্রকার শক্তির স্ফূর্ত্তি —একাধারে পরিশ্রম ও পুরস্কার। পূর্ব্বে বলিয়াছি, লেখকের মনোভাণ্ডারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ sensuous perceptions বা রূপরসাত্মক বস্তু-পরিচয় সঞ্চিত থাকা প্রয়োজন—সেই রূপখণ্ড গুলির দ্বারা লেখক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবানুভূতি ভাষায় প্রকাশ করিতে সমর্থ হন; কারণ এই রূপখণ্ডগুলিকেই বাক্যে কতক পরিমাণে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, —তাহা symbol বা সঙ্কেতের কাজ করে। এই সঙ্কেত যত সুপ্রযুক্ত হয়, ততই সেই অনুভূতি, যাহা মূলে রূপাতীত, তাহা পাঠকচিত্তে সংক্রামিত হয়। সাহিত্যসৃষ্টিতে ভাষা সর্ব্বত্রই অনুভূতি উদ্রেকের ভাষা হইবে, এবং অনুভূতি উদ্রেক করিতে হইলে রূপ-সঙ্কেতেই তাহা করা যায়; অতএব ভাষার উপাদান যে বাক্য বা শব্দবন্ধ তাহা, কোথাও খণ্ডভাবেই, কিন্তু সর্ব্বত্র সমগ্রভাবে, একটা রূপকেই প্রকাশ করিবে; প্রত্যেক শব্দই যে রূপাত্মক বা রূপের সাঙ্কেতিকতায় পূর্ণ হইবে এমন কোন কথা নাই—কিন্তু শব্দ চয়ন ও যোজনার ফলে ভাব যেন একটি অনুভূতি-গোচর-রূপ হইয়া উঠে; কারণ, "the essence of all style worthy the name is to visualise"। ইহারই প্রয়োজনে সাহিত্যের ভাষায়—শব্দের চয়ন, প্রয়োগ ও যোজনায়—কত অপ্রচলিত ও অতর্কিত ভঙ্গির আবির্ভাব হয়। বর্ণনার বর্ণগরিমা যে কারণে, বর্ণবিরলতাও সেই কারণে; অতিশয় সাড়ম্বর কল্পনার প্রয়োজন যে কারণে, অনাড়ম্বর বিবৃতিও সেই কারণে; উপমাবাহুল্যও যে কারণে, উপমাবর্জ্জনও সেই কারণে—কোনটাই অনাবশ্যক নয়। উপমার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; উপমায় রূপের দ্বারা গুণ নির্দ্দেশ হইয়া থাকে—কোনও একটি বিশেষ গুণকে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য সাদৃশ্য-সঙ্কেত করিতে হয়; অন্য উপায়ে তাহা অনুভূতিগোচর হইবে না, তাহা জ্ঞানগোচর হইবে মাত্র। সেই সাদৃশ্য-সঙ্কেত ভাষার অলঙ্কার নহে—ভাবের যথাযথ বাণীরূপ; ভাব তাহা দ্বারা সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হয় নাই, স্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভাষাকে রূপময়ী করিবার জন্য লেখক যে সব উপায় অবলম্বন করেন তাহার মধ্যে এই উপমাই প্রধান; ভাব যখন বস্তুকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ বস্তুর রূপ কল্পনায় বৃহত্তর হয়, তখনও উপমার সৃষ্টি হয়; এই উপমা বস্তুকে রূপান্তরিত করিয়া আমাদের চিত্ত চমকিত করে। কবি একটি পথের ছবি আঁকিতেছেন—

বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত্ত জিহ্বার মত ;

এখানে পথের ছবিকে অতিক্রম করিয়াছে কবিচিত্তের ভাব-রূপ ;—উপমাই এখানে সর্ব্বস্ব, এবং ভাব ঐ উপমারূপেই জন্মিয়াছে। কিন্তু যখন বস্তুর বস্তুগত সৌন্দর্য্যই লেখকের অনুভূতিতে একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে, অর্থাৎ ভাব যেখানে বস্তুপ্রীতিমূলক বা objective, সেখানে কোনও রূপক বা সাদৃশ্য-কল্পনার প্রয়োজন হয় না, যথা—

গ্রামপথে ধূলা,
সাপ গেছে পার হ'য়ে ;
কোথাও পাখীর নখের ভঙ্গি
চোখে পড়ে র'য়ে র'য়ে।

—এখানে এই রূপের উপাদান হইয়াছে কয়েকটি picturesque details —বস্তুর রূপের কয়েকটি প্রেক্ষণীয় লক্ষণ ভাষাকে চিত্রধর্ম্মী করিয়াছে। এই বস্তুপ্রীতিমূলক ভাব লেখকের মানস-প্রকৃতিভেদে সম্পূর্ণ objective না হইয়া খানিকটা আত্মভাবরঞ্জিত হইয়া উঠে। Objective ও subjective দৃষ্টির প্রভেদ এই যে, একটিতে কবি বস্তুর রূপেই মুগ্ধ ; অপরটিতে বস্তুর মধ্যে একটা ভাবসঙ্কেত-দর্শনে মুগ্ধ ; কিন্তু দুই দৃষ্টিই অনুভূতিসাপেক্ষ, নতুবা তাহাতে সাহিত্যসৃষ্টি হইত না। এইবার আমি কয়েকটি রূপসৃষ্টির উদাহরণ দিব, তাহাতে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যও যেমন প্রকাশ পাইবে, তেমনই ষ্টাইল বলিতে ভাষার যে গুণ বুঝায়, রচনায় তাহা সঞ্চার করিতে হইলে শব্দচয়ন ও ও বাক্যযোজনা কত রকমের হইতে পারে, তাহাও লক্ষ্য করা যাইবে। প্রথমেই যে দুইটি রচনা উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে ভাব ও বস্তু এই দুয়েরই অপূর্ব্ব মিলন ঘটিয়াছে—ভাষা কেবল চিত্রই আঁকে নাই, লেখকের অনুভূতি-মূলক কল্পনা সেই চিত্রকে একটি অবাস্তব রূপব্যঞ্জনা দান করিয়াছে।

একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি। ছমছমে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখীদের বাসায় ডানা ঝাড়িবার শব্দটুকুও নাই, কেবল বেড়াইবার পথের দুই ধারে ঘনছায়াবৃত ঝাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাঁপিতেছিল।—

সেখানে অন্ধকার আরও ঘনীভূত, যতটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে তারায় আচ্ছন্ন, তরুতলের ঝিল্লিধ্বনি যেন অনন্তগগনবক্ষচ্যুত নিস্তব্ধতার নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দের সরু পাড় বুনিয়া দিতেছে।—

এমন সময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল; তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলুদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথার উপরকার আকাশে আরোহণ করিল—শাদা পাথরের উপর শাদা শাড়ীপরা সেই শান্তশয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল।

বস্তুর রূপ ও রূপোদ্ভূত রসকল্পনায় এই বর্ণনাটি ভাষাগত রূপ-রসের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আমি একটি অনুরূপ চিত্র ইংরেজী হইতে উদ্ধৃত করিলাম, উভয়ের সাদৃশ্য ও বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিবার মত।

Sweet are the shy recesses of the woodland. The ray treads softly there. A film athwart the pathway quivers manyhued against purple shade fragrant with warm pines, deep mossbeds, feathery ferns. The little brown squirrel drops tail and leaps; the inmost bird is startled to a chance tuneless note. From silence into silence things move......

The tide of colour has ebbed from the upper sky. In the west the sea of sunken fire draws back, and the stars leap forth and tremble and retire from the advancing moon, who slips the silver train of cloud from her shoulders and with her foot upon the pine-tops, surveys heaven.

এই দুইটি চিত্রেরই রূপ, রং, রেখা কেবল নিখুঁত অনুচিত্রণ নয়—তাহারা যেন লেখকের রূপরসানুভূতির আবেগে স্পন্দিত হইতেছে; এই ভাবাবেগ-প্রবল দৃষ্টির বশে প্রাকৃতিক দৃশ্যবর্ণনায় রূপকের আমেজ লাগিয়াছে, জড় চিন্ময় হইয়া উঠিয়াছে। এখানে picturesque details তো আছেই, তাহা ছাড়া ভাবকল্পনার একটি সূক্ষ্ম মায়াজাল বাস্তবকে অবাস্তব-রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। ইংরেজী চিত্রখানিতে লেখকের বাস্তবনিষ্ঠা যেমন গভীর—ইংরেজী ভাষার সমৃদ্ধিবশত, শব্দচয়ন ও বাক্যযোজনাও তেমনি অতিশয় যথাযথ হইয়াছে; আমাদের ভাষার শক্তি এখনও এতদূর পৌঁছায় নাই। এখানে ভাবানুভূতি

যেমন সূক্ষ্ম—একদিকে যেমন "from silence into silence things move," তেমনই শেষের চন্দ্রোদয়-দৃশ্য একটি জীবন্ত চিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

এইরূপ রচনায় আমরা ভাষার যে ভঙ্গি দেখি তাহাতে বুঝিতে পারি যে, ভাবপ্রধান চিত্রের ভাষায় উপমা ও রূপক ষ্টাইলহিসাবেই সত্য ও সার্থক। আবার, যেখানে কোন ঘটনা বা দৃশ্যবস্তুকে পাঠকের চক্ষুগোচর করাই একমাত্র অভিপ্রায়, সেখানে ভাষার নৈপুণ্য অন্যরূপ—নিম্নোদ্ধৃত রচনাটি তাহার সাক্ষ্য দিবে।

ডাক্তার ডাকে চলিয়াছে। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তাহার উপরে আকাশে দুর্য্যোগ। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তার নুড়ি পাথরের কঠিন বন্ধুরতার উপর দিয়া গাড়িখানা মন্থর গতিতে চলিয়াছে।—দূরে যেন একটা জোনাকী অনির্ব্বাণ দীপ্তিতে জ্বলিতেছে, অত্যন্ত দ্রুতগতি সেটা এইদিকে আসিতেছে।—

হ্যাঁ, আলোই ওটা, বিন্দুর আকার হইতে ক্রমশঃ আকারে বড় মনে হইতেছে। আলোটা দ্রুতবেগে এই দিকেই আসিতেছে।

ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন—মৃদু ঘণ্টার শব্দ ডাক্তারের কানে আসিল। ডাক্তার হাঁকিল, কে? কে? কে আসছে?

উত্তর আসিল—ডাক। সরকার বাহাদুরের ডাক। ডাক-হরকরা আমি।—বলিতে বলিতে লোকটা নিকটে আসিয়া পড়িল। ঘণ্টাধ্বনি স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, লোকটির হাতের আলোতেই ডাক্তার দেখিল……

ডাক্তার প্রশ্ন করিল, কে রে দীনু?

সচল দীনু উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কতটা রাত্রি হ'ল বল দেখি, দীনু?

আজ্ঞে তা—রাত ভেঙ্গে এসেছে, তিন প্রহর গড়িয়ে এল আর। দীনুর কথার শেষ অংশের সাড়া আসিল গাড়ির পিছন দিক হইতে। মেল-রানার সমান বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে; ঘণ্টার শব্দ ক্রমশঃ মৃদুতর হইয়া আসিতেছিল, আলোর শিখাটা ক্রমশঃ আবার পরিধিতে হ্রাস পাইয়া বিন্দুতে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

এ রচনায় কোনও বিশেষ ভাবের আবেগ নাই, লেখক কেবল নিজের চোখের দৃষ্টি আমাদের চোখে পরাইয়া দিয়াছেন—একটি দৃশ্যকে বাক্যের সাহায্যে প্রেক্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছেন। এখানে যে শব্দচিত্র রচিত হইয়াছে তাহাতে শব্দের অতিরিক্ত কোনও ব্যঞ্জনার প্রয়োজন হয় নাই, কেবলমাত্র বাক্যযোজনার কৌশলেই রূপসৃষ্টি হইয়াছে।

সাহিত্যের ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া ভাবের যথাযথ বাণী-রূপ বা ষ্টাইল ও তাহার সমস্যার কথা আলোচনা করিতেছি; এইরূপ আলোচনায় কিন্তু একটা কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে—যে-রচনা একটি সাহিত্যিক সৃষ্টি তাহা একটি সমগ্র বস্তু, এবং ভাষায় তাহাকে মূর্ত্তি দিবার কালে বাক্-ভঙ্গি যত প্রকারই হউক—বাক্যযোজনা রূপাত্মক হউক বা নাই হউক, সকল সাহিত্য-সৃষ্টিই একপ্রকার রূপক। নাটক উপন্যাস হইতে ক্ষুদ্রতম রসাত্মক বাক্যটি পর্য্যন্ত—যদি উৎকৃষ্ট সাহিত্যগুণোপেত হয়—তবে তাহা আয়তনভেদে একটি জটিল বা সরল ভাবগ্রন্থির—অশরীরী ভাবকল্পনার—রূপক-রূপ। 'মেঘনাদবধ', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজা ও রাণী'-ও যেমন, তেমনই ক্ষুদ্রতম কবিতা ও গান মূলে একটি ভাবপ্রেরণা মাত্র—একটা অরূপ অনুভূতি, কবিপ্রাণের একটা আকুতি; তাহাকেই যথাযথ রূপ দিবার জন্য, বাহিরের বস্তু ঘটনা বা নানা খণ্ড রূপ-বস্তুকে আশ্রয় করিয়া, প্রয়োজনানুরূপ সংস্থানে সংস্থিত করিয়া, আমাদের পরিচিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার যে ভাষা সেই ভাষায় তাহাকে প্রকাশ করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ রচনা খণ্ড খণ্ড ভাবে ও সমগ্রভাবে এই রূপকে গড়িয়া তোলে—আমরা তাহা হইতে যে বস্তুর অনুভূতি লাভ করি তাহা এই রূপকেরই রূপসঙ্কেত-নিহিত ভাব। ভাষায় তাহার সমগ্রতা নানা খণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে বিভক্ত ও বিস্তৃত না হইয়া পারে না—যাহা মূলে ছিল দেশকালহীন, সৃষ্টিতে তাহাই দেশ-কালে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

এ পর্য্যন্ত আমি শব্দ ও বাক্যগত ষ্টাইল-সমস্যার আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে ভাষাকে রূপাত্মক করিবার নানা উপায় ও উপকরণের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু সেগুলি ছাড়াও আর একটি উপাদান ষ্টাইলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে—তাহা বাক্যের ধ্বনিগুণ। শব্দমাত্রেই ধ্বন্যাত্মক, আমি সেই ধ্বনিমাত্রের কথা বলিতেছি না; ঐ ধ্বনি হইতে যে নানা বাক্যচ্ছন্দের সৃষ্টি হয় এবং সেই ছন্দ অলক্ষ্যে ভাবকে রূপ দিবার যে সহায়তা করে আমি তাহার কথাই বলিতেছি। ইহা গদ্যচ্ছন্দ বা পদ্যচ্ছন্দও নয়, কারণ তাহাদের একটা সাধারণত্ব আছে; ইহা প্রত্যেক রচনার নিজস্ব ষ্টাইলগত বিশিষ্ট ধ্বনিরূপ। পদ্য ও গদ্যের কথা পরে বলিব। এই ধ্বনি কেবল আবেগমূলক নয়—শব্দযোজনায় যেমন ভাব রূপ পায়, এই ধ্বনিও তেমনই ভাবের সেই রূপের অনুযায়ী; ভাষার অন্য গুণের সঙ্গে একযোগে এই ধ্বনিগুণও ভাবানুভূতিকে

রূপ দান করে, এজন্য ইহা ষ্টাইলের অন্তর্গত বলিয়াছি। প্রত্যেক সাহিত্যিক রচনার একটা বিশিষ্ট ধ্বনিগুণ আছে। এই বস্তুকে ষ্টাইলের অঙ্গ বলিবার কারণ এই যে, ইহা বাহির হইতে আমদানি করা একটা অলঙ্কার নয়। আমি বঙ্কিমচন্দ্রের যে লাইনগুলি ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার সহিত নিম্নোদ্ধৃত রচনাটির ধ্বনিগুণ তুলনা করা যাইতে পারে; সেখানে যে ধ্বনিগাম্ভীর্য্য ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা ঐ বর্ণনার একটি বিশিষ্ট উপাদান এবং ভাবকে ভাষায় রূপ দিবার সহায়তা করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার যে একটা বিশিষ্ট ধ্বনিপ্রকৃতি আছে, ঐ রচনায় তাহা আরও বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—ভাবানুরূপ বাক্য যোজনায়। সেই ধ্বনি কিন্তু রূপাত্মক নয়, ভাবাত্মক। নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্তটির মধ্যে ধ্বনি কিন্তু শুধুই ভাবাত্মক নয়, রূপাত্মকও বটে—দৃশ্যটিকে দেখিবার পক্ষে সহায়তা করিতেছে।

সঙ্গীত আরম্ভ হইয়াছে। রায় চোখ মুদিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। গানের দীর্ঘ-মন্থর গতির সমতায় বিশাল দেহ তাঁহার ঈষৎ দুলিতেছে। থাকিতে থাকিতে তাঁহার বাম হাতখানি উদ্যত হইয়া পাশের তাকিয়াটির উপর একটি মৃদু আঘাত করিল। ঠিক ঐ সঙ্গে তবলচীর চর্ম্মবাদ্য ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। রায় চোখ মেলিলেন, বাইজীর পায়ের ঘুঙুর মৃদু সাড়া দিয়াছে। নৃত্য আরম্ভ হইল। কলাপীর নৃত্য। আকাশে মেঘ দেখিয়া উতলা কলাপীর নৃত্যভঙ্গি। গ্রীবা ঈষৎ বাঁকিয়াছে, দুই হাতে পেশোয়াজের দুই প্রান্ত আবদ্ধ পেখমের মত তালে তালে নাচিতেছে। চরণে ঘুঙুর বাজিয়া উঠিল।

এখানে বাক্যধ্বনি বাক্যের রূপ-চিত্রকে আরও পরিস্ফুট করিয়াছে—বাক্যগুলি নৃত্যসঙ্গীতের অনুসরণ করিয়া আপনা হইতেই যতি-তালে বিভক্ত হইয়া সমগ্র রচনাটির মধ্যে একটা গতি-তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছে। তাহা না হইলে গানের মজলিস আমাদের চক্ষুগোচর হইয়া উঠিত না—এ রচনার ষ্টাইল অঙ্গহীন হইত।

ষ্টাইলের ভাষাঘটিত সমস্যার যেটুকু আলোচনা করিলাম, তাহা যথোপযুক্ত হইল না; কিন্তু ইহার অধিক আলোচনার স্থান এখানে নাই। এই আলোচনা যেমন জটিল, তেমনই বিস্তারযোগ্য। আমার উদ্দেশ্য—ভাষা ও ষ্টাইলের একাত্মতা-নির্দ্দেশ, এবং ভাষায় যে গুণ থাকিলে তাহা ষ্টাইল-পদবাচ্য হয় সে গুণ যে বাহির হইতে সংক্রামিত হয় না, ভিতরের প্রয়োজনে তাহার উদ্ভব হয় —ইহারই একটা ধারণা পরিস্ফুট করিয়া তোলা। উৎকৃষ্ট ষ্টাইল কোনও

একটি অঙ্গুলিনির্দ্দেশযোগ্য ভঙ্গি, বা ভাষার নানাবিধ শব্দ-প্রয়োগরীতি নয়। প্রত্যেক সাহিত্যস্রষ্টার কল্পনা ও ভাবদৃষ্টির আত্যন্তিক স্বাতন্ত্র্য হইতেই ষ্টাইলের জন্ম হয়। যাহারা সংবাদপত্রের ভাষায় সাহিত্য রচনা করে তাহারা সাহিত্য সৃষ্টি করে না; কারণ, তাহাদের আত্মানুভূতিও যেমন দুর্ব্বল, তেমনই তাহাদের অভিপ্রায়ও স্বতন্ত্র—তাহারা অতি-সাধারণ পাঠকগোষ্ঠির সাধারণ মানস-ক্ষুধার খাদ্য সরবরাহ করে। যাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যিক তাহাদের ভাষায় কোনও মৌলিক ষ্টাইল থাকে না বটে, কিন্তু তাহারা একটা বড় কাজ করে—তাহারা প্রতিভাবান সাহিত্যিকের নব-সৃষ্ট বাক্যগুলিকে আপনাদের ভাষায় ব্যবহার করিয়া সেগুলিকে যেমন জীবন্ত রাখে, তেমনই, ভাষার স্বাস্থ্য ও শক্তি রক্ষা করিয়া তাহার বিকৃতি নিবারণ করে। উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক প্রতিভার সবচেয়ে বড় দান—এই ভাষা; তাহার কারণ, এই ভাষার সাহায্যেই সহজ অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ আপনার প্রাণের অস্ফুট ভাবরাজিকে কতকটা স্ফুটতরভাবে অনুভব করিয়া চরিতার্থ হয়—কবি যেন মূককে মুখর করিয়া তোলেন। শব্দের এই যে যাদুশক্তি—ইহা শ্রেষ্ঠ কবিগণেরই আয়ত্ত। ভাব যত অনির্ব্বচনীয়, ভাষায় তাহাকে প্রকাশ করা ততই প্রতিভাসাপেক্ষ। যাহার মূলে ভাবের সেই গাঢ়তা, গভীরতা ও অনির্ব্বচনীয়তা নাই, তাহার ভাষারও তেমনই কোন বিশিষ্ট গৌরব নাই। এই জন্যই—

Poetry alone can tell her dreams ;
With the fine spell of words alone can save
Imagination from the sable chain
And dumb enchantment.

—"মানুষের মনের অসীম আকুতি (Imagination) যেন এক কঠিন কালো মায়াশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়া আছে; স্বপ্নকে ভাষায় ব্যক্ত করিবার শক্তি একমাত্র কাব্যেরই আছে; কাব্যই, শব্দের যাদুমন্ত্রে, বন্দী ভাবরাজির সেই মায়াশৃঙ্খল মোচন করিতে পারে।"

আমাদের কবিও বলেন—

না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে,
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে—
মাগিছে তেমনি সুর;

কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু ঘুচাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের কালে দু'চারিটি কথা
রেখে যাব সুমধুর।

অতএব ইহাও সত্য যে, এই যে শক্তি—ইহা ভাবকে ভাষার অধীন করিবার শক্তি নয়, ভাষাকেই ভাবের অধীন করিবার শক্তি;—"every work of enduring literature is not so much a triumph of language as a victory over language."

(৫)

ষ্টাইল ও ভাষার এই সম্বন্ধের কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবার পর সেই পুরাতন 'রীতি'-বাদের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার অবসর আসিয়াছে। রীতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ষ্টাইলের ঠিক বিপরীত—বাক্যরচনার একটা বহির্ভূত আদর্শকেই রীতি বলে। এই রীতি যে ষ্টাইল নয়, তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। শব্দের অর্থ, ধ্বনি ও প্রয়োগ-বিশুদ্ধি, এবং নানা অলঙ্কার প্রভৃতির কারণে ভাষার যে দোষগুণ-নির্দ্দেশ, এবং তাহা হইতে যে এক বা অধিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা হয়—তাহাতে প্রত্যেক রচনার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আর বিচারযোগ্য থাকে না। এই মধ্যযুগীয় পদ্ধতি এখনও আমাদের দেশে কাব্যবিচারে প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। সাহিত্যের ভাষা লইয়া যে আন্দোলন কিছুকাল যাবৎ চলিয়াছিল, এবং ভাষাকে একটা কোনও ভঙ্গিতে ভাঙ্গিয়া লইয়া তাহার একটা নূতন নামকরণ করিয়া ব্যক্তি ও সম্প্রদায়-বিশেষের যে কৃতিত্ব ঘোষণা হইয়াছিল, তাহার মূলে এইরূপ একটা রীতি-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ছিল। বাংলা ভাষার এই নূতন রীতির কথা পরে বলিব। ষ্টাইল ও রীতি যে কেন এক নয়, এবং সাহিত্য-সৃষ্টিতে রীতি-হিসাবে ভাষার কোনও মূল্য নাই কেন, এক্ষণে সে সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব। ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, খাঁটি সাহিত্য-রচনায় কবিকে আপন ভাব-অনুযায়ী ভাষা সৃষ্টি করিতে হয়; তাহার কারণ, প্রত্যেক রচনার প্রেরণা এত স্বতন্ত্র—লেখকের সেই অনুভূতি এতই অনন্যসদৃশ—যে তাহাকে রূপ দিতে হইলে তাহার সেই particularity এমন নিখুঁতভাবে বজায় রাখিতে হয় যে, পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট

কোনও ভঙ্গি বা ছাঁচ তাহার কাজে লাগিতে পারে না। একে তো প্রত্যেক শক্তিমান লেখকের রচনায় একটা ব্যক্তিত্ব-লক্ষণ প্রকাশ পাইবেই—এই জন্যই 'style is the man himself'; তাহার উপর, একই লেখকের বিশেষ বিশেষ প্রেরণা-অনুসারে প্রত্যেক রচনার ভাষাগত রূপ স্বতন্ত্র হইতে বাধ্য—অবশ্য যদি তাহা একটি সত্যকার মৌলিক সৃষ্টি হয়। কোনও রচনায় ভাষার যাহা গুণ বলিয়া গণ্য হইবে, অপর কোনও রচনায় তাহা দোষ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। কোথাও ভাষার তরলতা ও মসৃণতাই হয়তো সেই রচনার অবশ্যম্ভাবী গুণ, অর্থাৎ তাহাই তাহার ষ্টাইল; অন্য কোথায়ও অমসৃণতাই তাহার যথার্থ ষ্টাইল। কোনও রচনাতে বাগ্‌বন্ধ গাঢ় হওয়াতে ভাব যথাযথ প্রকাশ পাইয়াছে, আবার অন্যত্র শব্দবিন্যাস একটু শিথিল বলিয়াই তাহা অন্তর্গত ভাবকে যথাযথ রূপ দিতে পারিয়াছে। অতএব ষ্টাইল-বিচারে রীতি-ঘটিত দোষ-গুণের কোনও কথাই উঠিতে পারে না। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' যে ভাষায় রচিত হইয়াছে তাহা কোনও আদর্শ-রীতির ভাষা নিশ্চয়ই নহে, তাহা সেই কাব্যেরই ভাষা—কবিকে তাঁহার বিশিষ্ট ভাবপ্রেরণার প্রয়োজনে ঐ ভাষা গড়িয়া লইতে হইয়াছে। আবার, রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'র ভাষাও কোনও রীতির উৎকর্ষ প্রমাণ করে না, তাহা সেই কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত ভাব-কল্পনার যথাযথ বাণীরূপ-হিসাবেই অনবদ্য ষ্টাইল হইয়া উঠিয়াছে। এই দিক দিয়া দেখিলে ষ্টাইল বহু নয়—এক। কবির ব্যক্তিত্ব যেমনই হউক, রচনার রূপ যতই বিচিত্র হউক—যেখানে যেমন সেখানে ঠিক তেমনিটিই যদি ভাষায় রূপ পাইয়া থাকে, তবে ভাষা ও ভাবের সেই সাযুজ্যের এক সাধারণ নাম—ষ্টাইল। ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা চলিবে না যে, খাঁটি সাহিত্যের ভাষা স্বেচ্ছাচারের ভাষা, ভাষার কোনও ধর্ম্মই নাই—কোনও বন্ধন নাই। বরং ভাষার ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই তাহাকে এমন ভাবে স্ব-স্ব ভাবকল্পনার ছাঁচে ঢালিয়া ষ্টাইল করিয়া তোলাই প্রতিভার অসাধ্য-সাধন। এবং যেহেতু ভাষার বহির্গত ভঙ্গিই ষ্টাইল নয়—ষ্টাইলের মূলে আছে শক্তিমান লেখকের সত্যকার মৌলিক ভাব-প্রেরণা, অতএব স্বেচ্ছাচারের কথা উঠিতেই পারে না; কারণ, কবি আরও গভীরতর বন্ধনে—তাঁহার সেই অন্তরের বিশিষ্ট প্রেরণার বন্ধনে এমনই আবদ্ধ যে, স্বেচ্ছাকৃত অনাচার তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার ভাষায় যথেষ্ট স্বাধীনতার লক্ষণ থাকে বটে, কিন্তু সে রচনা সৃষ্টিধর্ম্মী বলিয়া তাহাতে

ভাষার সমৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধিই হয়—নব নব ভাবের নব নব রূপ ভাষার আয়ত্ত হইয়া উঠে, এবং ব্যাকরণ ও অভিধান সেই সঙ্গে পুষ্ট হইয়া থাকে। ভাষার বিষয়ে যে শিল্পী-মন কবি-প্রতিভার নিত্যসহচর, সেই মন ভাষার আত্মাটিকে অপরোক্ষ করিতে পারে বলিয়াই—কবি-ভাষা কখনও ভাষার আত্মাকে লঙ্ঘন করে না।

ষ্টাইল ও রীতির প্রভেদ বুঝিবার পক্ষে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতে পারে। রীতি যেমন ভাষার বহিরঙ্গ-সৌষ্ঠব মাত্র, তেমনই তাহা লেখকের আন্তর-অনুভূতির গভীরতা ও মৌলিকতার পরিপন্থী; অথবা এমনও বলা যায়, যেখানে রচনায় কোনও একটা রীতির ভঙ্গি স্পষ্ট হইয়া থাকে সেখানে লেখকের ভাবকল্পনা তাঁহার নিজস্ব নয়, তাঁহার স্বকীয় দৃষ্টি অতিশয় দুর্ব্বল—যাহাকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি বলে তাহা সেখানে হয় নাই। অনেক লেখক ভাষার নবত্ব-সম্পাদনের জন্য নানাবিধ কৌশল করিয়া থাকেন। ভিতরের ভাববস্তুর কোনও বৈশিষ্ট্য থাকে না বলিয়াই ভাষার এইরূপ ভঙ্গিমাই তাঁহাদের একমাত্র কৃতিত্ব। এইরূপ রচনাভঙ্গি বা ভঙ্গিমাযুক্ত ভাষায়, যে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উটে তাহা খাঁটি ষ্টাইলের লক্ষণ নয়—তাহা অতিশয় superficial idiosyncrasy—সে যেন ভাষার মধ্যে লেখকের নিজ নামের মুদ্রাচিহ্ন। ইহা এত সুস্পষ্ট যে, ইহাকে সহজেই জাল করা চলে—সেই বাক্যভঙ্গি সকলেই অনুকরণ করিতে পারে, এবং সেই কারণে তাহা একটা রীতি হইয়া উঠিতেও পারে। নিম্নোদ্ধৃত রচনায় ষ্টাইল নাই—আছে একটা অতিশয় প্রকট বচন-ভঙ্গিমা—অতিশয় তুচ্ছ কথাকে বচন-ভঙ্গিমার দ্বারা গুরুত্ব দিবার চেষ্টা।—

কিন্তু কাল তোমার মুখে শুনলুম যে, ব্যাজার হবার এদানিক একটু বিশেষ কারণ ঘটেছে। তুমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছ যে, খবরের কাগজে নিত্য এক কথা লেখে, তাও আবার প্রায়ই এক ভাষায়; শুধু তাই নয়, কাগজওয়ালাদের যত বকাবকি যত রোখারুখি কিছুদিন ধরে, সব নাকি হচ্ছে একটা কথা নিয়ে এবং সে কথাটা হচ্ছে diarchy; অথচ ও-কথার মানে জানা দূরে থাক, নামও তুমি ইতিপূর্ব্বে শোন নি, যদিচ ইংরেজী ভাষার সঙ্গে তোমার বহুদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। ও কথার অর্থ যে জান না তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। দুদিন আগে আমরা কেউ জানতুম না, কথাটা গ্রীক কিন্তু জন্মেছে ভারতবর্ষে। Monologue-এর সঙ্গে dialogue-এর যা প্রভেদ, monarchy-র সঙ্গে diarchy-রও সেই প্রভেদ, অর্থাৎ একের সঙ্গে দুয়ের যে প্রভেদ, সেই প্রভেদ। এখন বুঝলে ত?

অথবা—

রাজনৈতিক আন্দোলন অবশ্য একমাত্র কথার সাহায্যেই করতে হয়, এবং কথারও যে একটা শক্তি আছে, সে সত্য কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। বাগ্‌যুদ্ধও ত একটা যুদ্ধ বটে, এবং এ যুদ্ধে কথাই হচ্ছে মানুষের গুলি-গোলা. এমন কি স্থলবিশেষে তা poisonous gas-ও হতে পারে। তবে কথার কোনই শক্তি থাকে না, যদি না তার কোনো অর্থ থাকে। রাজনীতিতে আমরা বিলেতি কথা নিয়ে কারবার করি, সম্ভবতঃ সেই কারণে আমাদের দেশী নেতাদের মুখে সে সব কথা অনেক সময়ে নিরর্থক হয়ে পড়ে। এবং এই কারণেই তাদের কথার প্রতি আমাদের আস্থা দিন দিন কমে আসছে।

এ ভাষা—নিছক কথারই কারবার; এক ধরণের মানসিকতা—যাহা অনেকেই চেষ্টা করিলে অভ্যাস করিতে পারে—তাহাই প্রকাশ করিবার পক্ষে এই রীতির উপযোগিতা আছে। এ ভাষায় যাহা রচিত হইতে পারে তাহা সাহিত্যসৃষ্টি নয়—তাই ইহা ষ্টাইল নয় একটা রীতি মাত্র; এই রীতিকে আয়ত্ত করিয়া প্রতিভাহীন ব্যক্তিও এক ধরণের সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে পারে। ষ্টাইল বলিতে কেবলমাত্র বাক্‌চাতুরী বা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যই বুঝায় না—বহির্গত ভঙ্গিমাই ষ্টাইল নয়; সেই ভঙ্গিমা যাহার—তাহার যেমন মৌলিকতা, তেমনই গুরুত্ব ও গভীরতা চাই, নহিলে ষ্টাইল অর্থে একটা তুচ্ছ লিখন-চাতুরী মাত্র বুঝাইবে; অতএব, এইরূপ রীতিকে ষ্টাইল বলিলে সাহিত্যের মর্য্যাদাহানি হয়। উপরি-উদ্ধৃত রচনায় ভাষার যে ভঙ্গিমা দেখা যায় তাহা ব্যক্তি-বিশেষের বচন-ভঙ্গিমা মাত্র—বৈঠকী আলাপ-হিসাবে উহা উপভোগ্যও হইতে পারে; কিন্তু যে-লেখকের অন্তরে সত্যকার সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা আছে, তাহার পক্ষে ওই ভাষা যেমন কৃত্রিম, তেমনই ঐশ্বর্য্যহীন। এই ভাষাকে 'চল্‌তি' ভাষা নাম দেওয়াই ঠিক, কারণ, প্রথমত, উহা সাহিত্যের ভাষা নয়; দ্বিতীয়ত, উহা একটা রীতিই বটে—সে রীতি যেমনই হউক। অতিশয় ছোট লেখক যাহারা তাহারাই উহাকে আপনাদের ষ্টাইলরূপে গ্রহণ করিতে পারে—কারণ, ষ্টাইলের যে ভাষাগত সমস্যার কথা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি, সেই সমস্যা তাহাদের নাই; তাহারা সংবাদপত্র-জাতীয় সাহিত্য রচনা করে; একটি অতি সহজ সাধারণ ভঙ্গি হইলেই হইল—সাধারণ তথ্য বা তত্ত্বকে সংবাদ-আকারেই তাহারা সাধারণের বুদ্ধিগোচর করে। Style is the man—ইহা যদি সত্য হয়, তবে এখানে ষ্টাইলের বালাই নাই; কারণ, ভাব-কল্পনার স্বাতন্ত্র্যের জন্য, কোনও গভীর ও মৌলিক অনুভূতি-প্রকাশের

সমস্যা এখানে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যে ষ্টাইলের প্রয়োজন, সে প্রয়োজনই এই সকল লেখকের নাই।

ষ্টাইল ও রীতির প্রভেদ বুঝাইবার জন্যই আমি যে আলোচনা করিলাম সেই আলোচনার প্রসঙ্গে এইখানেই, বিশেষ করিয়া বাংলা ভাষার সম্পর্কে, আরও দুই-একটি কথা বলিবার আছে—বাংলা ভাষারই অধুনা যে দুই রূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহারই কথা। এই প্রসঙ্গে আমি অন্যত্র কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি, এখানে ঠিক সেই আলোচনা করিব না।

উপরে আমি যাহাকে একটা রীতি বলিয়াছি, তাহাকে একটা রীতি না বলিয়া খাঁটি বাংলা গদ্যের ভাষা বলিয়া দাঁড় করাইবার যে আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে একরূপ সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করিয়াছে, এবং ফলে ভাষারই দুই আদর্শ দাঁড়াইয়াছে, তাহা কতদূর যথার্থ সে বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক নহে। আসলে, ঐ আদর্শভেদ যে ভাষাঘটিত নয়, রীতিঘটিত—তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। যদি কথ্য-ভাষা বা চল্‌তি-ভাষা বলিয়া একটা ভিন্ন ভাষা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও সাহিত্যে তাহার একাধিপত্য দাবী করা চলে না। কথ্য-ভাষায় লোকে কথাই কহে, বৈঠকী আলাপ-আলোচনা করে—সেই ভাষায় সাহিত্যরচনা সম্ভব নয়—হইলে, সকল উপভাষাগুলিই এক একটি সাহিত্যিক ভাষা হইত—কোনও ভাষায় তাহা হয় নাই। সাহিত্যের ভাষা অধিকাংশের ভাষাও নয়—কারণ, অধিকাংশই সাহিত্যের ধার ধারে না। লোক-সাহিত্য বলিয়া একটা সাহিত্য মুখে-মুখে গড়িয়া উঠে বটে, কিন্তু তাহাও সাহিত্য নয়, কারণ, ছড়া ও গানই কোনও সাহিত্যের সর্ব্বস্ব নয়, এবং সাহিত্যের আদর্শ আরও বৃহৎ ও ব্যাপক। যে ভাষাকে 'চল্‌তি'-ভাষা বলা হয় তাহাও চল্‌তি বা মুখের ভাষা নয়, সাহিত্যের ভাষার মতই তাহাও কৃত্রিম। এমন কি, 'চল্‌তি-ভাষা' নামটাই সাহিত্য-বিরোধী, কারণ সাহিত্য যে-মনের সৃষ্টি সেই মনই 'চলতি' মন নয়—সে মন যতই উচ্চসমাজের শিক্ষিত মন হউক। সকল চল্‌তি বা কথ্য-ভাষার সম্বন্ধে একজন মহামনীষীর উক্তি এইরূপ—

Every style of writing should bear a certain trace of relationship with the monumental style, which is indeed the ancestor of all styles: so that to write as one speaks is

just as faulty as to do the reverse, that is to say, to try and speak as one writes.—(Schopenhauer : On Authorship and Style).

এখানে লেখক ষ্টাইল অর্থে রীতিই ধরিয়াছেন—আমিও এই ভাষাকে একটি রীতি বলিয়াই মনে করি। উহা কোনও সত্যকার কথ্য-ভাষা নয়। কথ্য-ভাষা হইলেও তাহা সাহিত্যের ভাষা হইত না—ইহা তর্ক করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। এখানে খাঁটি কথ্য-ভাষার একটি উদাহরণ দিব, লেখক সেই ভাষায় যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহার সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণ করা আদৌ দুরূহ নয়।—

চিৎপুরের বড় রাস্তা মেঘ কল্লে কাদা হয়—ধুলোয় ধূলো, তার মধ্যে ঢাকের গটরার সঙ্গে গাজন বেরিয়েছে। প্রথমে দুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘড়ি বাঁশ বেঁদে কাঁদে করেছে—কতকগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ি বাজাতে বাজাতে চলেছে—তার পেছনে এলমেলো নিশেনের শ্রেণী। মধ্যে হাড়িরা দল বেঁদে ঢালের সঙ্গতে "ভোলা বোম্ ভোলা বড় রঙ্গিলা লেংটা ত্রিপুরারী শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা" ভজন গাইতে গাইতে চলেচে। তার পেছনে বাবুর অবস্থামত তকমাওয়ালা দরওয়ান, হরকরা, সেপাই। মধ্যে সর্বাঙ্গে ছাই ও খড়িমাখা, টিনের সাপের ফণার টুপি মাথায় শিব ও পার্ব্বতী সাজা সং। তার পেছনে কতকগুলো সন্ন্যাসী দশলকী ফুঁড়ে ধুনো পোড়াতে পোড়াতে নাচতে নাচতে চলেচে। পাশে বেণোরা জিবে হাতে বাণ ফুঁড়ে চলেচে। লম্বা লম্বা ছিপ, উপরে শোলার চিংড়ি মাছ বাঁধা। সেটকে সেট ঢাকে ড্যানাক্ ড্যানাক্ করে রং বাজাচ্চে। পেছনে বাবুর ভাগ্নে, ছোট ভাই বা পিসতুতো ভেয়েরা গাড়ী চড়ে চলেচেন—তাঁরা রাত্রি তিনটের সময় উঠেচেন, চোক লাল টক্ টক্ কচ্চে, মাথা ভবানীপুরে ও কালীঘেটে ধুলোর ভরে গিয়েছে। দর্শকরা হাঁ করে গাজন দেখচেন, মধ্যে বাজনার শব্দে ঘোড়া খেপেছে—হুড়মুড় করে কেউ দোকানে কেউ খানায় উপরে পড়েচেন, রৌদ্রে মাথা ফেটে যাচ্চে—তথাপি নড়চেন না।"

এই ভাষা আদৌ মার্জ্জিত নহে, ইহা slang-মিশ্রিত অতিশয় চল্‌তি বুলি—যেন লেখ্য-ভাষার একটি প্রবল প্রতিবাদ। তথাপি অতিশয় ব্যাপক অর্থে ইহাও একরূপ ষ্টাইল হইয়াছে—কারণ বক্তব্য বস্তুর সহিত ইহার সামঞ্জস্য আছে; ইহা শুধু ভাষারই ভঙ্গি নয়—এ ভঙ্গি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিরও অনুরূপ; এবং সেই দৃষ্টি অতিশয় সংকীর্ণ ও সাধারণ মনোবৃত্তিমূলক বলিয়া ইহা সাহিত্য-হিসাবে নিম্নস্তরের রচনা। তথাপি এ ভাষা খাঁটি, ইহাতে ভান নাই, এবং ভাব-কল্পনার গভীরতা না থাকিলেও ইহার মূলে একটা বাস্তব-প্রেরণা আছে।

কথা-ভাষায় ইহার অধিক কিছু আশা করা যায় না। কথ্য-ভাষা যখন ছন্দোবদ্ধ হয় তখন তাহা তো আর কথাই থাকে না—অতএব সে দৃষ্টান্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু 'চল্‌তি-ভাষা' নামে এই যে নূতন বাংলা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা কি সত্যই একটা পৃথক ভাষা? ইহার শব্দযোজনা-পদ্ধতির যে পার্থক্য তাহা ভাষার নহে—রীতির। তাহার ফলে যাহা ঘটে তাহার ধ্বনির বৈষম্য, আর কিছুই নহে। ষ্টাইল ও ভাষার আলোচনায় আমি ভাষার ধ্বনিকে ষ্টাইলের একটি অঙ্গ বা উপাদান বলিয়াছি। এখানে তাহারই একটি বিশিষ্ট প্রমাণ মিলিবে। এই চল্‌তি-ভাষার ধ্বনি এমনই যে, তাহার বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্যসম্পাদন কষ্টসাধ্য; ইহার ধ্বনিও, একটা বাঁধা রীতির মত, ষ্টাইলের পক্ষে অনুপযোগী। অপর পক্ষে, যাহাকে সাধু-ভাষা বলা হয়, তার ধ্বনি-বৈচিত্র্যের শেষ নাই। এজন্য ঐ ভাষা উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন সর্ব্বপ্রকার ষ্টাইলকে ধারণ করিতে পারে। লেখকের ব্যক্তিত্বমূলক বিশিষ্ট ভাব-প্রেরণা যখন অনুরূপ ভাষায় ব্যক্ত হইতে চায়, তখন অনুরূপ ধ্বনিরও সন্ধান করে—কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট ধ্বনিরীতিকে আশ্রয় করিলে তাহার চলে না। বাংলা ভাষায় এ যাবৎ ষ্টাইলের এই স্বেচ্ছাবিচরণ ঘটিয়াছে সাধু ভাষায়—এই সাধু ভাষায় ভাবের উপযুক্ত ধ্বনি যে কতরূপ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহা ছাড়া, সাহিত্যের যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ষ্টাইল, যাহাকে 'monumental' বলা যাইতে পারে, রচনার সেই ভাব-গভীর অনবদ্য রূপ সাধু ভাষাতেই সম্ভব হইয়াছে—সে পক্ষে দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক। ভাবমাত্রেই যেখানে ভাষার যথাযথ রূপ পায় সেখানেই তাহা একরূপ ষ্টাইলের সৃষ্টি করে বটে, এবং এই ষ্টাইলের গুণেই তাহা অতি নিম্ন অথবা মধ্য স্তরের সাহিত্য আখ্যা পাইতে পারে, তথাপি এ সকল ষ্টাইল ঐ শ্রেষ্ঠ ষ্টাইলের তুলনায় তুচ্ছ। সেই যে ষ্টাইল, যাহার গুণে—শেক্‌স্‌পীয়ারের দুই-চারি ডজন লাইন—'a splendid conquest of the human mind' বলিয়া মনে হয়—বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের দুই-দশ ছত্র বাংলা সাহিত্যের গৌরব বলিয়া মনে হয়, তাহার মত কিছু সৃষ্টি করা ঐ চল্‌তি-ভাষায় সম্ভব নহে —রসিকমাত্রেই ইহা স্বীকার করিবেন। অতএব চল্‌তি-ভাষা আর যাহাই হউক, বাংলা সাহিত্যের আদর্শ-ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

সাহিত্যের সম্পর্কে রীতি কথাটা যদি কোনও অর্থে খাটে তবে তাহা একমাত্র পদ্য ও গদ্য—এই দুইয়ের ভেদ নির্দ্দেশ করিবার জন্য। কারণ পদ্য

বা গদ্য—ষ্টাইল-ভেদ নয়—রীতি-ভেদ মাত্র। আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনায় সাহিত্যের এই রীতি-ভেদ ভাবের উপর নির্ভর করে না। যাহা পদ্যে প্রকাশ-যোগ্য তাহা গদ্যেও প্রকাশ করা যায়, দুই-ই সমভাবে খাঁটি কাব্যপ্রেরণার উপযোগী হইতে পারে। বরং আধুনিক সাহিত্যের সৃষ্টিসম্ভার লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, গদ্য পদ্য অপেক্ষা ভাব-বৈচিত্র্যের পক্ষে আরও অধিক উপযোগী—"it is an instrument of many stops"। প্রাচীন-কালে মহাকাব্য ও নাটক যে কাব্যরসের আধার ছিল, আধুনিক কালে সেই রসই আরও গূঢ় ও দূরসঞ্চারী হইয়া গদ্য-উপন্যাসে ও গদ্য নাটকে-সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে; ইহার জন্য পদ্যচ্ছন্দের প্রয়োজন হয় নাই, বরং পদ্যের পয়ঃপ্রণালী সে রসপ্রবাহের পক্ষে সংকীর্ণ বলিয়াই তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। গদ্য নিজের স্বতন্ত্র কাজ তো করেই, তদুপরি গদ্য উৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টির পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে, আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-কাব্যগুলিই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের জনক বাংলা গদ্য-সাহিত্যেরই প্রতিষ্ঠা করিলেও, সেই গদ্যকে অতি উচ্চ ভাব-কল্পনার বাহন করিয়া তিনি যাহা রচনা করিয়াছিলেন তাহাই আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গদ্যকাব্য—এপিক ও নাটকীয় কল্পনার কাব্যরস তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাসেই উৎসারিত হইয়া বাংলা সাহিত্যকে মহিমান্বিত করিয়াছে। পদ্যে না হইলে কাব্যরচনা হয় না, এবং পদ্যকাব্যরচয়িতাই কবিপদবাচ্য—এইরূপ একটা সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে কবি বলিয়া মনে করি না—ইহার মত ভুল আর কিছুই নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা হইতে এক টুকরা গদ্যকাব্য উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতেই, কাব্যসৃষ্টির পক্ষে গদ্য ও পদ্য যে একটা রীতি-ভেদ মাত্র, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে—

"অপ্সরোগণের ভ্রূবিলাসযুক্ত কটাক্ষের জ্যোতিঃ লইয়া অতি যত্নে নির্ম্মিত যে সম্মোহন শর পুষ্পধন্বা তাহা পরিণীত দম্পতির প্রতি অপব্যয় করেন না। যেখানে গাঁটছড়া বাঁধা হইল—সেখানে আর তিনি পরিশ্রম করেন না, প্রজাপতির উপর সকল ভার দিয়া, যাহার হৃদয়শোণিত পান করিতে পারিবেন, তাহার সন্ধানে যান। কিন্তু আজ বোধ হয়, পুষ্পধন্বার কোনও কাজ ছিল না—হঠাৎ দুইটা ফুলবাণ অপব্যয় করিলেন। একটি আসিয়া জীবানন্দের হৃদয় ভেদ করিল—আর একটি আসিয়া শান্তির বুকে পড়িয়া প্রথম শান্তিকে জানাইল যে, সে বুক ছেলেমানুষের বুক—বড় নরম জিনিষ। নবমেঘনির্ম্মুক্ত প্রথম জলকণানিষিক্ত পুষ্পকলিকার ন্যায় শান্তি সহসা ফুটিয়া উঠিয়া উৎফুল্ল নয়নে জীবানন্দের মুখপানে চাহিল।" (আনন্দমঠ)

বিশেষ করিয়া এই স্থানটি উদ্ধৃত করিলাম এই জন্য যে, এখানে গদ্য স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছে—ভাষাও গদ্য, চিন্তাও গদ্যময়, কিন্তু তাহারই মধ্য দিয়া যে কাব্যরস ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহার আধার এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে পারিত না। নিম্নোদ্ধৃত অংশটি গদ্য হইলেও একটি কবিতা।—

"বেলা অবসান হইয়া গেল। গাছের সর্ব্বোচ্চ চূড়া হইতে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের শেষ রক্তাভা কোথায় সরিয়া গেল, সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি গ্রামের ভিতর হইতে ভাসিয়া তাহার কানে পৌঁছিল, সেই সঙ্গে তাহার নিমীলিত চোখের সুমুখে অপরিচিত গৃহস্থবধূদের শান্ত মঙ্গল মূর্ত্তিগুলি ফুটিয়া উঠিল। এখন কে কি করিতেছে, কেমন করিয়া দীপ জ্বালিতেছে, হাতে দীপ লইয়া কোথায় কোথায় দেখাইয়া ফিরিতেছে, এইবার গলায় আঁচল দিয়া নমস্কার করিতেছে, তুলসীতলায় দীপ দিয়া কে কি কামনা ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করিতেছে—এ সমস্তই সে চোখে দেখিতে লাগিল, কানে শুনিতে লাগিল। আজ অনেক দিন পরে তাহার চোখে জল আসিল। কত সহস্র বৎসর যেন শেষ হইয়া গিয়াছে, সে কোন গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে পায় নাই, কাহারও মুখ মনে করিয়া ঠাকুরের পায়ে আয়ু ঐশ্বর্য্য মাগিয়া লয় নাই। এই সমস্ত চিন্তাকে সে প্রাণপণে সরাইয়া রাখিত, কিন্তু আজ পারিল না। শাঁখের আহ্বানে তাহার ক্ষুধিত তৃষিত হৃদয় কোন নিষেধ না মানিয়া গৃহস্থ-বধূদের ভিতরে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনশ্চক্ষে প্রতি ঘরদোর প্রতি প্রাঙ্গণপ্রান্তর, বাঁধান তুলসীবেদী, প্রতি দীপটি পর্য্যন্ত এক হইয়া গেল—এ যে সমস্তই তাহার চেনা; সবগুলিতে এখন যে তাহারই হাতের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। আর তাহার দুঃখ রহিল না, ক্ষুধাতৃষ্ণা রহিল না, সে তন্ময় হইয়া নিরন্তর বধূদের অনুসরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। যখন তাহারা রাঁধিতে গেল, সঙ্গে গেল, রান্না শেষ করিয়া যখন স্বামীদের খাইতে দিল, সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল; তারপর সমস্ত কাজকর্ম্ম সমাধা করিয়া অনেক রাত্রে যখন তাহারা নিদ্রিত স্বামীদের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, সেও কাছে দাঁড়াইতে গিয়া সহসা শিহরিয়া উঠিল—এ যে তারই স্বামী! আজ তাহার চোখের পলক পড়িল না, একদৃষ্টে নিদ্রিত স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল।" (বিরাজ-বৌ)

কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত লাইন কয়টি গদ্য হইলেও ইহা যেমন কাব্যপ্রধান, তেমনই ইহার সুরও পদ্যাত্মক।—

"আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সমস্ত হৃদয়ভার, সমস্ত যৌবনভার, সমস্ত অনাদৃত ভক্তিভার লইয়া সেই অদৃশ্য নৌকার অভিমুখে জোড়কর করিয়া সেই নিস্তব্ধ নিশীথে সেই চন্দ্রালোক-পুলকিত নিস্তরঙ্গ যমুনার মধ্যে, অকালবৃন্তচ্যুত পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় এই ব্যর্থ জীবন বিসর্জ্জন করি। কিন্তু পারিলাম না। আকাশের চন্দ্র, যমুনাপারের ঘনকৃষ্ণ বনরেখা, কালিন্দীর নিবিড়-নীল নিষ্কম্প জলরাশি, দূরে আম্রবনের ঊর্দ্ধে আমাদের জ্যোৎস্নাচিক্কণ কেল্লার চূড়াগ্রভাগ সকলেই নিঃশব্দগম্ভীর ঐক্যতানে মৃত্যুর গান গাহিল;—সেই নিশীথে গ্রহচন্দ্রতারাখচিত নিস্তব্ধ তিন ভুবন

আমাকে একবাক্যে মরিতে কহিল। কেবল বীচিভঙ্গহীন প্রশান্ত যমুনাবক্ষোবাহিত একখানি অদৃশ্য জীর্ণ নৌকা সেই প্রসারিত জ্যোৎস্নারজনীর সৌম্য সুন্দর শান্ত শীতল অনন্ত ভুবনমোহন মৃত্যুর আলিঙ্গনপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাকে জীবনের পথে টানিয়া লইয়া চলিল।"—গল্পগুচ্ছ)

গদ্যই আধুনিক জীবনের বিচিত্র রস-সংবেদনার অতি নিপুণ ও বৈচিত্র্যময় বাক্-ভঙ্গি হইয়া উঠিয়াছে—ইহাই যে কবি-সরস্বতীর কামধেনু। তথাপি পদ্যচ্ছন্দের প্রয়োজনীয়তা বোধহয় কখনও দূর হইবে না—ভাবানুভূতির একটা একটা স্তর আছে যেখানে পদ্যচ্ছন্দই তাহার স্ব-চ্ছন্দ ও একান্ত উপযোগী প্রকাশরীতি। আধুনিক কালে প্রায় সকল ভাবই জ্ঞানাত্মক—সকল অনুভূতির মধ্যেই মনের বিশ্লেষণী বৃত্তি সজাগ হইয়া থাকে; এজন্য, ভাষা যেমন রূপরসাত্মক না হইয়া অতিসূক্ষ্ম মানব-ক্রিয়ার প্রতিবিম্ব হইয়া উঠিতেছে, তেমনই সরল ও প্রবল আবেগমূলক সুরও তাহার বিশিষ্ট উপাদান হইতে পারিতেছে না। আধুনিক সাহিত্যের আদর্শ-ভাষা শুধুই গদ্যময়—রূপানুভূতিব্যঞ্জক না হইয়া অতিসূক্ষ্ম ও জটিল জ্ঞানানুভূতিমূলক হইয়া উঠিতেছে। এইরূপ ভাষা আমাদের সাহিত্যে এখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, এখনও তাহা অতিশয় প্রাথমিক অবস্থায়, অর্থাৎ অনুকরণের অবস্থায়, আছে—যাহাদের সাহিত্যিক প্রতিভা নাই, অর্থাৎ কোন-কিছু সৃষ্টি করিবার মত দৃষ্টিশক্তি নাই, তাহারাই 'ভাবের ঘরে চুরি' ঢাকিবার জন্য এইরূপ মানস-রস-রসিকতার দোহাই দিতেছে, এবং ভাষাকে একেবারে বিরূপ ও বি-আকার করিয়া তুলিতেছে। রসসৃষ্টির এই নব আদর্শ সবচেয়ে প্রকট হইয়াছে আধুনিক নিশ্ছন্দ কবিতায়; এখানে কাব্যের খাতিরে ভাবানুভূতির ভান করিতেই হয়, কিন্তু সে বস্তু একেবারে 'নাস্তি' বলিয়া তাহার কোনও রূপই না থাকায়, কতকগুলি অসম্বদ্ধ শব্দের চকমকি ঠুকিয়া ভাবের সরিষাফুল সৃষ্টি করিতে হয়। এই সকল রচনায় যেমন ছন্দও নাই তেমনই ভাষাও নাই, অতএব ইহাদের ষ্টাইলের বালাইও নাই। আধুনিক চিন্তাধারা যেমনই হউক, আধুনিক মানুষের ভাব-জীবন অতিশয় রুগ্ন ও নিস্তেজ; কাজেই এ যুগে কবিতার স্বাস্থ্য আর নাই। সাহিত্যে পদ্য-রীতির অপ্রচলনের ইহাও একটা কারণ।

ষ্টাইল কথাটির যতগুলি অর্থ সম্ভব তাহার উল্লেখ প্রথমেই করিয়াছি—এবং যে অর্থে তাহার বিশেষ প্রয়োগ ও নানা সমস্যা উপস্থিত হইয়া থাকে, সে সম্বন্ধে যথাসম্ভব বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। ষ্টাইলের মূল কারণ যে লেখকের ভাব-কল্পনার বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—শেষ পর্য্যন্ত 'style is the man' বাক্যটিই যথার্থ। কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব সকল শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনায় অবশ্যম্ভাবী হইলেও, তাহা একটা আন্তর-অনুভূতি বা বিশিষ্ট ভাব-কল্পনাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে—ষ্টাইলের যে ব্যক্তিত্ব তাহা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বই নয়, সেরূপ ব্যক্তিত্বের কোনও মূল্য নাই। এইজন্য অতিশয় বাহ্যিক ব্যক্তিগত ভঙ্গিকে সত্যকার ষ্টাইল বলা চলে না—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উৎকৃষ্ট প্রতিভা যেমন একটা ষ্টাইল সৃষ্টি করে, সেই ষ্টাইলই যেমন তাহার সকল সৃষ্টির অন্তর্গত একটা অভিনব দৃষ্টির পরিচয় দেয়, ও সেই কারণে আমাদের চিত্তেও একটা নূতন রস-সংবেদনা ও নূতনতর রুচির বিকাশ করে—আমাদের চক্ষে একরূপ নবদৃষ্টি দান করে, তেমনই একথা ভুলিলে চলিবে না যে, সে কেবলমাত্র একটা প্রকাশ-ভঙ্গি বা বাণী-নির্ম্মাণের অভিনব চাতুরীই নয়—কবির প্রাণে একটা সত্যকার জীবন্ত অনুভূতি, একটা সুগভীর বস্তু-রসপ্রেরণাই সেই ষ্টাইলের জনয়িতা। কিন্তু আমরা প্রায়ই এ বিষয়ে অবহিত হইতে পারি না—ষ্টাইলকে যে-কোনও ভাষা-ঘটিত কারুকলা বা কৌশলময় ভঙ্গি বলিয়াই উপভোগ করি। কোনও কবির কবি-শক্তি যখন নিস্তেজ হইয়া পড়ে—তখনও তাঁহার ব্যক্তিগত ভঙ্গিমাটিকেই আমরা ষ্টাইল মনে করিয়া কবির অক্ষম রচনাকে শিরোধার্য্য করি। অনেক সময় কবিগণেরও আত্মবিভ্রম ঘটে—ভাব-প্রেরণার নবত্ব যখন আর থাকে না, তখন যে-ভঙ্গি এককালে সত্যকার ষ্টাইল ছিল, এবং যাহা এক্ষণে ভঙ্গিমামাত্র হইয়া কবির ব্যক্তিত্বাভিমান চরিতার্থ করে, সেই ভঙ্গিমাকে নানা নূতন রূপে ভাঙ্গাইয়া বিগত-শক্তি কবিগণ মিথ্যার মায়াজাল সৃষ্টি করেন, এই আত্ম-প্রবঞ্চনা তাঁহার ভক্তগণকেও প্রবঞ্চিত করে। ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের কালেও জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে—অতি উচ্চদরের প্রতিভাই এইরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হয়; কারণ, ষ্টাইল বলিতে ভাব ও ভাষার মধ্যে যে সুস্থ ও সবল সম্বন্ধ বুঝায় সেই সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গেলেও, লেখক তাঁহার idiosyncrasy বা ব্যক্তিগত ভঙ্গিটি

তখনও প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহার ফলে, লেখকের যতই সত্যকার প্রেরণার অভাব হয়, ততই ভঙ্গিমার প্রতিই শ্রদ্ধা বাড়িতে থাকে—শেষে এমন মোহ উপস্থিত হয় যে, সর্ব্বশেষের রচনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মে, এবং সত্যকার প্রেরণার অভাব যেমন ভঙ্গি চাতুর্য্য, technique বা প্রকাশকলার নিত্য-নূতন কৌশল-উদ্ভাবনেই পূরণ করিবার প্রবৃত্তি হয়, তেমনই পূর্ব্বতন রচনাগুলিকেও ভাঙ্গিয়া তাহাদের ছাঁচ সংশোধন করিবার প্রবৃত্তিও জাগে। সাহিত্য-জগতে ইহা অভূতপূর্ব্ব বা অসম্ভব নয়, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ আমি একজন সুবিখ্যাত ইংরেজ সমালোচকের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। যখন সেই আদি অকৃত্রিম কবিপ্রেরণা থাকে না, তখন অতিশয় শক্তিমান লেখকেরাও ভাববস্তুর পরিবর্ত্তে technique বা প্রকাশকলাকেই, তাঁহাদের সহজাত ও অভ্যস্ত ব্যক্তিত্বগুণের সাহায্যে, যে ভাবে লীলায়িত করিয়া নানা কায়াহীন ছায়ার সৃষ্টি করেন, তাহা উল্লেখ করিয়া এই সমালোচক বলিতেছেন—

"Meredith and Henry James suffered a similar atrophy of the central, originating powers......paid the penalty of an undue preoccupation with technique. With the decline of his power of receiving a direct emotional impulse from the life he desired to represent, he (H. James) transferred the object of his interest to the process of representations... Technique begins to assume a life of its own ; it is graced by complications and subtleties and economies which dance inextricable patterns in the void.........For a barren idiosyncrasy of style may have recondite forms ; instead of being obviously hollow and lifeless, it may present the appearance of luxuariant growth......Or you may have the condition in which a writer's impulse is derived from his delight in contemplating the formal beauty of the intricate design he is engaged in constructing".

উপরে যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহার সবগুলিই আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ লোকের সম্বন্ধে সত্য—সেরূপ প্রতিভা আমাদের সাহিত্যে বিরল বলিয়াই,

উৎকৃষ্ট ষ্টাইল হইতেই যে অপূর্ব্ব ব্যাধির উৎপত্তি হয় তাহার দৃষ্টান্ত ঐ একটি বই আর নাই। রবীন্দ্রনাথের আধুনিক রচনা এমন কি বাংলা ভাষার নব্য-রীতির প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ ও বানানেরও নব ভঙ্গি-প্রবর্ত্তনে তাঁহার যে উৎসাহ—এ সকলের মূলে ঐ এক কারণ রহিয়াছে। গদ্য ও পদ্য লইয়া তাঁহার যে অফুরন্ত টেকনিক-লীলায় আমরা মুগ্ধ হই, তাহারও মূলে রহিয়াছে নির্ব্বাপিত কল্পনা-বহ্নির বিচিত্র অঙ্গার-দীপ্তি। তাঁহার অঙ্কিত ছবিগুলিতে যে "ghostly almost supra-sensual emotion"-এর আভাস পাওয়া যায়, আধুনিক রচনাগুলিতেও তাহাই আর-এক রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে; কারণ, যখন সত্যকার ভাব-প্রেরণার খাঁটি ষ্টাইল হারাইয়া যায়, তখন—"this ghostly, almost supra-sensual emotion will take the place of the primary, originating emotion upon which a real vitality of style depends"; রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতাগুলি ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সমালোচক আরও যাহা বলিয়াছেন তাহাও এই সম্পর্কে অক্ষরে অক্ষরে সত্য—

"For if original genius must create its own taste, it generally creates its own sycophants. The coterie is formed of those who mistake the accidents for the essentials of true individuality in style; the esoteric cult is portentously inaugurated; and unless the master is one of those rare spirits, not too common even among masters......he may be easily convinced that there is a law of nature to ensure that his latest work must inevitably be his finest, as his devotees are bound to assure him.

ষ্টাইল সম্বন্ধে যে সূক্ষ্ম ও অব্যর্থ দৃষ্টির ফলে লেখকের এই কথাগুলির প্রায় প্রত্যেকটি আমাদের সাহিত্যের একটি ঘটনার প্রতিই উদ্দিষ্ট বলিয়া মনে হয়, তাহাতে সাহিত্য-সমালোচনার এই ষ্টাইল-বাদ যে কত বড় সাহিত্যিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। আমি অতঃপর ষ্টাইল সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ উক্তির আলোচনা করিব, এবং যাহা বলিয়াছি সংক্ষেপে তাহার পুনরুক্তি করিব।

প্রথমেই, ষ্টাইল কথাটির সর্ব্ববাদিসম্মত অর্থ আর একবার বুঝিয়া লওয়া যাক। একজন প্রসিদ্ধ সমালোচকের মতে, ষ্টাইল বলিতে একই বস্তু বুঝায়—ষ্টাইল শব্দটি বহুবচন নয়, একবচন; ষ্টাইলের প্রাণ—রচনাগত 'fineness of truth' বা 'absolute accordance of expression to idea'। এজন্য কোনও রচনার ভাষা রঙ্গীন হউক বা সাদা হউক, অতিশয়-সরল অথবা বহু আয়াসযুক্ত হউক, তাহার ষ্টাইল-লক্ষণ এই যে, ভাবের সঙ্গে ভাষার সম্পর্কে লেশমাত্র ব্যভিচার ঘটে নাই। এই একমাত্র প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য স্থলবিশেষে ভাষা যেমন অলঙ্কারমণ্ডিত হইতে পারে, তেমনই অন্যত্র সকল অলঙ্কারিকতা বর্জ্জন করাই তাহার পক্ষে সঙ্গত হইবে। এই কারণে ভাষার রূপবৈচিত্র্য ঘটিবে বটে, কিন্তু ষ্টাইল অর্থে সর্ব্বত্র সেই একই গুণ বুঝিতে হইবে।

সকল আর্টের মত সাহিত্যও একটি আর্ট বা শিল্পকর্ম্ম। এই শিল্পকার্য্যের দিক দিয়া ষ্টাইলের সমস্যা বিচার করিলে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা অত্যা-বশ্যক। আমি ইতিপূর্ব্বে ষ্টাইলের সম্পর্কে ভাষার আলোচনা করিয়াছি—এক্ষণে এই ভাষার সম্বন্ধে আরও দুই-চারি কথা অপর এক সমালোচকের উক্তি হইতে তুলিয়া দিলে ভাল হয়। তিনি বলেন, এই expression বা ভাষা লইয়াই যত কষ্ট; কারণ, উহা সকল রচনার পক্ষেই fine ও true হওয়া চাই—অতিশয় নিপুণ ও যথাযথ হওয়া চাই; শব্দ-নির্ব্বাচনেও পাণ্ডিত্য চাই, অর্থাৎ শব্দশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকা চাই; ভাষাকে তাহার স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করাইয়া সকল ভাব-পরিবেশের (atmosphere) উপযোগী করিয়া লওয়া চাই, এবং সত্যকার সাহিত্য-শিল্পী হইতে হইলে এ বিষয়ে সংযম ও নির্ম্মমতা চাই।

ভাষার এই পাণ্ডিত্য-সুলভ শ্রী ও সৌষ্ঠব, সংযমজনিত নৈপুণ্য, ও মিতাক্ষর-গাঢ়তা উপভোগ করিতে হইলে, পাঠকের পক্ষেও অনেকখানি তৈয়ারী থাকা চাই। সব কথা, চিন্তার সকল সূত্র, ধরাইয়া দিতে হইবে—পাঠক হাতটি ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিবেন—এমন প্রথা উৎকৃষ্ট আর্টের প্রথা নয়। লেখার সংযম (restraint), বাহুল্যবর্জ্জন (economy of means), এবং ভাষার মিতাক্ষর-গাঢ়তা (frugal closeness of style)—এ সকলের একটি বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য আছে; তাহাতেই একপ্রকার রসোল্লাস হয় ও পাঠকের চিত্তে, দুরূহ সাধনায় সিদ্ধিলাভের মত, একটা আনন্দের উদ্রেক হয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের একটা সাধারণ সংস্কারের কথা বলিব। প্রায়ই শোনা যায়,

'অমুক বড় ভাল লেখেন, উহার ভাষা বড় সহজ ও প্রাঞ্জল,' এবং এই কারণে গ্রাম্য গান ও কথা-কাহিনীর ভাষাই আদর্শ-ভাষা বলিয়া প্রশংসিত হয়; ভাষায় বৈদগ্ধ্য বা পাণ্ডিত্য থাকিলে, অর্থাৎ তাহা যদি সাধারণ পাঠকের সুবোধ্য না হয় তাহা হইলে, সে রচনা নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার কারণ, প্রথমত—মহাকবি যে 'আপরিতোষাৎ বিদুষাম্' বলিয়াছিলেন, এই সমালোচক সেই 'বিদুষাং'-শ্রেণীর অন্তর্গত নহেন; সাহিত্য যে একটা বড় আর্ট, এবং তাহার সৃষ্টি ও রসাস্বাদন উভয়পক্ষে, সুমার্জ্জিত রুচি ও শিক্ষিত রসবোধের প্রয়োজন আছে, সে ধারণাও ইহাদের নাই। ইহাদের রসবোধও যেমন আদিম, তেমনই স্বচ্ছন্দবনজাত স্বভাব-কবিতাই ইহাদের রুচিকর। দ্বিতীয় কারণ, ইহারা রচনার ষ্টাইল সম্বন্ধে একেবারে নাস্তিক। প্রসাদগুণ প্রভৃতি গুণের কথা রীতির সম্বন্ধেই খাটে, ভাষার এইরূপ কোনও পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বহির্গত লক্ষণ ধরিয়া থাকিলে ষ্টাইলকে বিদায় করিতে হয়। উৎকৃষ্ট রচনার ভাষা তাহারই অন্তর্গত ভাবের প্রতিবিম্ব হইবে—ভাবের ছাঁচে ভাষাকে গড়িতে হইবে, সেই ছাঁচ ভাষায় থাকা চাই—তাহাই রচনার উৎকর্ষের প্রমাণ; এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। রচনার যে দুর্ব্বোধ্যতা তাহাও ষ্টাইলের দোষ, ভাষার নয়—এজন্য ষ্টাইলের অন্তর্গত আর-একটা লক্ষণের আলোচনা এইবার করিতে হইবে।

প্রসঙ্গের আরম্ভেই ষ্টাইলের নানা অর্থের যে উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহার একটি ছিল—প্রাঞ্জলতা; 'অমুকের রচনায় পাণ্ডিত্য আছে, ভাবুকতা আছে, কিন্তু ষ্টাইল নাই'—এখানে রচনায় ষ্টাইল নামে যে গুণের অভাব লক্ষ্য করা হইতেছে, তাহা ভাব বা চিন্তার পরিস্ফুটতা; অর্থাৎ রচনার যে গুণ থাকিলে কোনও চিন্তাবস্তু পাঠকের মনে একটি সুসম্বদ্ধরূপে ধরা দেয়, ইহা সেই গুণ; ভাব-প্রধান যে সাহিত্য, যাহাকে সৃষ্টিধর্ম্মী সাহিত্য বলা যায়, তাহার পক্ষে এই গুণ যে কেন প্রধান নয়—সে-সাহিত্যের উৎকর্ষ কিসের উপর নির্ভর করে—তাহা পূর্ব্বের আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা গিয়াছে। তথাপি সাধারণ ভাবে সকল রচনাতেই একটি যে গুণ থাকা দরকার, তাহা ঠিক সাহিত্যিক অর্থে ষ্টাইল না হইলেও একটা আবশ্যকীয় গুণ, এই গুণ ষ্টাইলের মত ভিতর হইতেই রচনায় সংক্রামিত হয়, ভাষার কোনও বহির্গত আদর্শের প্রভাবে নয়। ইহাকেই "mind in style" বলা হইয়াছে, ইহা লেখকের একপ্রকার মনন-

শক্তি—চিন্তাগুলিকে সুসম্বদ্ধ করিবার শক্তি। ইহার ফলে, লেখার মধ্যে চিন্তার ধারাবাহিকতা, যুক্তিনিষ্ঠা, পরিমাণবোধ, অখণ্ডতা, রচনাগত বিভিন্ন অংশের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, শব্দ ও বাক্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগ এবং বিষয়বস্তুর সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য—এই সকল গুণ বর্ত্তমান থাকে। এই জন্য ইহার নাম—'mind in style,' ইহার জন্য রচনার সুবোধ্যতা আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে; নতুবা, ভাবই যদি গূঢ় ও গভীর হয়, অথবা তাহার মধ্যে যদি অতি সূক্ষ্ম চিন্তাও থাকে, তবে তাহা যে কথ্য-ভাষার মত সরল ভাষায়, অথবা অতি-প্রচলিত বাক্যগুলির দ্বারাই প্রকাশ করিতে হইবে, তাহা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়।

'Mind in style'-এর মত ষ্টাইলের আর-একটি লক্ষণ আছে—তাহা 'soul in style' বা ষ্টাইলের অধ্যাত্ম-গুণ, লেখকের দিব্যানুভূতির ফলেই ইহা ঘটিয়া থাকে। এই গুণ পূর্ব্বোক্ত গুণের ঠিক বিপরীত বা বিরোধী। প্রথমটির বলে লেখক আমাদের মনের মধ্যে বেশ একটি স্পষ্ট উপায়ে প্রবেশ করেন, দ্বিতীয়টির বলে কেমন যেন অতর্কিতে আমাদের বোধ-বুদ্ধিকে হঠাইয়া দিয়া, কোনও যুক্তি—এমন কি শব্দার্থের কোনও সুসঙ্গতি ব্যতিরেকেই, একেবারে আমাদের গভীরতম অনুভূতিকে স্পর্শ করেন। Soul-প্রধান ষ্টাইলে, ভাষা ও তাহার অভিপ্রেত ভাবের মধ্যে একটা সহজ সরল সম্বন্ধ নাই —কেমন করিয়া সে ভাব সে ভাষায় প্রকাশ পাইল তাহা নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। ইংরেজ সমালোচক ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংরেজ কবি ব্লেক-এর (Blake) কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, সকল উৎকৃষ্ট কবিতার ভাষায় এই লক্ষণ আছে—শব্দগুলি সেখানে যাদুমন্ত্রের মত শক্তিশালী। অতিশয় সরল সহজ শব্দ, অথবা কোনও একটি বিচিত্র উপমা এমনভাবে আমাদের চমকিত করে, এমন অর্থাতিরিক্ত ভাবের দ্যোতনা করে যে, আমরা বারবার সেই পংক্তি বা বাক্য আবৃত্তি করিতে থাকি; তাহার ভিতরের কোন্ বস্তু যে এই চিত্ত-চমৎকারের কারণ, তাহা বুঝিতে চেষ্টাও করি না। এই হিসাবে সকল উৎকৃষ্ট কাব্য-ভাষাই 'soul in style'-এর উদাহরণ। কিন্তু আর-একপ্রকার কাব্য আছে যাহাকে আমরা মিষ্টিক তত্ত্বরসের কাব্য বলিয়া থাকি—এইরূপ কাব্যের ভাবে ও ভাষায় একপ্রকার অধ্যাত্ম-প্রেরণার পরিচয় পাই। ব্লেক-এর কবিতা সেইজাতীয়; আমাদের বাংলা সাহিত্যে বিহারী-

লালের অনেক শ্লোক এই শ্রেণীর অন্তর্গত; যাঁহারা ফার্সী কবি হাফিজের কবিতা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাও ষ্টাইলের এই গুণ বুঝিতে পারিবেন। এই সকল কবিতায় ভাবের অর্থ বা আকারগত ঐক্য না থাকিলেও একপ্রকার ভাবাবেশের ঐক্য থাকে, মনঃপ্রধান ষ্টাইলে রচনা যেমন একটি সুপরিস্ফুট আকার লাভ করে, এইরূপ দিব্যানুভূতি-প্রসূত কবিতায় তেমনই যেন একটি বর্ণ ও সৌরভমাত্র আমাদের চিত্তে রসোদ্রেক করে।

ভাষার আর্ট বা কলানৈপুণ্যের কথা বলিতেছিলাম। সাহিত্য-শিল্পীর প্রধান গুণ—সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জন। প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ কবি Schiller বলেন—'The artist is known by what he omits অর্থাৎ', রচনা-নৈপুণ্যের একমাত্র প্রমাণ, লেখক কতখানি বলিয়াছেন তাহা নয়, কতখানি বলেন নাই। ইহাতে লেখার ব্যঞ্জনা-গুণ বৃদ্ধি পায়, ভাব-অর্থের সীমা ছাড়াইয়া যায়। যাহা-কিছু অতিরিক্ত তাহারই নাম অলঙ্কার, যাহা অত্যাবশ্যক তাহা আর অলঙ্কার নহে। রচনার ভাষায় ভাব-অর্থের অতিরিক্ত প্রসাধন যদি কিছু থাকে তবে তাহা অলস-প্রকৃতি পাঠকের মনকে বিশ্রাম দেয় মাত্র—বিষয় হইতে বার বার অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগের প্রমোদ-পিপাসা চরিতার্থ করে। এই অলঙ্কার সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে; অলঙ্কার যেমন নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করা যায়, তেমনই প্রচলিত ভাষায় বহু অলঙ্কার লুকাইয়া থাকে—সতর্ক শিল্পী সেগুলিকে সযত্নে পরিহার করিবেন—রঙ্গীন কাচকে সাদা কাচ বলিয়া ভ্রম না করেন। প্রত্যেক বাক্যের অব্যর্থ প্রয়োগ না হইলে তাহার গৌরবহানি হয়, এবং রচনার truth ও fineness ক্ষুণ্ণ হয়।

শব্দ-প্রয়োগ ও বাক্য-যোজনার আর্ট সাহিত্য-শিল্পীর পক্ষে কতখানি সাধনার বস্তু, বাক্যকে ভাবের অবিকল প্রতিরূপ করিবার যে ষ্টাইল-নিষ্ঠা তাহার একটা দৃষ্টান্ত—বিখ্যাত ফরাসী লেখক Gustave Flaubert-এর বাণী-সাধনা। ইনি সাহিত্যসৃষ্টিতে ভাষার যে সাধনা করিতেন, তাহাতে মাত্রাধিক্য ছিল বলিয়া মনে হইলেও, তদ্দ্বারা ষ্টাইল-তত্ত্ব বুঝাইবার একটু সুবিধা হইবে। গুস্তাভ ফ্লোবেয়ারের মতে—"There are no beautiful thoughts without beautiful forms and conversely"; অর্থাৎ ভাব-মাত্রেরই রূপ আছে, তেমনই রূপমাত্রেরই একটা ভাব আছে; কিন্তু ভাবের রূপ আছে বলিলেই ঠিক বলা হইবে না, ঐ রূপ যাহার যাহা—তাহা একেবারে

তৎসদৃশ, অতএব একটিমাত্র; সেই এক ভাবের একমাত্র রূপকে আবিষ্কার করাই সাহিত্যশিল্পীর ইষ্ট-সাধনা। আগে সেই ভাবকে লেখক সম্পূর্ণরূপে আত্মগোচর করিবেন, পরে তাঁহার অভিপ্রায় হইবে—"I want you to see precisely what I see।" এই সকল কথা পুনরুক্তি হইলেও—শিল্পকর্ম্ম-হিসাবেও ষ্টাইলের মূল-তত্ত্ব যে এক, তাহাই বুঝাইবার জন্য আমি একজন বিখ্যাত সাহিত্য-শিল্পীর সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিলাম। ফ্লোবেয়ার বলেন, রচনার মধ্যে লেখকের প্রাণপণ চেষ্টার পরিচয় থাকুক অথবা তাহা অবলীলাকৃত মনে হউক—ঐরূপ সিদ্ধিলাভই ষ্টাইলের সর্ব্বস্ব।

গদ্য ও পদ্যের আপেক্ষিক মূল্য বা উপযোগিতা সম্বন্ধে, এই কয়েকটি কথাও অনুধাবনযোগ্য। গদ্যই আধুনিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রীতি। আধুনিক মনের ভাব-বিস্তার অশেষ বৈচিত্র্যকে ছন্দোবদ্ধ করা যায় না; কাব্যের পক্ষে যে সংযম প্রয়োজন, ভাবের যে একাগ্রতা বা একমুখীনতার প্রয়োজন, এই বৈচিত্র্যের মধ্যে তাহা রক্ষা করা অসম্ভব। সুরের দ্বারা যেমন প্রাণের সকল তারগুলিকে আয়ত্ত করা যায়, এক্ষণে ভাষার দ্বারা তেমনই মনের সকল ভাবকে সহজ ও যথাযথরূপে প্রকাশ করা সাহিত্য-কলার পক্ষে প্রয়োজন হইয়াছে। সঙ্গীত-কলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলা এইজন্য যে, তাহাতে শব্দ ও অর্থের বিরোধ-সমস্যা নাই, ভাব একেবারে ধ্বনি-রূপ ধারণ করিয়াছে—অপর কিছুর মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় না। আধুনিক জীবনের নিত্যনূতন অপরিসীম চিন্তা-রাজিকে ভাষায় এই অন্বর্থ রূপ দেওয়া গদ্যেই সম্ভব হইয়াছে, কাব্য-কলার গণ্ডীর মধ্যে তাহা সম্ভব নয়, তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর সকল কবিতাই এত অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল। সঙ্গীতে যেমন ধ্বনির মধ্যে ভাব অপরোক্ষ হয়, তেমনই সাহিত্যেও শব্দ ও অর্থের কেবল হরগৌরী-মিলন হইলেই চলিবে না, একেবারে এক হইয়া যাওয়া চাই। মনের মধ্যে যেমন ভাবের ভিড় লাগিয়া গিয়াছে, তেমনই ভাষায় তাহার প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি চাই; ইহার জন্য পদ্য অপেক্ষা গদ্যই অধিকতর উপযোগী; কারণ, ভাষার বাঁশিখানিকে অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত হইতে হইবে—বিবৃতি, বিশ্লেষণ, পর্য্যবেক্ষণ, ধ্যান, আবেগ, আবেদন—ভাষা হইতে সকল সুরই আদায় করিতে হইবে।

ষ্টাইল সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ কথা এই যে, ভাব ও ভাষার পূর্ণ-সাযুজ্যই ষ্টাইল বটে, এবং যে রচনায় ইহা ঘটিয়াছে তাহা সাহিত্যকলা-সম্মত রসসৃষ্টি বটে,

কিন্তু সেইজন্য সকল রচনাই সমান শ্রেষ্ঠ নয়। ভাবের যথাযথ প্রকাশ Good Art বা রস-রচনা বটে, কিন্তু Great Art হইতে হইলে ভাব-কল্পনার বিশিষ্ট গৌরব চাই। মানবহৃদয়-বিশ্বের ব্যাপ্তি ও গভীরতা যাহার মধ্যে যতখানি প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে—Mind এবং Soul, উভয়ই যাহার ষ্টাইল পুষ্ট করিয়াছে, যে রচনায় অতিশয় জটিল বিষয়-বিস্তার যেমন সুসম্বদ্ধ আকারে পরিণত হইয়াছে, তেমনই colour ও mystic perfume বাদ পড়ে নাই, এবং যাহার মধ্যে soul of humanity, বিশ্ব-মানবের প্রাণ-স্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসসৃষ্টি, তাহাই Great Art—অতএব তাহাই শ্রেষ্ঠ ষ্টাইল।

নাটকীয় কথা

নাটক সম্বন্ধে আমাদের সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত বিশেষ আলোচনা হয় নাই। বাংলা রঙ্গমঞ্চের আবির্ভাব ও তাহার প্রতিষ্ঠান কাহিনী, এবং প্রথম যুগের নাট্যকারগণের নাট্যরচনা-প্রয়াসের কথা অল্প-বিস্তর লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সে আলোচনার ঐতিহাসিক মূল্যই অধিক; সেই সঙ্গে নাটকীয় প্রতিভার যে বিচার-বিশ্লেষণ থাকে তাহা খোল-করতাল সহযোগে একরূপ কীর্ত্তন বলিলেই হয়। অথচ, বাংলা সাহিত্যে না হউক—বাংলা রঙ্গমঞ্চে নাটকের প্রতিপত্তি এখনও অক্ষুণ্ণ আছে; নাটকের আকৃতি-প্রকৃতি ও অভিনয়কলায় নবত্বের লক্ষণও দেখা দিয়াছে। কিন্তু সাহিত্যিক রসসৃষ্টি হিসাবেও নাটকের একটা বড় মূল্য আছে,—নাট্যকারের প্রতিভাও একটা বড় কবি-প্রতিভা; এজন্য নাটকের রসবিচার কোন্ আদর্শে করিতে হইবে সে বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা যে এখনও আমাদের মধ্যে জন্মে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। আমি এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ নাটকীয় রসতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব, এবং প্রসঙ্গত আমাদের নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বলিব।

*　　　*　　　*

নাটক সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম কথা এই যে, ইহা উপন্যাস বা কাব্যের মত একা একা ঘরে বসিয়া উপভোগ করিবার বস্তু নয়; যিনি নাটক রচনা করেন তিনিও, কবি বা ঔপন্যাসিকের মত, স্বকীয় কল্পনা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না; কারণ, নাটকের রস-পরিণাম ঘটাইতে হইলে দর্শকমণ্ডলীর সহযোগিতা চাই; নাট্যকার, অভিনেতা ও দর্শক এই তিনে মিলিয়া নাট্যরস সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং তিনের মধ্যে দর্শক-চিত্তের আকর্ষণ-বিকর্ষণই নাটকের সব চেয়ে বড় নিয়ন্তা। এইখানেই কবিকেও মনুষ্যসাধারণের সঙ্গে একাসনে বসিতে হয়—ব্যক্তি-মানসের উৎকৃষ্ট ভাব, উৎকৃষ্ট চিন্তা বা ঋষি-সুলভ দিব্য-দৃষ্টির অভিমান ত্যাগ করিতে হয়; আর্টের ডিমোক্রেসী যদি কোথাও থাকে তবে সে এইখানে। যে-নাটক রঙ্গালয়ে দৃশ্যরূপে বহুজনের চিত্ত হরণ করিতে পারে না, তাহা নাটকই নয়—কেবল সাহিত্যিক রচনাহিসাবে তাহার যে মূল্যই থাকুক।

আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে যে নাটক ছিল, আধুনিক নাটক তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু—আমি সংস্কৃত নাটকের কথা বলিতেছি। সেখানে

"আপরিতোষাৎ বিদুষাম্" নাট্যাভিনয় সার্থক বলিয়া বিবেচিত হইত না; যে 'সহৃদয় সামাজিকবর্গ' তাহা উপভোগ করিতেন, তাঁহারা ছিলেন চিত্তপ্রকর্ষবান রসিকমণ্ডলী; এবং সম্ভবতঃ হিন্দু নাট্যশালা ঠিক আধুনিক রঙ্গালয়ের মত সাধারণের রঙ্গালয় ছিল না; রাজ-অন্তঃপুরের চিত্রশালাতেই অধিকাংশ নাটকের অভিনয় হইত। অতএব সে নাটক ছিল বিশেষভাবে অ্যারিষ্টোক্র্যাটিক; প্রাচীন য়ুরোপীয় নাটকের মত তাহা সর্ব্বজনসেব্য ছিল না। ভারতবর্ষে নাটকের তেমন প্রসার ঘটে নাই এবং তাহার ধারাও নিরবচ্ছিন্ন হয় নাই, বোধহয় এই কারণেই। ইহারও মূলে আছে ভারতীয় সাধারণ বিশিষ্ট প্রকৃতি। ভারতীয় আদর্শের কাব্য-নাটক প্রভৃতিতে 'রস'ই ছিল মুখ্য, মানুষের জগৎ ছিল গৌণ। মানুষেরই যে সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সর্ব্বমানুষের মধ্যে সংস্কাররূপে বিরাজমান—মানুষের সেই জীবনকে, তাহার সেই রক্তমাংসঘটিত হৃদয়সংবেদনাকে গৌণ করিয়া, সে নাটকে একটি নির্ব্বিশেষ 'রস'-বস্তুরই দিকেই দৃষ্টি রাখা হইত। য়ুরোপে তাহা হয় নাই—সেখানকার প্রকৃতি-উপাসক জাতিদের পিপাসা ছিল অন্যরূপ; তাহারা প্রাকৃত মানবজীবনকেই নাটকের দৃশ্য করিয়াছিল, সুন্দর-বোধের অপরবিধ সাধনায় মনকে বা Intellect-কে যতই প্রাধান্য দিক, নাট্যকলায় তাহারা মানুষের জীবনের এই রসস্তকেই রসবস্তু করিয়াছিল। তাহার যে রস, সে রসের একমাত্র প্রমাণ যে, মানুষ-মাত্রেই তাহাকে সাড়া দিবে—অন্ততঃ এক যুগের এক সমাজের সকল মানুষই সেই নাটকের অভিনয়দর্শনকালে নিজেরাও অন্তরে অন্তরে সেই অভিনয়ে যোগ দিবে; সেই যোগদানে যদি বাধা ঘটে তবে সেই নাটক যথার্থ নাটক হয় নাই। আধুনিক কালে য়ুরোপেও নাটকের সে রসপ্রমাণ আর নাই—এখন জীবনে দেহ অপেক্ষা মনই প্রাধান্য লাভ করায়, সে নাটক প্রকৃত জীবন-কাব্য—অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টির পর্য্যায়ভুক্ত নহে; প্রাচীন ক্ল্যাসিক্যাল ও পরবর্ত্তী কালের রোমান্টিক নাটকের কল্পনা-গৌরব তাহাতে আর নাই। তথাপি অভিনয়-সাফল্যের প্রয়োজনে তাহাকেও কোন না কোন দিক দিয়া বহুজনচিত্তের সহিত যোগ রক্ষা করিতে হয়—তাহারই কৌশল যিনি আয়ত্ত করিতে পারেন তিনিই নাটক রচনা করিয়া সাময়িক খ্যাতিলাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু তেমন নাটক স্থায়ী সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় না।

আমাদের দেশের প্রাচীন নাটকে যে রসকে দৃশ্য-কাব্যের আকারে রূপ দিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা প্রাকৃতজনসেব্য নয়। পরবর্ত্তী কালে প্রাকৃত সমাজের প্রাকৃত রসপিপাসা মিটাইবার জন্য প্রাকৃত ভাষায় যে ধরণের নাট্য-লীলার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা যেমন খাঁটি নাটক হইতে পারে নাই, তেমনই সেই প্রাচীন দৃশ্যকাব্যের আদর্শে নাটকাভিনয়ও বহুকাল পূর্ব্বে একরূপ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তারপর, যখন য়ুরোপীয় নাটকের অনুকরণে নাটক-অভিনয়ের সূত্রপাত হইল, তখন যে বস্তু বিশেষ করিয়া চমক লাগাইয়াছিল, তাহা একটা বহিরঙ্গঘটিত ব্যাপার। নাটক-রচনার যে আভ্যন্তরীণ প্রেরণা, তাহার নিতান্ত অভাব সত্ত্বেও—প্রকৃত নাট্যরস কি, সে বিষয়ে কিছুমাত্র চেতনা জন্মিবার পূর্ব্বেই—রঙ্গমঞ্চ, সাজসজ্জা ও বক্তৃতাই যে সেকালের নাগরিক বাঙালী সমাজকে উতলা করিয়াছিল, তাহার প্রামাণ—বাংলা নাটকের অভাবে সংস্কৃত নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া তাহারই অভিনয় করিতে আমাদের বাধে নাই। আধুনিক বাংলা নাটকের উৎপত্তিও যেমন, তাহার বিকাশের ইতিহাসও তেমনই অনুধাবনযোগ্য। জাতির রস-সংস্কারের অনুকূল নয় বলিয়া, এবং বিলাতী ধরণের রঙ্গমঞ্চ-স্থাপন আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপযোগী নয় বলিয়া, এই বিলাতী বহিরঙ্গকে বজায় রাখিয়া নাটকের উন্নতিসাধন বড়ই বিঘ্নসঙ্কুল হইয়াছিল। ধনীর প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সখের নাট্যাভিনয় একটা প্রমোদমাত্র—নাটক হিসাবে তাহা প্রাণহীন; কারণ সে নাটকের অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চপ্রবাহী রসধারা সর্ব্বজনহৃদয়াভিমুখী হইবার উপায়ও ছিল না—আবশ্যকতাও ছিল না; অতএব তাহা জাতির চিত্ত-সাগর-সঙ্গমে মিলিত হইয়া নাটকের রসপ্রেরণাকে সার্থক করিয়া তুলিত না; প্রায় পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চ এমনই একটা বিড়ম্বনার মত, একটা ক্ষুদ্র নাগরিক সমাজের ব্যর্থ প্রমোদ-পিপাসার নিদর্শন-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ওদিকে তখন গ্রামে গ্রামে বাঙালীর খাঁটি বাঙালী-প্রাণ উন্মুক্ত আকাশতলে শামিয়ানা খাটাইয়া ইতর-ভদ্রের বিরাট আসর জমাইয়া সারারাত্রি জাগিয়া কৃষ্ণযাত্রা ও নানা পুরাণ-প্রসঙ্গের গীতাভিনয় শুনিতেছে। সহরের বাবুরাও তাহাদের প্রতি কম আসক্ত ছিলেন না; নাটক ছিল তাঁহাদের একটা পোষাকী আমোদ মাত্র। পোষাকী কথাটা এখানে উভয় অর্থেই সত্য।

এই যে যাত্রাগান, ইহার রসপিপাসা আমাদের জাতি-দেহের মজ্জাগত। এ রস-রসিকতা ঠিক জীবন-রস-রসিকতা নয়—ইহা ভাব-রস, বাস্তববিস্মৃতি-জনিত একরূপ আত্মবিভোরতার রস; এই রসই দুর্ব্বলচরিত্র, কর্ম্মবিমুখ, অলস, কল্পনাপ্রবণ জাতির জীবনে সর্ব্বকালে সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় হইয়া আছে; বাংলাসাহিত্যে, অর্থাৎ, বাঙালীর অন্তর্জীবনের ধারাবাহিক কাহিনীতে—সেই আদিতেও যেমন, আজিকার এই অন্তেও তেমনই, এই গীতিরসই আর সকল রসকে পরাভূত করিয়া বাঙালীর চিত্তে আধিপত্য লাভ করিয়াছে। এইজন্য বাঙালী মহাকাব্য লিখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সফল হইতে পারে নাই—তাহার মজ্জাগত বৈষ্ণব ভাবাকুলতা মহাভারতের কৃষ্ণার্জ্জুন-চরিত্রকে অনন্তবীর্য্য ও অমিতবিক্রম নায়ক না করিয়া মহাভাবের ভাবুক করিয়া তুলিয়াছে, সেখানেও সেই যাত্রাগানের গীতিরস-বস্তু নূতন পোষাকে—কেবলমাত্র লম্বশাটপটাবৃত হইয়া, মহাকাব্যের আকার-প্রাংশুতা মাত্র লাভ করিয়াছে।

উৎকৃষ্ট নাটকের প্রধান লক্ষণ এই যে, নাটকের দৃশ্যবস্তু হইবে মানুষের জীবন; ভাবের বা চিন্তার জীবন নয়—নিয়ত আবর্ত্তমান, সৃষ্টিচক্রের ঘূর্ণাবেগ-তাড়িত, দেহ-মন-প্রাণের উৎক্ষেপ-আক্ষেপময়, গতি-শক্তিমান জীবন। অর্থাৎ, সৃষ্টির নিগূঢ় উৎস হইতে যে দুর্দ্ধর্ষ প্রাণধারা প্রবাহিত হইয়া বিশ্বকে একটি বিরাট কর্ম্ম-যজ্ঞশালায় পরিণত করিয়াছে—মানুষের মধ্যেও সৃষ্টির সেই প্রাণধারা যে-জীবনকে নিত্য গতিমান ও বেগবান রাখিয়াছে—সেই জীবনের রাগ-বিরাগ, আশা-দুরাশা, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য প্রভৃতির দ্বন্দ্ব যে অপূর্ব্ব রস-রূপে মানুষের হৃদয়গোচর হয়—নিজেরই দেহ-মন-প্রাণের প্রবল অথচ অবশ ঘূর্ণাস্রোতে সে চকিতে যে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে পায়, তাহা ভাবজীবনে বা মনোজীবনে সম্ভব নয়, তাহা ওই প্রবৃত্তিময় জীবনেই সম্ভব; নাটকের রস এই রহস্যের রস, তাই নাটক এই জীবনেরই দৃশ্য-রসরূপ। নাটকমাত্রেই অভিনয়াত্মক এইজন্য যে, উহার কোন অংশই চিত্র নয়, ভাব নয়, স্মৃতি বা ধ্যানের বিষয় নয়; তাহাতে সৃষ্টির সেই আদি গতিধারায় জীবন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঘটনাময় হইয়া উঠিতেছে, দেশে ও কালে বিবর্ত্তিত হইতেছে—একটা পরিণাম-মুখে দ্রুত ছুটিয়া চলিতেছে। এই অর্থে ইহা দৃশ্যমাত্র—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুভূতির যোগ্য। যখন আমরা নাটকাভিনয় দেখি—তখন জীবনের একটা

ঘটনাত্মক রূপই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; নাটকের যে Illusion, তাহা আর কিছু নয়—অভিনয়ের মধ্যে আমরাও প্রবেশ করি, সেই ঘটনার ধারায় আমরাও যেন 'ঘটিতে' থাকি। ইহাকেই বলে নাটকীয় বস্তুর 'সাধারণীকৃতি'—যাহা অপরের তাহা সকলের হইয়া উঠে, আমার চেতনা মানবসাধারণের চেতনায় এক হইয়া যায়। একযোগে সকলের সঙ্গে এই যে একই প্রকার অনুভূতি, ইহার মূলে আছে বিশুদ্ধ মানবতার প্রেরণা—সে প্রেরণা কোন বিশেষ আদর্শ, বিশেষ চিন্তা, বিশেষ মনোভাবমূলক নয়, কারণ, তাহাতে মানুষে মানুষে ভেদ আছে—ভিন্ন নীতি, ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন বিশ্বাস, ভিন্ন সংস্কার ও ভিন্ন মতের বাধা বা আবরণ আছে; সেখানে বিশুদ্ধ জীবন-চেতনা যেমন থাকে না, তেমনই ঘটনাত্মক জীবনের অবকাশ নাই—ভাবনা আছে, ভাবুকতা আছে, সংকল্প-বিকল্পের বিরোধজনিত নিষ্ক্রিয়তা আছে, নিস্তেজ প্রাণশক্তির বাদ-বিতর্ক আছে তেমন জীবন; নাটকোপযোগী, অর্থাৎ 'দৃশ্য' হইতে পারে না। এইরূপ জীবনের দৃশ্যও আধুনিক রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত হইয়া থাকে; কিন্তু সে অভিনয়ের রস দর্শকের সাক্ষাৎ জীবনানুভূতির রস নয়—তাহাতে সে জীবনকে দেখে না, কতকগুলা ভাবনা-ধারণা-চিন্তাকে 'দৃশ্য'রূপে উপভোগ করে; এবং জীবন-চেতনার পরিবর্ত্তে একরূপ মানস-উত্তেজনা মাত্র অনুভব করে।।

অতএব নাটক সার্থক হইতে হইলে তাহার উপাদান হইবে যে-জীবন সে জীবন স্থিতিশীল নয়—গতিমান, ভাবাত্মক নয়—কর্ম্মাত্মক। সৃষ্টির প্রচণ্ড গতি-প্রবাহে, সেই বিরাট ঘূর্ণাচক্রের আবর্ত্তন-মুখে, মানুষের জীবনও যে গতিবেগ লাভ করিয়াছে—এবং ঘটনাচক্রে তাহার যে অদ্ভুত বিকাশ ও পরিণাম —কেবল তাহারই রস প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়গোচর করানোই নাটকের একমাত্র কৃতিত্ব। নাটকের সহিত উপন্যাসের তুলনা করিলেই এই ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট বুঝিয়া লওয়া যাইবে। উপন্যাসে 'ঘটনা'র ধারা নাই, 'কাহিনী'র পূর্ব্ব-পর বিবৃতি আছে। সেখানে গ্রন্থকার যেমন নিজেরই ভাবনা-ধারণা ধ্যান-কল্পনার বলে এবং স্মৃতিগত অভিজ্ঞতা হইতে, জীবনের একটা রূপ গড়িয়া তোলেন; তেমনই পাঠকও আপনার মানস-মুকুরে তাহার প্রতিচ্ছায়া ধরিয়া একটা কল্পনা-রস আস্বাদন করিয়া থাকে—সে আস্বাদনে জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার অবকাশ নাই; ভাবগত রসোল্লাস আছে, প্রত্যক্ষ-দর্শনের চিত্তচমৎকার নাই। নভেলের জীবন কাহিনীগত জীবন—সে কাহিনী

'লিখিত' হইয়াছে, অর্থাৎ লেখক তাহা বলিয়া যাইতেছেন; তাহা আর ঘটিতেছে না—ঘটিয়া গিয়াছে; এবং লেখক তাহাকে নিজের ভাবদৃষ্টির দ্বারা যেমন দেখিয়াছেন, তাহার আদ্যন্তের যে অর্থ বুঝিয়াছেন, সেই মত একটা রূপ তাহাকে দিয়াছেন। আমরাও যখন তাহা পাঠ করি, তখন তাঁহার সেই ভাবনাকেই অনুসরণ করিয়া—সেই পর্দ্দার ভিতর দিয়া তাহাকে দেখি; সে পর্দ্দার সঙ্গে আমাদেরও মনের পর্দ্দার নানা রং ও নানা নক্সার যতটা সাদৃশ্য থাকে, ততটাই তাহাকে স্বীকার করি। এই স্বীকার আমরা সেই চেতনা দিয়া করি না—যে চেতনা দিয়া আমরা নাটকের জীবনকে প্রত্যক্ষ অনুভব করি। তাই যখন কোন উপন্যাসকে নাটকের আকারে অভিনয়যোগ্য করিয়া তোলা হয়, তখন প্রায় দেখা যায় যে, উপন্যাসে আমরা যাহা আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলাম—নাটকে তাহা আস্বাদন করিতে বাধা ঘটে; সেখানে জীবনকে যেরূপে না দেখিলে আমাদের সেই চেতনার উদ্রেক হয় না, সেরূপ দেখিতেছি না; ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, উপন্যাসের সেই জীবন সাক্ষাৎ-দৃশ্য জীবন নয়; তাহাতে যে গতি আছে, তাহা প্রাণের গতি নয়—মনঃকল্পিত গতি; তাহাতে যে তাপ আছে, তাহা ভাবের তাপ নয়; তাহার কাহিনীও ঘটনা নয়—কল্পনা; তাহার রসও স্বতন্ত্র। কিন্তু নাটকে জীবনের যে রূপকে দৃশ্যমান করা হয় তাহা একান্তই ঘটনাত্মক, তাহার প্রতি মুহূর্ত্তকে এক একটি ঘটনার লগ্ন বলা যাইতে পারে; সেখানে সকল কাজ, সকল কথাই সেই সেই ঘটনার লগ্নে, যেন স্ফুলিঙ্গের মত উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঘটনার সেই লগ্নগুলিই মুখ্য, তাই সেখানে কথাগুলিও বাক্যময় ঘটনামাত্র; উপন্যাসের জীবন-চিত্রে এইরূপ হইবার প্রয়োজন নাই। উপন্যাসে কাহিনী-বস্তুর নাম প্লট; নাটকে সে অর্থে কোন কাহিনী নাই—আগাগোড়াই 'action' বা ঘটনা-বস্তু। নাটকে জীবনকে এইরূপ একটা action-রূপে দেখাইতে হয়। এ যেন একটা-কিছু আপনিই আপনার অন্তর্নিহিত বেগের বশে, নিজেরই নিয়তির তাড়নায়, কোন-একটা বিন্দু হইতে সহসা উদ্ভূত হইয়া, আকাশে—অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিপথে—আগুনের রেখা টানিয়া অন্ধকার হইতে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার যে দীপ্তি তাহাও সেই বেগের দীপ্তি; যদি সে বেগ না থাকে তবে দীপ্তিও নাই, এই দীপ্তিই তাহার নাট্যরস-রূপ; এজন্য যাহাকে action-রূপে ধরা যায় না, জীবনের সেই রূপ নাটকের উপযোগী নয়।

অতএব নাটকে আমরা জীবনকে, তাহারই নিজস্ব নিয়তি-নিয়মে, কেবল-মাত্র ঘটনার মধ্য দিয়া একটা পরিণাম লাভ করিতে দেখি; সে পরিণাম আমাদের ইচ্ছানুরূপ নয়, কিন্তু আমাদের গভীরতর চেতনার অনুমোদিত। নাট্যকার জীবন সম্বন্ধে কোন মত পোষণ করেন না—তিনিও জীবনের ভাবয়িতা নহেন, দর্শক মাত্র। জীবনের বাহিরে ও ভিতরে যত সমস্যা আছে, তাহা জীবনেরই—তাঁহার মনের নয়; জীবনের মূলে কোনও ধর্ম্ম বা নীতি-সম্মত আদর্শ আছে কি না সে জিজ্ঞাসাও তাঁহার নাই; তিনি কেবল জীবনের সেই গতিরেখাটি আবিষ্কার করিয়াছেন—সৃষ্টির সেই বিরাট গতিবেগের চক্রক্ষুণ্ণ রেখায়, মানবজীবন যেভাবে যে মুখে আবর্ত্তিত বা বিবর্ত্তিত হইতেছে, তিনি তাহারই রহস্য কেবল অনুভব করেন; বিচার করেন না, চিন্তা করেন না—অপরোক্ষ করেন। এই যে দর্শন, ইহা যত গভীর ও ব্যাপক হয়, ততই নাটকে সেই দৃশ্যরস গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠে। তখন নাটক আর শুধুই দৃশ্য-কাব্য নয়—উচ্চতর কাব্যের পদবীতে আরোহণ করে। এইরূপ কাব্যগুণাশ্রিত নাটক জগতের সাহিত্যে অল্পই আছে, এবং এইজন্য সেক্সপীয়র আজিও জগতের শ্রেষ্ঠ কবি।

কিন্তু নাট্যকারও এমন কবি হইয়া উঠেন কোন্ গুণে? এক কথায় বলিতে হইলে—জীবনকে অতিশয় বিশুদ্ধ ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে দেখিতে পারার গুণে; সে দেখায় এমন একটা অনুভূতির উদয় হয়—যাহা একাধারে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ রসিকতা। আমাদের দেশের দার্শনিক ভাষায় ইহাকেই সৎ-চিৎ-আনন্দ বলে। জীবনের সেই 'সৎ' অর্থাৎ তাহার অন্তঃস্রোতের সেই খাঁটি 'অস্তি'-স্বরূপটির অখণ্ড অপরোক্ষ দর্শন যখন হয়, তখন তাহারই সঙ্গে সঙ্গে যে বোধ এবং রসাস্বাদ অবশ্যম্ভাবী-রূপে উদ্রিক্ত হয়, তাহার তুল্য অনুভূতি মানুষের চেতনায় আর নাই। ঐ যে খাঁটি দৃশ্য-রূপ (দর্শকের ভাব, ভাবনা, চিন্তা প্রভৃতির সর্ব্বপ্রলেপ মুক্ত) তাহারই দ্রষ্টা বা সাক্ষি-মাত্র হইয়া আমরা তখন যে মুক্তি অনুভব করি তাহা হইতেই পরম রসাস্বাদ হইয়া থাকে; কারণ, জীবনকে যত প্রত্যক্ষ ও গভীরভাবে উপলব্ধি করি ততই আত্মচৈতন্য প্রবুদ্ধ হয়, আবার সেই প্রবুদ্ধ চৈতন্যই জীবনকে একটা লীলারূপে আস্বাদন করে। ইহাই প্রকৃত রসাস্বাদ; এই রসাস্বাদের জন্যই নাটকে জীবনকে বাস্তবের ক্ষেত্র হইতে রঙ্গমঞ্চে তুলিয়া তাহাকে একটা আভিনয়িক রূপ দেওয়া

হয়। তখন বাস্তব প্রয়োজন বা স্বার্থঘটিত সকল সংস্কারমুক্ত হইয়া, আমরা আমাদেরই সহজ ও সুগভীর মানবতার চেতনায়—চিন্তাহীন, তর্কসংশয়হীন অকুণ্ঠিত অবাধ জীবনাবেগকেই অনুভব করি: যে সুখ-দুঃখ, ভয়-ভাবনা, পাপ-পুণ্যবোধ বাস্তবের অর্থাৎ জাগর-চেতনার কঠিন বন্ধনে আমাদিগকে এত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া থাকে, তাহারা তখন এমন একটি রূপ পরিগ্রহ করে যে, মনে হয়, আমরা তাহাদের দাস নই, তাহারাই আমাদের দাস। তথাপি ইহা 'বেদান্তরস্পর্শশূন্য নয়। ইহার আদিতেও যেমন, অন্তেও তেমনই, জীবনের অনুভূতি আছে—সেই জীবন মানবীয় জীবন; মানুষের চরিত্র, মানুষের নিয়তিই সেই জীবনের মূল গ্রন্থি। তাই নাট্যকার যখন আমাদের সেই জীবনানুভূতিকে নাটকের সাহায্যে এমন সম্পূর্ণ, এমন অপরোক্ষ করিয়া তোলেন, তখন তাঁহার মত কবি কে? মানুষের জীবনেই—তাহার দেহমন-প্রাণের বৃন্তটির উপরে—সৃষ্টির শতদল পরাগ-মধুতে ভরিয়া উঠে; যে পদ্মের চারিপাশে অপর কবিগণ ভ্রমরের মত গাতিগুঞ্জন করিয়া থাকেন, সেই পদ্মই শ্রেষ্ঠ নাট্যকবির প্রতিভায় নাটকরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া মধু ও মধুপের—গীতি ও গুঞ্জনের—অচিন্ত্যভেদাভেদ একই কালে আমাদের চিত্তগোচর করে; কারণ, তখন আমরাই পদ্ম, আমরাই মধু, আমরাই ভ্রমর হইয়া থাকি; অদ্বৈতের এই দ্বৈত-বিলাসই শ্রেষ্ঠ কাব্যরস; একদা এই কথাটাই আমি নিম্নোদ্ধৃত কবিতা পংক্তিগুলিতে বলিতে চাহিয়াছিলাম—

> মধু সৌরভ—সৌরভ-মধু! মধু আর শুধু মধু!
> আপনার প্রাণ দুইখান হ'য়ে—হল বর, হল বধূ।
> একখানি তার ফুলের মতন ছড়াইল চারিদিকে,
> আরখানি তার প্রজাপতি হ'য়ে বুক দিল ফুলটিকে!
> পাপ্‌ড়ি কি পাখা—চেনা নাহি যায়, কার মধু কার মুখ!
> নাহি গুঞ্জন, শুধু ভুঞ্জন—সুধাপান—শুধু সুখ।
>
> ('আঁধারের লেখা—স্বপন-পসারী')।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি উক্তি উদ্ধৃত করিব। জীবনের সর্ব্ব দ্বন্দ্ব, সকল বিরোধ, বৈষম্য ও নিষ্ফলতার উপরে মানুষের অন্তরের যে দিব্যদৃষ্টি জয়ী হইয়া থাকে, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন আধুনিক ইংরাজ মনীষী বিলাতী নাটকের শ্রেষ্ঠ রসরূপ—'ট্রাজেডি'র উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

"Of the arts tragedy is the proudest, the most triumphant, for it builds its shining citadel in the very centre of the enemy's country...within its very wall the free life continues while the legions of pain and despair, and all the servile captains of tyrant fate afford the builders of that dauntless city new spectacles of beauty. Happy those sacred ramparts, thrice happy the dwellers on that all-seeing eminence".

নাটক সম্বন্ধে এই যাহা বলিলাম, ইহা আরও নিতান্ত তত্ত্বকথার মত হইলেও অর্থাৎ নাটক-সৃষ্টি ও নাটক উপভোগ—নাট্যকার ও দর্শক—এই দুইয়ের যে সম্বন্ধ বা সহযোগ, সাক্ষাৎভাবে তাহার বিচার এইরূপ আলোচনার দ্বারা সম্ভব না হইলেও—আমি এই প্রসঙ্গের অবকাশে নাটকীয় তত্ত্বেরও একটু ইঙ্গিত দিবার চেষ্টা করিয়াছি; কারণ ইহা হইতে নাটকের আদর্শ কি, তাহার প্রেরণা কত গভীর হইতে পারে, তাহার সেই রস-প্রেরণা আমাদের চিত্তের কোন্ তলদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে, তাহার একটু ধারণা করা সম্ভব হইবে। এবং সেই ধারণা হইতে নাটকের ন্যূনতম সাফল্য কিসের উপর কতটুকু নির্ভর করে তাহা বুঝিবার সুবিধা হইবে। আরও কারণ এই যে, আধুনিক কালে নাটকের নানা-রূপ ও নানা-আদর্শ দেখা দিয়াছে—কাব্যে, উপন্যাসে, চিত্রকলায় যেমন, তেমনই নাটকের রস-সৃষ্টিতেও এখন ভিন্নতর পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; এজন্য নাটকের সংজ্ঞাও নানাপ্রকার হইতে বাধ্য—নাটক নামটি সর্ব্বনামের মত ব্যবহার করাও যেন আর চলে না। অতএব আমি নাট্যরসের বিচারে একটা মূলতত্ত্বের আশ্রয় লইয়াছি—যাহাতে রূপ-ভেদ ও সংজ্ঞা-ভেদ সত্ত্বেও, সর্ব্বত্র উৎকর্ষের আদি প্রমাণটি হারাইয়া না যায়। তত্ত্ব-আলোচনার আরও প্রয়োজন এই যে, আধুনিক মানুষের রুচি ও রসবোধ—জীবন সম্বন্ধে নূতন বৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রভাবে এমনই ভিন্নমুখী হইয়াছে যে, আমি নাটকের যে আদর্শকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি—তাহাকে অনেকেই হয়ত স্বীকার করিবেন না। তা ছাড়া, আরও বিপদ আছে; একালে 'ইণ্টেলেক্‌চুয়েল'গণ 'ডায়া-লেকটিক'-বর্জ্জিত কোন বিচারকে শ্রদ্ধা করেন না; কাব্য, নাটক,

উপন্যাসের রসবিচারেও 'ডায়ালেকটিক' মান্য করা চাই—নতুবা, আদিম সংস্কার অথবা ফ্যাসি-মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হইবে। তাঁহাদের মতে জড়তত্ত্বই জগতের মূলতত্ত্ব, অধ্যাত্ম বা অধিভূত বলিয়া কিছু নাই; প্রাণ ও মন দুইই জড়তত্ত্বের অধীন; ভাব বলিয়া স্বতন্ত্র স্বাধীন কিছু নাই—বস্তুই প্রভু। এহেন দিব্যদৃষ্টিতে জীবনের যে মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকে নাট্যীকৃত করিলে নাটকের রূপ-রস অবশ্য বিপরীত হইতে বাধ্য। এইজন্য আমি একটা মূলতত্ত্বের আশ্রয় লইয়াছি; তাহাতে আশা হয়, নাটকের রূপভেদ যেমনই হউক, তাহার কোন্ রূপটিতে মানবচিত্তের গভীরতম উৎকণ্ঠার তৃপ্তি-সম্ভাবনা আছে—যাহারা কেবলমাত্র মানুষ, কোনরূপ মতবাদের চিন্তা-যন্ত্র নয়, তাহারা আত্মচিত্ত প্রমাণেই তাহা স্থির করিয়া লইবে।

কিন্তু সে কথা এখন এই পর্য্যন্ত। উপস্থিত প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য প্রশ্ন ছিল—সার্থক-নাটক ভিতরে ও বাহিরে কোন্‌রূপ উপকরণের উপরে নির্ভর করে? ভিতরের কথা বলিতে গিয়া আমি তত্ত্বের গহনে প্রবেশ করিয়াছিলাম; এক্ষণে তাহার সকল জটিলতা ত্যাগ করিয়া শুধু ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, মানুষের জীবনই হইবে নাটকের আশ্রয়বস্তু, এবং জীবন বলিতে—মানুষের দেহমনঃ-প্রাণের সকল আকূতি, উৎকণ্ঠা ও প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ কার্য্যকারণ-ঘটিত যে নিরন্তর উত্তেজনা ও তাহারই ঘাত-প্রতিঘাতে কর্ম্মরূপেই তাহার যে অভিব্যক্তি—তাহাই বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ, সেই জীবন—যাহাতে তাহার চরিত্র ও সেই চরিত্রগত নিয়তিই মুখ্য। 'চরিত্র' কথাটি আমরা এক্ষণে যে অর্থে ব্যবহার করি তাহাতেও গোল আছে। খাঁটি হিন্দু-দর্শনের ভাষায় চরিত্রকে সেই মনোদেহ বা সূক্ষ্মশরীর বলা যাইতে পারে, যাহা জন্মান্তরীণ কর্ম্মের দ্বারা গঠিত হইয়াছে—যাহা নিজেদের অনুরূপ একটা ভোগায়তন স্থূলদেহ ধারণ করে। এই চরিত্রই তাহার স্ব-প্রকৃতি—যাহাকে সে লঙ্ঘন করিতে পারে না, যাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—Character is Fate", বা —

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥

পাশ্চাত্য মনীষীও এই প্রকৃতিকেই মনুষ্যের জীবনের প্রকৃত নিয়ন্তা বলিয়া, Reason বা বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিকে তাহার নিম্নে স্থান দিয়াছেন। আমাদের পক্ষে 'চরিত্র' অর্থে এইটুকু মাত্র বুঝিলেই চলিবে যে, মানুষের সকল

প্রবৃত্তির মিলিত একটি যে ব্যক্তি-সত্তা ভিতরে বিদ্যমান থাকিয়া বাহিরেও একটি অনিবার্য্য কর্ম্মধারায় তাহার জীবনরূপে প্রকাশিত হইয়া চলিয়াছে তাহাই মানুষের চরিত্র। মানুষের চরিত্র নির্ণয় করিতে হইলে, তাহার মস্তিষ্কজাত যাবতীয় বুজরুকী, তাহার আত্মগোপনের যত প্রকার সামাজিক পোষাক পরিচ্ছদ, অথবা তাহার প্রাণশক্তিহীন মনোবিকারের যত লক্ষণ —সেগুলিকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে হইবে। সে যাহা বলে তাহা নয়—যাহা করে তাহাই তাহার চরিত্রের পরিচয়। কারণ তাঁহাই তাহার সেই চারিত্রিক প্রবৃত্তি; এবং ভাল করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে—যে-চিন্তা, যে-নীতি, বা যে-মতবাদের দোহাই সে দেয়, তাহার মূলে কোন আত্মনিরপেক্ষ সত্যের উপাসনা নাই; নিজের প্রবৃত্তি অনুসারেই সে একটার পক্ষপাতী ও অপরটার বিরোধী হয়; অথবা সেই নীতি তাহার একটা মুখোস মাত্র। তাই নাটকে এইরূপ মতের মতহিসাবে কোন পৃথক মূল্য নাই; চরিত্রগত একটা লক্ষণ হিসাবেই তা মূল্যবান—সেও তাহার 'প্রকৃতি'রই একটা চেষ্টা।

অতএব নাটকের বিষয়ীভূত সেই যে জীবন, তাহার গতিচক্রে এই চরিত্রই আবর্ত্তিত হইয়া শিখায় ও স্ফুলিঙ্গমালায় মানুষের নিয়তিকে নিরতিশয় দৃষ্টিগোচর করিয়া তোলে। 'নিয়তি' অর্থে শুধুই ঘটনার শৃঙ্খল নয়; তাহাদের মধ্যে যে অনিবার্য্য পরিণামমুখিতার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়, এবং সর্ব্বশেষে তাহার একটা অর্থ আমাদের চিত্তে প্রকাশ পায়—তাহাতেই মানবজীবনের অন্তরালে একটা অলক্ষ্য বা অদৃষ্ট-শক্তির লীলা আমরা হৃদয়ঙ্গম করি। সে যে কি, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না; সে একটা অনুভূতি মাত্র; কিন্তু তাহাই আমাদিগকে আশ্বস্ত করে—তাই রসোদ্রেক হয়। নাটক-বিশেষের পরিণাম যেমনই হউক—হাস্যোদ্দীপক তুচ্ছতা বা শ্রদ্ধাজনক মহত্ত্ব, আশানুরূপ সফলতা বা হৃদয়বিদারক নিষ্ফলতা—পরিণাম যেমনই হউক, সকলের মধ্যেই সেই এক অনুভূতির বীজ বিদ্যমান—জীবনের গতি ও নিয়তির একটা রহস্যবোধ। এই বোধটি জাগাইবার জন্যই নাটকের ঘটনাবলী একটা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে সমান সুসম্বদ্ধ—আদ্যন্ত-যুক্ত অর্থাৎ সমাপ্তিসম্পন্ন হইবে; আরম্ভের মধ্যেই যাহার বীজ ছিল—যাহা ঘটনাপরম্পরারূপে অনিবার্য্যবেগে বিকাশ হইয়া চলিতেছিল, তাহার সেই বেগ নিঃশেষ হইবার কালে, আরম্ভ ও পরিণতিকে যেন একটি মুহূর্ত্তে মিলাইয়া এক করিয়া দিবে। এজন্য, কেবল কতকগুলি ঘটনার

সমাবেশই নাটক নয়; তাহা আমাদের চিত্তে কতকগুলি খণ্ড খণ্ড সাড়া জাগায় মাত্র; তাহাতে জীবনের সেই অখণ্ড রহস্যের অনুভূতি নাই। তাহাতে জীবনের সঙ্গে সৃষ্টিবিধানের যোগসূত্র দৃষ্টিগোচর হয় না; যে-নিয়তি বা অদৃষ্ট নাটকেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা অদৃষ্টই থাকিয়া যায়। এই যে আদ্যন্তযুক্ত আরম্ভ-পরিণামী ঘটনার ধারা, ইহাই নাটকের ঘটনাবলীর সমষ্টিগত action; এই action-এর ছাঁচে ফেলিতে না পারিলে জীবনকে নাট্যীকৃত করা যায় না।

এতক্ষণে বোধহয় বুঝিতে পারা গিয়াছে—জীবনকে কোন্ রূপে দেখানো নাটকেই সম্ভব, এবং দেখাইতে না পারিলে নাটক সার্থক হয় না। এই যে দেখানো—ইহারই বা অর্থ কি? যাহা দেখানো হইবে ও যে দেখিবে—দৃশ্য ও দ্রষ্টা, এই দুইয়ের, অর্থাৎ সাক্ষ্য ও সাক্ষীর মধ্যে যে সাক্ষাৎকার, তাহা যত অব্যবহিত হইবে, নাটক ততই জীবনায়িত হইয়া উঠিবে। যাহা দেখিতেছি তাহা ভাবনা, চিন্তা নয়, তাহা একটা গতিমান বস্তু; যেন বস্তুও নয়—নিছক গতি; বস্তুকে দূর হইতেও দেখা যায়, মনের দ্বারা তাহার একটা ধারণা করা যায়; কিন্তু যাহা গতিমাত্র—প্রাণবেগের গতি, তাহাকে দেখার অর্থ তাহার সহিত প্রাণে যুক্ত হওয়া—সেই গতিতে নিজেও যেন গতিশীল হওয়া। দৃশ্য ও দ্রষ্টার মধ্যে এই যে ব্যবধানের লোপ, নাটকাভিনয়কালে ইহাই হওয়া চাই—নতুবা নাটকের নাট্যরূপ সার্থক হইবে না। নাট্যকার 'দেখাইবেন', দর্শক 'দেখিবে'—উভয়ের মধ্যে একটা স্পষ্ট সহযোগিতা রহিয়াছে। এ যেন সেই—"একাকী গায়কের নহে ত' গান, গাহিতে হবে দুইজনে।" কিন্তু তাই কি? অর্থাৎ নাটকের সেই সার্থক রসরূপের জন্য দুই পক্ষই কি সমান দায়ী? এই প্রশ্ন একটি বড় প্রশ্ন, ইহার ভালরূপ মীমাংসা আবশ্যক। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাতে একটা কথা সহজেই স্পষ্ট হইয়া উঠে—সে কথা এই যে, নাট্যরস-আস্বাদনের জন্য দর্শকের কোন বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষা বা চিত্তপ্রকর্ষের প্রয়োজন নাই; তাহাতে যে বস্তুর সাড়া জাগে, তাহা শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পণ্ডিত-মূর্খ নির্ব্বিশেষে মানুষমাত্রের অন্তঃকরণে নিহিত আছে—তাহা মানুষের স্বপ্রকৃতি-গত। এজন্য নাটক কোন পণ্ডিত বা রসিক বা মার্জ্জিতরুচি ও সুশিক্ষিত দর্শকের জন্যই নয়—মানুষ মাত্রেরই উপভোগ্য; শুধু তাহাই নয়—পণ্ডিত-মূর্খ সকলেরই একত্রে একযোগে উপভোগ্য; নাটকের সেই দৃশ্যবস্তুকে

দেখিবার জন্য কোন পুঁথিগত পাণ্ডিত্য অথবা বিশিষ্ট রুচি কিংবা বিশেষ কোন ভাবুকতা-শক্তির প্রয়োজন হয় না—কোনও মতবাদ বা তন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হয় না। অতএব সে পক্ষে নাট্যকার বা অভিনেতার কোন আশঙ্কার কারণ নাই; সেই সাড়া জাগাইতে হইলে তাহার নিজেরই কৃতিত্ব চাই—যেখানে তাহা জাগে না, সেখানে দর্শকমণ্ডলী দায়ী নয়। কিন্তু মীমাংসা এত সহজ নয়; কারণ, দর্শকমণ্ডলীর চিত্তহরণ করিতে পারিলেই নাটক যে উৎকৃষ্ট নাটক না হইতেও পারে, তাহাও আমরা জানি; সেখানে নাট্যকার নয়, দর্শক-মণ্ডলীর জীবনরসরসিকতার মাত্রাভেদ—অথবা একান্ত অভাবই তাহার কারণ। সেরূপ ক্ষেত্রে অভিনয়-সাফল্য সত্ত্বেও নাটকের উৎকর্ষ ঘটিল না; এবং যেহেতু সাক্ষাৎ রসগ্রাহিতার উপরেই নাটকের নাটকত্ব নির্ভর করে, অতএব তেমন সমাজে উৎকৃষ্ট নাটক জন্মিতে পারে না; সেজন্য নাট্যকারও দায়ী নহেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, নাটকের সাফল্য যদিও নির্ভর করে শ্রোতৃমণ্ডলীর রসগ্রাহিতার উপরে, সেই রসগ্রাহিতাও নির্ভর করে সুস্থ ও প্রবল জীবনচেতনার উপরে। এই জীবনচেতনার মাত্রাভেদ আছে, জাতি ও সমাজবিশেষে ইহার প্রকৃতিভেদও আছে; যুগও অনুকূল বা প্রতিকূল হইতে পারে। এজন্য শ্রেষ্ঠত্ববিচারে অল্পসংখ্যক নাটকই উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নাটকহিসাবে নাটকের একরূপ সাফল্য বা সার্থকতার কোন বাধা ঘটিবে না—যদি কোন-না-কোন কারণে তাহা দর্শকমণ্ডলীর সেই 'দেখা'র বস্তু হইয়া উঠিতে পারে। অর্থাৎ এখানেও ষ্টাইলের কথা খাটে। নাটকের বস্তু যেমনই হউক, যদি তাহা 'দৃশ্য' হইয়া থাকে, তবে তাহা 'good style'-এর নাটক বটে—'great style'-এর উৎকৃষ্ট নাটক হয়ত নয়। এইখানেই নাটকের কাব্যগুণের প্রশ্ন উঠে; দর্শকের চিত্তে সাড়া জাগাইলেই হইবে না—তাহা না হইলে সে ত' নাটকই নয়, অর্থাৎ good styleও নয়, তাহারও উপরে যে গুণ না থাকিলে তাহাকে উৎকৃষ্ট নাটক বলা যাইবে না—তাহা এই কাব্য-গুণ, অর্থাৎ জীবনের সমগ্র-গভীর মর্ম্মান্ত অনুভূতি-উদ্রেকের গুণ। এই গুণের উপরেই নাটকের মহত্ত্ব নির্ভর করে—এই গুণেই তাহা সাহিত্যেও অমরত্ব লাভ করে।

তথাপি খাঁটি নাটক বলিতে কি বুঝিব—সে বিষয়ে কোন গোল থাকিলে চলিবে না। এতক্ষণ সে বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছি তাহা হইতে খাঁটি

নাটক সম্বন্ধে একটা ধারণা নিশ্চয়ই হইয়াছে, এবং তাহা এই যে, নাটকে জীবনকেই গতিমান রূপে দেখানো হয়—সে-রূপ 'ঘটনা'র রূপ; তাহাতে মানুষের চরিত্র অর্থাৎ স্ব-স্ব সংস্কার ও কর্ম্মপ্রবৃত্তি 'ক্রিয়মাণ' হইয়া ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করিয়া, জীবনের একটা বিশেষ অনুভূতির উদ্রেক করে। কারণ, সেখানে যাহা কিছু হইতেছে, তাহার প্রত্যেকটিই ঘটনাত্মক; সে সকল ভাব ও ভাবনা, আবেগ ও উদ্দীপনা, হর্ষের উল্লাস ও বিষাদের অবসাদ —ঘটনারই ঘাতপ্রতিঘাতমূলক; অন্তরের ধ্যান, চিন্তা বা কল্পনার বাঙ্ময় প্রকাশ বা উচ্ছ্বাস নয়, বাদ-বিতর্ক নয়, বক্তৃতা বা কবিত্ব নয়। নাটকের সব কিছুই ঘটনামূলক—অর্থাৎ সেই 'ক্রিয়মাণ' প্রবৃত্তির তন্মুহূর্ত্তগত অভি-ব্যক্তি। প্রবৃত্তির এই সাক্ষাৎ ক্রিয়মান অবস্থার বাহিরে আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, ধ্যান করি বা কল্পনা করি, অর্থাৎ যাহা ভাবমাত্র,—জীবনের সেই গতির আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াই আমরা যাহা অনুভব করি না; একটু দার্শনিক ভাষায় বলিতে হইলে যাহার কোন বিশেষ দেশ-কাল নাই, অন্তরে উদ্রিক্ত হইলেও বাহিরের সহিত যাহার কোন নিয়তি-শাসিত কার্য্য-কারণ সম্পর্ক নাই;—তাহার উপরে নাটকের প্রতিষ্ঠা হয় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কেবল রসের আস্বাদন জীবনকে বিস্মৃত হইবারই একটি উপায়; তাহাতে জীবনেরই কোন রূপ দেখিবার প্রয়োজন হয় না। হৃদয়ের কতকগুলি আবেগ ও ভাবকে (emotions) অনুভাবে (sentiments) পরিণত করিয়া বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য একটা মাধুর্য্যের অনুভূতি হইলেই হইল। ইহাকেই অতি সূক্ষ্ম কাব্যরস বলে—ইহা সত্যকার জীবনরসরসিকতার পরিপন্থী। নাটকেও যদি ইহার প্রাধান্য ঘটে, তবে তাহা খাঁটি নাটক নয়, তাহা কাব্যই বটে।

আমাদের দেশের প্রাচীন নাটক হইতে আধুনিক নাটক পর্য্যন্ত এই ভাবরসের উদ্দীপনাকেই মুখ্য করিয়াছে—য়ুরোপে এইরূপ নাটকের পৃথক জাতি ও পৃথক নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। আমাদের আধুনিক নাটকও মানব-চরিত্রের বা নিয়তি-নিয়মের গূঢ়তর রহস্যে অনুপ্রাণিত নয়। ইহাও এই দেশেরই জলবায়ুর গুণ; এখানে সকল চেতনাই যেন বাস্তববিমুখ—বাস্তবের সঙ্গে বোঝাপড়া বেশীদূর অগ্রসর হইতেই পারে না, মধ্যপথেই ঘুরিয়া ভাবমার্গে প্রস্থান করে। যাহারা প্রকৃত বে-রসিক তাহারা যোগাসনে বসিয়া দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিয়া পরাজ্ঞানের সাধনা করে; রসিক হইলে, ভক্তিমার্গের মিষ্টিক-

সাধনায় জীবনকে ফাঁকি দিবার উপায় করে। আমি ইহার কোনটাকেই নিন্দা করিতেছি না—বরং ভারতীয় প্রতিভা ও মনীষার এই স্বকীয়তাকে গভীর শ্রদ্ধাই করি। এখানে আমি, এ জাতির পক্ষে নাটকসৃষ্টির যে বাধা আছে, তাহার কারণ নির্ণয় করিতেছি; নাটকের নাটকত্ব বিচার করিতেছি; যাহাকে খাঁটি নাটক বলিয়া বুঝিয়াছি, আমাদের জীবনে তাহার অত্যাবশ্যক উপাদান ও উপকরণের অভাবের কথা বলিতেছি।

এই যে ভাব-মাত্রের কথা আমি উত্থাপন করিয়াছি—ইহার সম্বন্ধেও যেন কোন ভুল ধারণা না ঘটে। আমি কোন ভাব বা emotionকে নাটক হইতে বহিষ্কার করিতেছি না। মূল কথা, সকলই চরিত্রের অর্থাৎ প্রকৃতি-জীবনের ঘটনাগত অভিব্যক্তি হওয়া চাই। একথা ত আমরা সকলেই মানি যে, নাটকদর্শনকালে আমরা অতি গভীর আবেগে অবশে অভিভূত হই। এই যে ভাবের আবেগ, ইহা মানসিক চিন্তাপ্রসূত নয়—ইহা জীবনচেতনার—দেহাধিষ্ঠিত প্রাণমণের—মন্থনজাত আবেগ; ইহাতেই আমরা আমাদের অন্তরের অন্তরতম পরিচয় লাভ করি। কিন্তু যে-আবেগ সাক্ষাৎ জীবনানুভূতির আবেগ নয়, যাহা ধ্যান-চিন্তা, ভাবনা কল্পনা, অথবা কোন তত্ত্ব-বিচারের ভাবোদ্দীপনা মাত্র—বাস্তব প্রবৃত্তি বা সুখ-দুঃখের কর্ম্মপ্রেরণার সঙ্গে যাহার কোন সম্পর্ক নাই, বরং যাহা কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে স্তম্ভিত করিয়া অলস-উপভোগেই পর্য্যবসিত হয়, তাহার স্থান নাটকে নয়—কাব্যে। কিন্তু এই সকলই যদি সত্যকার জীবনানুভূতির অঙ্গীভূত হইয়া উঠে—মানুষের চরিত্রকে তথা নিয়তি-কেও আচ্ছন্ন করে, তবে ইহারাও খাঁটি নাটকেরই উপাদান; বরং সেই নাটকই উৎকৃষ্ট কাব্যের পদবীতে অরোহণ করে।

আমাদের নাটকগুলির সম্বন্ধে এই শেষের কথাগুলি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। সে নাটকে যে-বস্তুর অত্যধিক সদ্ভাব দেখা যায়, তাহা ঐরূপ ভাবমাত্রের উদ্দীপন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমাদের জীবন-সংস্কার বা জীবনচেতনা খাঁটি নাটকের অনুকূল নয়। আমরা 'চরিত্র'বান নই, আমরা জীবনের সহিত খুব গভীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়-সাধনের পক্ষপাতী নই—বাস্তবের আঘাতে আমাদের প্রবৃত্তি কঠিন হইয়া উঠে না; কারণ আমরা বহুকাল হইতেই অহিফেন সেবন করিতেছি—হয়ত, হাওয়াতেও যেমন অহিফেন-বিষ আছে, তেমনই দেহের রক্তেও তাহা পূর্ব্ব হইতেই ছিল, কিংবা জল-মাটির

গুণেই এমন হইয়াছে। আমরা মূলে বস্তুতান্ত্রিক নই—ভাবতান্ত্রিক; বস্তু আমাদের সহিত বেশী বাড়াবাড়ি করিতে আরম্ভ করিলেই আমরা তাহাকে বাষ্পাকারে ভাবলোকে পাঠাইয়া সকল বিঘ্ন দূর করি; যত বড় আঘাত হউক, আমরা তাহা মনে মনে এড়াইবার উপায় করিয়াছি—বৈরাগ্য এবং ভক্তি—এই দুই-এর তত্ত্ব আমাদের একরূপ সংস্কারের মত হইয়া গিয়াছে; এজন্য কোন ধাক্কাই ভিতরে বেশী দূর পৌছিতে পারে না। আমাদের জীবন-চেতনায় 'চরিত্র'বোধ নাই—যে 'নিয়তি' সেই 'চরিত্রে'র পরিণামরূপে প্রকাশ পায়, তাহার ধারণাও নাই। অদৃষ্টরূপী দৈব আছে, তাহারই মার খাইয়া মানুষ কাঁদে; এবং অতিশয় 'সাধু' 'ভালমানুষ'ও যখন সেই মার খাইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দেয় তখন আমরা কাঁদিয়া আকুল হই। অনেক সময়ে 'সাধু' বা 'ভালমানুষ' অর্থে স্বার্থবুদ্ধিহীন ভাববিহ্বল পুরুষই বুঝিতে হইবে—অর্থাৎ, অতিশয় শক্তিহীন মানুষ। যে আদৌ আত্মপ্রতিষ্ঠ নয়, সেও একরূপ মহাপুরুষ! এই মানুষই যখন জীবনধর্ম্ম লঙ্ঘনের জন্য উপযুক্ত শাস্তি পায়, এবং যখন তাহার চরিত্রের নিদারুণ দুর্ব্বলতা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়—সে যখন একই দুর্ব্বলতার বশে উন্মাদ হইয়া আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আপনি ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকে (যেমন 'প্রফুল্ল'-নাটকের 'যোগেশ') তখন আমাদের ভাববিহ্বলতার অন্ত থাকে না—এই self-pity-ই আমাদের উৎকৃষ্ট ট্র্যাজিডি-রস। পুরাণ-প্রথিত অবতারকল্প পুরুষকেও আমরা শক্তিমান 'চরিত্র'রূপে পূজা করিতে পারি না—ভাবের অশ্রু-প্লাবনে তাহাকে মৃৎপুত্তলের মত বিগলিত করিয়া না তুলিলে আমাদের নাটকাভিনয় সার্থক হয় না। ইহা ছাড়া, আধ্যাত্মিক আদর্শ আছে—পাপ-পুণ্যের দণ্ড-পুরস্কার আছে, ভাব-ভক্তির প্রবল বন্যা আছে—এ সকলের তুলনায় জীবন বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তুচ্ছ; সে রহস্যভেদ করিবার শক্তিও আমাদের নাই, প্রবৃত্তিও নাই—আমাদের জাতীয় সংস্কারই যেন তাহার বিরোধী।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বিদেশীর অনুকরণে আমরা রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছি। যে জীবন হইতে ওখানে যে নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়াছে—আমাদের জীবন সেরূপ নয়, তথাপি সেই নাটকের আদর্শে আমরা নাটক রচনা করিয়া থাকি। এককালে আমাদের কবিরা যেমন মহাকাব্য লিখিয়া মহাকবি আখ্যালাভ করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন, অর্থাৎ, কুমড়ার গাছে নারিকেল

ফলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—সেইরূপ যাত্রাগানের আসরেই আমরা বিলাতী থিয়েটারের মাচা বাঁধিয়াছি। নাটক যদি জীবনেরই সাক্ষাৎ আভিনয়িক রূপ হয়, তবে আমাদের জীবনই যেমন আমাদের নাটকের দৃশ্যবস্তু হইবে, তেমনই আমাদের নাটকের আকৃতি প্রকৃতিও স্বতন্ত্র হইবে; যে ছাঁচে য়ুরোপীয় নাটক গড়িয়া উঠিয়াছে সে ছাঁচে আমাদের নাটক গড়িলে তাহার styleই ভুল হইবে, অতএব তাহা সার্থক সৃষ্টি হইবে না। আমি খাঁটি নাটকের যে আদর্শ ধরিয়াছি—তাহাতে জীবনের যে রূপটির উপলব্ধি চাই, তাহার চেতনাই যদি আমাদের সংস্কারে সহজ না হয়, তবে য়ুরোপীয় আদর্শে আমরা যে রঙ্গমঞ্চ খাড়া করিয়াছি, এবং যেরূপ চরিত্র ও অভিনয় তাহাতে যুক্ত করিয়াছি—সে সকলই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। 'প্রহ্লাদ চরিত্র' বা 'বিল্বমঙ্গলে'র মত নাটক যে বিশুদ্ধ নাটক হইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আমি গল্পের কথাই বলিতেছি না—গল্প যেমনই হোক, তাহাকে নাট্য-রূপ দেওয়া যায় কিনা, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র; কিন্তু যাহা মূলে একটা ভাব-জীবন মাত্র, যাহাতে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা প্রকৃতিগত প্রাণধর্ম্মের প্রেরণা নাই, তাহাকে যদি অভিনয়-বস্তু করিয়া তোলা হয়, তবে তাহা নাটক নয়—দৃশ্যকাব্য; তাহা গোড়া হইতেই একটা ভাবরসের গীতোৎসার—তাহাতে যে ঘটনাগুলি ঘটে, তাহা প্রবুদ্ধ প্রাণশক্তির কারণে ঘটে না; তাহাতে বাহিরের সঙ্গে, বাস্তবের সঙ্গে, কোন সংগ্রাম বা সংঘর্ষ নাই; 'চরিত্র' বলিতে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, সেখানে সে বস্তুর প্রয়োজনই হয় না। ভাবোদ্দীপনাই যাহার একমাত্র অভিপ্রায় তাহাতে মানুষকে এক একটি ভাবের বিগ্রহরূপে সাজাইয়া লইলেই হয়; অর্থাৎ বীর, করুণ, হাস্য প্রভৃতি কতকগুলি রসকে মানুষের মত পোষাক পরাইয়া রঙ্গমঞ্চে নাচাইতে পারিলেই হইল। কেবল পৌরাণিক নাটকই নয়—আমাদের সকল নাটকই—সামাজিক, পারিবারিক, ঐতিহাসিক—এইরূপ ভাবপ্রধান মেলোড্রামা। আমি খুব আধুনিক নাটকের কথা বলিতেছি না।

এইরূপ না হইয়া উপায় নাই, কারণ, আমাদের দেশের দর্শকমণ্ডলী আর কিছুতেই সাড়া দিবে না—দিতে পারে না। তাহা হইলে, নাটকের আদর্শ যেমনই হোক—নাট্যকলা ও নাট্যরসের মূল প্রেরণা যেমনই হোক, যেহেতু নাটক যুগের প্রভাব, জাতির চরিত্র এবং সামাজিক সংস্কার এই ত্রিদোষকে আশ্রয় না করিয়া পারে না—সেই হেতু আমি নাট্যরসের যে তত্ত্ববিচার

করিয়াছি, সেই তত্ত্বের অধীন করিয়া দেখিলে, একদিকে যেমন খাঁটি ও উৎকৃষ্ট নাটকের বড় অভাব ঘটিবে—আর একদিকে তেমনই কেবল বহুজনের মনোহরণ করিয়াছে বলিয়াই বহু নাটকের সার্থকতা স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমটির কারণ বুঝিতে পারা যায়—পূর্ব্বের আলোচনাতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সে কারণ এই যে, ঐরূপ খাঁটি জীবনরস-রসিকতার অনুকূল আবহাওয়া মানবসভ্যতার ইতিহাসে ও জাতির জীবনে কচিৎ সুলভ হইয়া থাকে। বাহিরের অবস্থার সহিত অন্তরের ঐরূপ রসাবস্থার যোগাযোগ একটা বড় মাহেন্দ্রক্ষণেই সম্ভব—সে যেন মুক্তা ও স্বাতী-নক্ষত্রঘটিত প্রবাদের মত। তবু ওই প্রবাদও এক অর্থে সত্য; এমন অনেক বস্তুই আছে যাহা অনুকূল দেশ-কাল-পাত্রের সংযোগেই সম্ভব হয়, এজন্য তাহা দুর্লভ হইতে বাধ্য। তথাপি, একবার যদি তাহা কোথাও হইয়া থাকে, তবে তাহাকেই আদর্শ বলিয়া মানিতে হয়, এবং পরে আর কোথাও ঠিক তেমনটি না হইলেও, সেই আদর্শের মানদণ্ডেই সেই জাতীয় বস্তুর উৎকর্ষ-অপকর্ষ-বিচার আদৌ অসঙ্গত নয়। ইহাও সত্য যে, এক একটা জাতি এক এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে—তেমন আর কেহ করে নাই; এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। তথাপি জাতি ও যুগকে বাদ দিয়া সেই শ্রেষ্ঠত্বের জ্ঞানটুক আর সকলের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। নাটকের ব্যাপারেও তেমনই, প্রাচীন গ্রীক, অর্ব্বাচীন ইংরাজী বা স্পেনীয় নাট্যকলা নাট্যরসের যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছে তাহা সার্ব্বভৌমিকতা দাবী করিতে পারে—উৎকৃষ্ট নাটক যে কি বস্তু তাহার দৃষ্টান্ত ঐ নাটকগুলির মধ্যে মিলিবে।

দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে আরও কিছু বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। সত্য বটে, দর্শকচিত্তে সম্যক সাড়া জাগাইতে পারিলেই নাটক এক হিসাবে সার্থক। এজন্য যুগ ও জাতির বিশিষ্ট রসচেতনার দ্বারা সকল নাটকেরই অভিনয়সাফল্য একরূপ সীমাবদ্ধ। যুগের দ্বারাও বটে—কারণ এক যুগের রুচি ও রস-সংস্কার অন্যযুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তথাপি, জীবন-রস-রসিকতা যদি সুস্থ ও সবল থাকে, তাহা হইলে বাহিরের উপকরণ ও সাজসজ্জাই নূতন হওয়া আবশ্যক—প্রাচীন নাটকের ঐগুলিই বাধা হইয়া দাঁড়ায়, ভিতরের রসপ্রেরণার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। এইরূপ রসপ্রেরণাহীন নাটকও যদি অতিশয় জনপ্রিয় হয়, তাহাতে কেবল ইহাই প্রমাণ হয় যে, তাহা সাময়িক রুচি ও

রসবোধের বড় উপযোগী হইয়াছে, এবং ঠিক সেই গুণে তাহা নাটকহিসাবে সাধারণভাবে সার্থক হইয়াছে। কিন্তু সেই কারণেই তাহা উৎকৃষ্ট নাটক নহে। যদি সেই অভিনয়-সাফল্যের মূলে খাঁটি নাটকীয় রস না থাকে, তবে সাময়িক রুচি ও রসবোধের তৃপ্তি সাধন করিয়া সে নাটক অচিরেই কালসঞ্চিত আবর্জ্জনারাশির সামিল হইয়া যাইবে; সে নাটক সাহিত্যিক রস-সৃষ্টির অমরত্ব দাবী করিবে না—রঙ্গমঞ্চ হইতে বাহির হইয়া শাশ্বত সারস্বত-চত্বরে আরোহণ করিবে না।

আমাদের এ যুগের সাহিত্যে আমরা বহুবিধ রস-সৃষ্টি করিয়াছি—বাঙালীর কবিপ্রতিভা জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু নাটকীয় রস-সৃষ্টিতে আমাদের প্রতিভা সত্যই হার মানিয়াছে। একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, এ পর্য্যন্ত আমরা এমন একখানিও নাটক সৃষ্টি করিতে পারি নাই, যাহা রঙ্গমঞ্চে সাময়িক প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আর কোনরূপ গৌরবের অধিকারী হইয়াছে। বাঙালীর নাট্যরসপিপাসা এ পর্য্যন্ত অতিশয় অসংযত ভাবোচ্ছ্বাসের মেলোড্রামাতেই চরিতার্থ হইয়াছে। এমন একখানি নাটক আমাদের নাই যাহাতে মানব-চরিত্র তথা মানব-নিয়তির উদ্‌ঘাটনে সেই স্থির-গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে—যাহাতে জগৎ ও জীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য বিদ্যুৎচমকের মত উদ্ভাসিত হইয়া বাস্তব অনুভূতিকেই একটি অপূর্ব্ব রসে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। জীবন-সত্যকেই এমন রস-সত্য করিয়া তোলা শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভার কাজ—এই জন্যই একজন নাট্যকারই জগতের শ্রেষ্ঠ কবি। আমাদের জাতির পক্ষে ইহা সম্ভব হয় নাই কেন, এই আলোচনা হইতেই তাহা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। এজন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই—কারণ, যে গাছে যাহা ফুটিবার তাহাই ফোটে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, আমরা উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিয়াছি, এবং আমাদের এক নাট্যকার সেক্সপীয়ারের চেয়ে বড়, এইরূপ আস্ফালন করিলে এবং সেই আস্ফালনে রসিকতাভিমানী ব্যক্তিগণও যোগদান করিলে, তাহা শুধুই হাস্যকর নয়—যৎপরোনাস্তি লজ্জাকর হইয়া থাকে। বাঙালী অনেক কিছু পারিয়াছে এবং আরও অনেক কিছু পারিবে, কিন্তু নাটক-রচনার পক্ষে আমাদের জাতীয় চরিত্র ও বহুকালাগত সংস্কার এমনই যে, ভবিষ্যতেও আমরা তাহাতে সম্যক সফলতা লাভ করিব কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আধুনিক সাহিত্যের ভাষা

প্রায় এক শতাব্দীর কর্ষণ ও অনুশীলনের ফলে বাংলা-ভাষার যে রূপ দাঁড়াইয়াছিল, যে রূপটিকে আশ্রয় করিয়া বাংলার কবি-সাহিত্যিক রসসৃষ্টি করিয়া আসিতেছিলেন, আজ যেন তাহাকে বর্জ্জন করিবার একটা প্রবৃত্তি, বড় হইতে ছোট—সকলের ভিতরেই দেখা যাইতেছে, ইহার কারণ কি ?

নবতন সাহিত্যিক আদর্শ বা অতিশয় স্বতন্ত্র ব্যক্তি-প্রতিভা ইহার কারণ হইতে পারে না। কারণ, ভাষার ধাতু-প্রকৃতি—তাহার অন্তর্নিহিত প্রাণ-প্রবৃত্তি—প্রত্যেক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বিধান করে; এই হিসাবে ভাষা সাহিত্যের অধীন নয়, সাহিত্যই ভাষার অধীন। ভাষার প্রকৃতি জাতির অন্তর-প্রকৃতির সহিত অভিন্ন; সাহিত্যের ভাষা—জাতির ভাষা, জাতির রস-চেতনার উপরেই সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হয়; ভাষার সহিত সেই রসিকতার নাড়ীর যোগ আগে। ব্যক্তি-প্রতিভা যতই স্বাধীন বা স্বতন্ত্র হউক, একেবারে ভুঁইফোড় হইতে পারে না—অতি বড় কবি-প্রতিভারও একটা বংশক্রম আছে। ভাষার যে পটভূমিকার উপরে প্রতিভা তাহার প্রাণের রং ফলাইয়া থাকে, তাহাতে রং ফুটিত না—যদি সেই পটবস্ত্রখানি সমগ্র জাতির বংশপরম্পরা গত ভাবচেতনার নিত্যপ্রবাহে মার্জ্জিত ও বিশদ হইয়া না উঠিত। কবির চেতনা মূলে এই জাতীয়-ভাব-চেতনার অনুগত; কবি-শক্তি যতই ব্যক্তিগত বলিয়া মনে হউক, তাহাতে সমগ্র জাতির মগ্ন-চৈতন্য স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। সাহিত্যের ভাষা জাতির প্রাণ ও মনঃপ্রকৃতিবশে একটা বিশিষ্ট আকার লাভ করে; তাহা কৃত্রিম নয়, তাহাকে ইচ্ছামত ভাঙ্গিয়া গড়া যায় না—তাহার মূলে জীবনের মতই একটা সত্যকার শক্তি সক্রিয় হইয়া আছে। এই জন্য, কোনও জাতির ভাষায় যে বিশিষ্ট লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হইয়া থাকে—বচন-রচনার ভঙ্গি, শব্দ-অর্থের সঙ্গতি-প্রথা, উচ্চারণ-ধ্বনি-মূলক শব্দবিন্যাস, শব্দের ভাবধ্বনি বা ধ্বনিমূলক ভাব-ব্যঞ্জনার বিশিষ্ট রীতি—সেই সকলই তাহার প্রাণের গতিচ্ছন্দের অনুরূপ। এই সকল লক্ষণে ভাষার যে প্রকৃতি সুস্পষ্ট হইয়া থাকে—কোনও ব্যক্তি-বিশেষ বা লেখক-গোষ্ঠীর দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন-চেষ্টা নিতান্তই জবরদস্তি-মূলক অত্যাচার। ইংরাজীতে যাহাকে Style বলে তাহা লেখকের নিজস্ব বটে, কিন্তু তাহা যদি ভাষার মূলে আঘাত করে, তবে তাহা

Style-ও নহে, তাহা লেখকের মুদ্রাদোষ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভাষা ব্যক্তির নহে—জাতির; কেবল তাহাই নহে, জাতির সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের মিলন-ভূমি এই ভাষা। জাতির সমষ্টিগত আত্মা এই ভাষাকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে, এই ভাষায় যে-সাহিত্য গড়িয়া উঠে তাহারই সাহায্যে যুগ-যুগান্তর-বাহিত একটি অখণ্ড চৈতন্য, বহু জন্মের জাতিস্মরতার মত অক্ষুণ্ণ থাকে। ভাষাই সাহিত্যের সৃষ্টি ও স্থিতির নিদান।

ভাষার আদর্শ ক্ষুণ্ণ করার প্রয়োজন দুই কারণে হইতে পারে; প্রথম, ভাষার আদর্শ-সম্বন্ধে অজ্ঞতা, বিশুদ্ধ বাক্যরচনার অক্ষমতা; দ্বিতীয়, ভাষাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াও লেখকের নিজ খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করিবার আগ্রহ—অতি উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবশে জাতীয় রীতি বর্জ্জন করিয়া, একটা নবধর্ম্ম-প্রচারের মত কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবার আকাঙ্ক্ষা। ভাষার যে অনাচার প্রবল হইয়াছে তাহার মূলে এই দুই কারণই বিদ্যমান, এবং এই দুই কারণেরও মূলে যে এক গভীরতর কারণ আছে তাহার নাম—জাতির আত্মভ্রষ্টতা।

কিন্তু অজ্ঞতা ও অক্ষমতার প্রমাণ এতই স্পষ্ট যে, দ্বিতীয় কারণটির উল্লেখ বা আলোচনা অনাবশ্যক মনে হইতে পারে। তথাপি একটু ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সাহিত্য-সাধনা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যে বিশেষ পরিণতি লাভ করিয়াছিল—সেই সাধনার সেই পরিণতির মধ্যেই ভাষাগত আদর্শের বিনাশ-বীজও নিহিত ছিল, এবং আজও তাহা সক্রিয় রহিয়াছে—অজ্ঞতা ও অক্ষমতাকে প্রশ্রয় দিতেছে। অতএব এই দুই কারণকেই একসঙ্গে ধরিতে হয়। যাঁহারা বাংলা-ভাষার বর্ত্তমান রূপান্তর লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং নবীন লেখকদিগকেই এজন্য দায়ী করিয়া থাকেন, তাঁহারা এ ব্যাধির নিদান আলোচনা করেন নাই।

সকলেই জানেন, গত যুদ্ধের শেষভাগে, অর্থাৎ এই আধুনিক অনাচার প্রকট হইবার অনতিপূর্ব্বে, বাংলা গদ্যরীতি লইয়া একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই আন্দোলনের ঘোষণা-মন্ত্র ছিল এই যে, বাঙ্গালীর মুখের ভাষাই বাংলা-ভাষা, সাহিত্য গড়িতে হইবে সেই ভাষায়; অপর যে-ভাষায় সাহিত্যে আজকাল যে বস্তু বা বস্তি-তন্ত্র চলিতেছে, তাহার সূত্রপাত হয় ভাষা লইয়া; ইহাই ভাষা-ঘটিত বাস্তববাদ। অলঙ্কৃত বা সুসংস্কৃত ভাষা যদি কৃত্রিম হয়, তাহা হইলে উন্নত কবি-কল্পনাও কৃত্রিম। বস্তি-তান্ত্রিক সাহিত্যে যে জীবন-

সত্যকে আদর্শ করিয়াছে তাহার তুলনায় বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য যেমন মিথ্যা, কথ্য-ভাষার তুলনায় সাহিত্যিক সাধুভাষাও সেইরূপ কৃত্রিম। কিন্তু রহস্যের কথা এই যে, আন্দোলনকারীরা রবীন্দ্রনাথেরই ভক্ত অনুচর,—সাহিত্যের ভাষা-পরিবর্ত্তন যে দেহের বেশ-পরিবর্ত্তন নয়, এই রসিকজনেরা তাহা বিস্মৃত হইয়া, যে-সাহিত্য রবীন্দ্রনাথকেও ধারণ করিয়া আছে, সেই সাহিত্যের মূলেই কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। গদ্যরীতি সম্বন্ধে সহসা এই যে আন্দোলন, ইহারও পূর্ব্বে বাংলা গদ্যে রবীন্দ্রনাথ চল্‌তি-ভাষার ছন্দ বা বাংলা-ছড়ার ছন্দকে আধুনিক গীতিকাব্যের কাজে লাগাইয়াছিলেন—ছড়ার ছন্দকে কাব্যচ্ছন্দে উন্নীত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই নূতন ধরণের গীতি-কাব্যের ভাষাই চলতি-ভাষায় সাহিত্যরচনার সঙ্কেত করিয়া থাকিবে। ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের চিঠির ভাষা, শান্তিনিকেতনে তাঁহার মৌখিক আলাপ-আলোচনা ও ধর্ম্ম-ব্যাখ্যানের ভাষা, এবং তাহারই লিপিবদ্ধ রূপ—বাংলা গদ্যের জাত্যন্তর ঘটাইতে ও শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী করিয়া তুলিতে যথাসম্ভব সহায়তা করিয়াছিল।

গদ্যে বা পদ্যে, রবীন্দ্রনাথ যে নবত্বের স্পৃহা তাঁহার অধুনাতন রচনায় ব্যক্ত করেন—তাহার প্রেরণাও যেমন স্বতন্ত্র, তাহার অভিব্যক্তিও তেমনই। অতএব এই নব-অন্দোলনের নায়করূপে, অথবা প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে রবীন্দ্রনাথকে খাড়া করিয়া যে বল-সঞ্চয়ের চেষ্টা হইয়া থাকে তাহা অর্থহীন। খাঁটি সাহিত্যের ভাষা, বা উৎকৃষ্ট কবি-কল্পনার শব্দ-বিগ্রহ, প্রতিভার প্রেরণায় যে নূতনতর দীপ্তি লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইতে ভাষার আদর্শ-নিরূপণ বা রীতি-পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু ভাষাকে যাহারা জড় মৃৎ-পিণ্ডের মত যে কোনও ছাঁচে ফেলিয়া নব-নব ভঙ্গির উদ্ভাবনা করিতে চায়, তাহারা প্রতিভা-হীন বলিয়া ভাষার দিব্যমূর্ত্তির সন্ধান পায় না। গদ্যে যাহারা চল্‌তি ভাষাকে আদর্শ করিতে চাহিল তাহারা একটি কৃত্রিম ভাষা গড়িয়া তুলিল—সমাজের এক সম্প্রদায়ের বৈঠকখানায়, কৃত্রিম স্বরভঙ্গিতে আধো-আধো টানা-টানা উচ্চারণে যে ধরণের কথাবার্ত্তা হয়, ইহা সেই ভাষা। ইহাতে 'ককনি'-উচ্চারণযুক্ত 'ককনি'-বুলির মিশ্রণও অল্প নহে। এ ভাষা যেমন পুঁথির ভাষাও নয়, তেমনই ইহা বাঙ্গালী-সন্তানের মুখের বুলিও নহে।

এই ভাষাই খাড়া করা হইল পুঁথির ভাষার বিরুদ্ধে। পুঁথির ভাষার

অপরাধ—তাহা পণ্ডিতের ভাষা, অর্থাৎ পুঁথি লিখিতে হইবে মুখের বুলিতে, কারণ যাহারা পুঁথি পড়িবে যাহারা পণ্ডিতীর ধার ধারিবে না। সাহিত্যের সাধুভাষাকেও আমরা মাতৃভাষা বলিয়া থাকি, যদি সে ধারণা ভুল হয়—পণ্ডিতী পিতৃভাষা যদি বর্জ্জন করিতেই হয়, তবে, এ ভাষাও কি বাঙ্গালী-মেয়েদের ভাষা? বাংলাসাহিত্য কি বাংলার ব্রতকথা-জাতীয় বস্তু? যুক্তির দিক দিয়া যেমনই হউক—দেখা গেল, এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাঙালীর মুখের ভাষা বা ইডিয়ম ইহার আদর্শ নহে, এ ভাষা সাধুভাষাই বটে, তবে সে সাধু—'পণ্ডিত' নয়—'বাবু'; এ ভাষার বচনভঙ্গি, ইহার কায়দা ও প্যাঁচ 'পণ্ডিত'-কেও হার মানায়। যে-ভাষা একদিন পদ্যে ও পরে গদ্যে, সমস্ত বাংলাদেশের সাহিত্যিক ভাষা ছিল—সর্ব্বপ্রদেশের শিক্ষিত বাঙালীর ভাব-বিনিময়ের ভাষারূপে যে ভাষা বাংলাসাহিত্যকে সম্ভব করিয়াছিল, সেই ভাষা বাংলা নহে; সে ভাষায় যাহা কিছু রচিত হইয়াছে তাহা কৃত্রিমতা-দোষে দুষ্ট! এতকাল পরে বাংলাসাহিত্যের খাঁটিভাষা আবিষ্কৃত হইল! রবীন্দ্র-নাথের 'শেষের কবিতা'-নামক উপন্যাসে এই ভাষার প্রৌঢ়রূপ অনেকে দেখিয়াছেন—তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, খাঁটি মাতৃভাষাভাষী বাঙ্গালী—আধুনিক ভাষায় এখনও যাহার দখল তেমন হয় নাই, এবং ইংরাজীতেও যে সুপণ্ডিত নয়—তাহার পক্ষে, বঙ্কিমের কোনও উপন্যাস, না এই 'শেষের কবিতা', কোন্‌খানি অধিকতর সুখপাঠ্য? সাধুভাষা যদি নিতান্তই বি-ভাষা হয়, তবে সে ভাষায় একদিন এমন সকল রচনা সম্ভব হইল কেমন করিয়া? এখনও সকল উৎকৃষ্ট গল্প ও উপন্যাস সেই ভাষাতেই রচিত হয় কেন? বাঙ্গালীই বা সেই সকল গ্রন্থে তাহার রস-পিপাসা মিটায় কেমন করিয়া? সংস্কৃত, সাধু, পণ্ডিতী—যে নামই তাহাকে দেওয়া যাউক, কেবল গালি দিলেই সত্য কখনও মিথ্যা হইয়া যায় না।

বাংলা গদ্য-সরস্বতীর এক চরণ প্রাকৃত-বাংলার কলধ্বনিমুখর রাজহংসটির উপর, এবং অপর চরণ সাধুভাষার সুসংস্কৃত, গাঢ়বন্ধ, শুচি-শ্রী ও সৌরভময় সহস্র-দল পদ্মের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। যেদিন হইতে ভাষার এই দুই বিপরীত স্বভাবের সমন্বয় ঘটিয়াছে সেইদিন হইতেই বাংলা গদ্য আপন প্রাণধর্ম্মে সঞ্জীবিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ও শক্তি লাভ করিয়াছে; তাহার সংস্কৃত জাতি ও প্রাকৃত গোত্র, দুইয়ের ধর্ম্মই বজায় রাখিয়া একাধারে সংযম ও স্বাধীনতা লাভ

করিয়াছে। সংস্কৃত পদপদ্ধতির কাঠামোখানাই তাহার জাতিকুল রক্ষা করিয়াছে, পণ্ডিতের ঘরে ভূমিষ্ঠ না হইলে তাহার যে কি দশা হইত, তাহা আজিকার স্বেচ্ছাচার দৃষ্টে অনুমান করা দুরূহ নয়। সেই বাগ্-বৈভব ও বাক্-পদ্ধতির আশ্রয় পাইয়াই প্রাকৃত বাংলার শ্রীহীন অথচ জীবন্ত বচনরাশি ভাব অর্থ ও রসের আধার হইয়া উঠিল। বাংলা গদ্যের সেই সাধুরীতিই উত্তরোত্তর কথ্য বাংলার বচনরাশিকে আত্মসাৎ করিয়া রবীন্দ্রনাথের যুগে এমন সর্ব্বভাবপ্রকাশক্ষম হইয়া উঠিয়াছে। সে গদ্য যে সাধুত্ব বর্জ্জন করে নাই, তাহার কারণ—সাধুই হোক আর অসাধুই হোক, বাংলা-সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে আজও তাহাই সহজ-সুন্দর, তাহাই প্রাণবান ও গতিমান, সংবর্দ্ধনশীল ও সর্ব্বতোমুখী।

খাঁটি বাংলা ব্যবহার করার কথাই যদি হয়, তবে সেদিক দিয়াও এই নূতন ভাষার নূতনত্ব কিছুই নাই। বরং দেখা যাইতেছে, সাধুরীতির লেখকেরা যে পরিমাণে ও যেরূপ বিশুদ্ধভাবে এই সকল বুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন, আধুনিক ভাষার লেখকেরা তাহা করেন না, করিতে পারেন না। বাংলা বুলি না জানাই তাহার একটা কারণ বটে; কিন্তু ইহাতে প্রমাণ হয় যে, ভঙ্গিমাযুক্ত হইলেই ভাষা খাঁটি হয় না; এবং ভঙ্গিমাহীন হইলেও, অর্থাৎ পদ্ধতি 'সাধু' হইলেও, সে ভাষা খাঁটি বাংলার ছাপ বহন করিতে পারে। আধুনিক ভঙ্গিবাগীশেরা নিজ নিজ শিক্ষা ও সংস্কারবশে, কেহ বা সংস্কৃত, কেহ বা প্রকট ইংরাজীরীতির পক্ষপাতী; ইহাতে আর যাহাই হউক, কথ্যভাষার বড়াই করা চলে না। রবীন্দ্রনাথের কথা বলিতেছি না, এত বড় ওস্তাদের ওস্তাদীর কথাই স্বতন্ত্র। অপর দুই একজন যাঁহারা সাধুভাষাকেই উচ্চারণ বদলাইয়া 'চলতি' নামে চালাইয়া থাকেন, তাঁহাদের কথাও বলি না—যদিও এই নাটের গুরু তাঁহারাই, অপর যাঁহারা এই নূতন ভঙ্গির অনুকরণ করিয়া থাকেন, খাঁটি বাংলা-বুলি তাঁহাদের জানা নাই, কেবল ক্রিয়াপদগুলিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়াই তাঁহাদের একমাত্র বাহাদুরী। এই ক্রিয়াপদের খর্ব্বতা-সাধনই যেমন এভাষার একমাত্র মৌলিক লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তেমনই এই রন্ধ্রপথেই যত অনাচার প্রবেশ করিতেছে।

ভাষাতত্ত্ববিদ্ স্বীকার করিবেন—ভাষামর্ম্মবিদের তো কথাই নাই—যে, ভাষার ধ্বনিরূপই তাহার আসল রূপ; কেবল শব্দ-অর্থের সঙ্গতি নয়, এই

ধ্বনিই ভাষার আত্মা। ভাষার শব্দ-বিন্যাসে, প্রত্যেক বর্ণটির মধ্য দিয়া এক অখণ্ড ধ্বনিস্রোত বহিয়া থাকে; ইহা এমনই অখণ্ড যে, কোনও অংশে যদি এই ধ্বনি-স্বভাব আহত হয় তবে সমগ্র বাক্-প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। বাংলা গদ্যের যে বৈশিষ্ট্য, তাহাও ধ্বনি-রূপের বৈশিষ্ট্য—বাক্যযোজনায় কেবল ব্যাকরণ-অভিধান ঠিক থাকিলেই চলিবে না, সেই বিশিষ্ট ধ্বনি-রূপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়। ইহা কাহাকেও শিখাইতে হয় না, ভাষায় যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এ সম্বন্ধে তাহার সংস্কার জন্মিয়া উঠে। বরং এই ধ্বনি-রূপকে অস্বীকার করাইতে হইলে নানা যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হয়, তাহাতেও একটা প্রাণহীন কৃত্রিম অভ্যাসের সৃষ্টি হয়। বাংলা-ভাষার যে ধ্বনি-প্রকৃতির উপর বাংলা গদ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—বাক্যের কোনও অঙ্গে তাহার ব্যভিচার ঘটিলে সারা দেহ অসুস্থ হয়। সাধু বা সাহিত্যিক বাংলার সংস্কৃত শব্দ ও বাক্-পদ্ধতির সঙ্গে বাংলা-বুলি যেভাবে অন্বিত হইয়াছে তাহার ধ্বনি-রূপ প্রাকৃত নয়—সংস্কৃত। বাংলা পয়ার যেমন প্রাকৃত অপভ্রংশের ধ্বনি-প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত—তাহা সংস্কৃতও নয়, বাংলা-বুলির ধ্বনিও নয়, বরং দূর সম্পর্কে সংস্কৃতেরই আত্মীয়, তেমনই, বাংলা গদ্যের বাক্যচ্ছন্দ কথ্যভাষার ধ্বনি হইতে স্বতন্ত্র। আমরা যে ভাষায় লিখিয়া থাকি—নব্য লেখকেরাও যে ভাষা লিখিয়া থাকেন, তাহার বুলিও প্রধানতঃ সংস্কৃত বা সাধু, তাহার ধ্বনি-প্রকৃতিকে জোর করিয়া কথ্যভাষার ভঙ্গিতে ভাঙ্গাইয়া লওয়া যায় না। লিখিব সাধুভাষায়, ভঙ্গিমা করিব বাংলা বুলির, এবং তাহারই খাতিরে উচ্চারণ বাঁকাইয়া ক্রিয়াপদের স্থানে টক্ টক্ শব্দ করিব, এ অনাচারে ভাষা পীড়িত হয়, তাহার ধ্বনি-ধর্ম্ম নষ্ট হয়। সেই ধ্বনি ক্ষুণ্ণ হয় বলিয়াই রচনার বাগ্‌বন্ধনও শিথিল হয়; তখন শব্দযোজনার রীতি বা শব্দের শয্যা-গুণ সম্বন্ধে লেখকের কোনও সংস্কারই আর থাকে না; যেখানে-সেখানে যে-কোনও শব্দ ব্যবহার করিতে এবং শব্দযোজনাকালে ভাষার রীতি ভঙ্গ করিতে কিছুমাত্র বাধে না; কারণ, ঐ খণ্ডিত ক্রিয়াপদের আঘাতে বাক্যের ধ্বনিগ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়। আধুনিক বাংলা-গদ্যের যে দুর্গতি লক্ষ্য করা যাইতেছে, ইহাই তাহার মূল কারণ। যাহারা সাধুরীতি ত্যাগ করিয়াছে, অর্থাৎ ক্রিয়াপদগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া, সাধুভাষার ধ্বনি-সঙ্গতি নষ্ট করিয়াছে, অথচ বিশুদ্ধ বাংলা-বুলি যাহাদের আয়ত্ত নহে, তাহারাই সর্ব্ববিধ অনাচারে গা ভাসাইয়াছে।

একদিন রবীন্দ্রনাথ ভাষার একটা রীতি-বৈচিত্র্য-সম্পাদনের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন—'সবুজ পত্র' তাহার বাহন হইয়াছিল; শুধু বাহন নয়, ভাষার সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইয়া রীতিমত আন্দোলন সুরু করিয়াছিল। ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে একদিন যেমন নব্য সম্প্রদায় উন্নত ও বিশুদ্ধ আদর্শের ঘোষণা করিয়াছিলেন, বাংলা-ভাষার সংস্কার-কামনায় ঠিক সেইরূপ এক পৃথক আদর্শের মহিমা ঘোষিত হইল—ইহাও যেন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে নব্যতন্ত্রের আক্রোশ। বাংলা-ভাষার বিরুদ্ধে 'সংস্কৃত ও 'পণ্ডিতী' ইত্যাকার গালি বর্ষিত হইতে লাগিল। ইহাদের প্রধান আপত্তিই যেন এই যে, ভাষার ভিতরেও ব্রাহ্মণের আধিপত্য থাকিবে কেন? সাধুভাষার মধ্যে যে শ্রী ও শক্তি রহিয়াছে, তাহা বিবেচনার যোগ্য নয়; সে-রীতি রসসৃষ্টির পক্ষে যতই অনুকূল হউক—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রত্ব, চৌদ্দ আনা অংশে, সে রীতির উপরেই নির্ভর করিলেও—পৌত্তলিক বঙ্কিম যাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কুসংস্কার-মুক্ত অভিজাত-সম্প্রদায়, সেই ধূপধুনাগন্ধী সংস্কৃতমন্ত্রানুকারী ভাষা সহ্য করিবেন না। কথাটা যে এমন করিয়াই বলিতে হইল তজ্জন্য আমিও দুঃখিত, কিন্তু সাধুভাষার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন নিতান্তই আক্রোশমূলক বলিয়া মনে হয়, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের একটা অকারণ বিরাগ ছাড়া ইহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এতদিন ইহার জন্য রবীন্দ্রনাথকে দায়ী করি নাই; কারণ রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল প্রেরণা বুঝি। সকলের উপর তিনি আর্টিষ্ট্—এই কথাটি না বুঝিলে রবীন্দ্রনাথকে কেহই বুঝিতে পারিবে না। এ বিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত দিব। সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক নহেন, কিন্তু মিষ্টিক কবিতা লিখিয়াছেন; অথচ Mysticism জীবনের উপলব্ধি, কায়মনঃপ্রাণে উহার সাধনা করিতে হয়; যাহারা মিষ্টিক তাহারা ঠিক কবিও নহে, তাহাদের মনঃপ্রকৃতি—চিত্তের ধাতুই—স্বতন্ত্র। কিন্তু যিনি এত বড় আর্টিষ্ট্, আর্টের উপাদান হিসাবে সকলই তাঁহার বশীভূত, কিছুই তাঁহার আর্ট-সাধনার বহির্ভূত নহে। এই একটিমাত্র দৃষ্টান্ত আমি এখানে দিলাম, এ প্রসঙ্গে ইহাই যথেষ্ট। এত বড় সাহিত্যিক প্রতিভা সত্বেও, সঙ্গীতই রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রেরণা। কেবল সঙ্গীতবিদ্ বলিয়া নয়,—এ-হেন সঙ্গীত-প্রাণ ব্যক্তির কোনও স্থির মত বা বদ্ধ-সংস্কার থাকিতে পারে না—অবন্ধনই তাঁহার স্বভাব, সঙ্গীতাত্মক সুষমা-

প্রীতিই তাঁহার প্রাণের একমাত্র বন্ধন; আর কোন ধর্ম্মই তাঁহার নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যে সূক্ষ্ম বিতর্ক বা বিশ্লেষণ-শক্তি ও প্রবল ভাবুকতার পরিচয় আছে তাহার পশ্চাতে কোনও মতবাদী ব্যক্তির দৃঢ় প্রত্যয় নাই। রবীন্দ্রনাথের মনোজগতে যদি কোনও শৃঙ্খলা থাকে, তবে তাহা বিশৃঙ্খলার শৃঙ্খলা, পরস্পরের মধ্যে যেখানে যত অসঙ্গতি সেইখানেই তাঁহার মন একটা শৃঙ্খলা-স্থাপনের জন্য ব্যাকুল; এইজন্য, বাহ্যিক ঐক্য বা সঙ্গতি-রক্ষার জন্য তাঁহার কোনও উদ্বেগ নাই; বিরোধ ও বৈচিত্র্যই তাঁহার আনন্দ-বিধান করে। এইজন্যই বলিয়াছি, ইংরাজীতে যাহাকে বলে artist par excellence রবীন্দ্রনাথ তাহাই; তাঁহার প্রতিভা মূলে সঙ্গীতপ্রধান। এ-হেন ব্যক্তির কোনও বিধি বা আদর্শ-প্রচারের প্রবৃত্তি অথবা যোগ্যতা থাকিতে পারে না; বঙ্কিমচন্দ্র যে কার্য্যের উপযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সে কার্য্যের উপযুক্ত নহেন; এইজন্য রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের একজন প্রধান স্রষ্টা হইলেও, তিনি এ সাহিত্যের নায়ক নহেন। আর্টিষ্ট রবীন্দ্রনাথ ইদানীং বাংলাভাষার উপরে যে নূতন নূতন নক্সা কাটিতেছেন—পুরাতন রীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ, এবং নূতন ভঙ্গিমার প্রতি আসক্ত হইয়াছেন, তাহা রবীন্দ্র-নাথের পক্ষে নূতনত নহে, অস্বাভাবিকও নহে। কিন্তু সহসা ভাষার আদর্শ সম্বন্ধে তিনি এমন সুস্পষ্ট মতবাদ প্রচার করিতেছেন যে, তাহাতে মনে হয়, তিনি বাংলা-সাহিত্যকে ভাষান্তরিত করিবার পক্ষপাতী। তাঁহার এই মত যথার্থ হইলে বিগত শতাব্দীর সাহিত্য এবং সেই সঙ্গে তাঁহার স্বরচিত গন্থ-পদ্যের প্রায় সমগ্র উৎকৃষ্ট অংশ বাতিল হইয়া যায়। টলষ্টয় শেষ বয়সে আর্টের নূতন আদর্শ স্থাপনার্থে যাহা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও বৃদ্ধ বয়সে ভাষার নবাবিষ্কৃত ভঙ্গির খাতিরে সাহিত্যের সেইরূপ প্রাণদণ্ড করিতে চান। আর্টিষ্টের পক্ষপাত বুঝি—রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যলোভী মন ভাষারও নানা ভঙ্গি সন্ধান করিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু এতদিন পরে মনে হইতেছে, রবীন্দ্রনাথ যেন এই ভাষার বিষয়ে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেই মনস্থ করিয়াছেন—তাঁহার সদ্য-প্রকাশিত ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধে এইরূপ ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মত স্রষ্টা ও শিল্পী যদি অবশেষে বাংলা-ভাষার এই গতিই নির্দ্ধারণ করেন তবে ভাষা-বিভ্রাটের আর বাকি কি?

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই নূতন ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্ব্বে কবিতায় আমদানী

করিয়াছেন—'ক্ষণিকা'র ভাষা ও ছন্দ বাংলা গীতিকাব্যে এক নূতন সম্পদ ও সম্ভাবনারূপে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। বাংলা-গদ্যেও নূতন রীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের মন বহুপূর্ব্বে আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে, এবং ভাষার ভঙ্গিবৈচিত্র্য-হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্য-শিল্পীর সেদিকে আকৃষ্ট হওয়া কিছুমাত্র অসঙ্গত নহে, বরং সঙ্গত ও স্বাভাবিক। উপলক্ষ বা বিষয়বিশেষে, এই মৌখিক বাক্-ভঙ্গিই অধিকতর উপযোগী বলিয়া মনে হইতে পারে; তাহা ছাড়া, আটপৌরে পোষাকের মত ভাষারও যদি আর একটা ছাঁদ থাকে, মন্দ কি? কিন্তু গদ্যের এই রীতিও এমন প্রশস্ত নহে যে তাহাকেই সাহিত্যের রীতি করিতে হইবে—যে রীতি সাহিত্যের রীতি হইয়া আছে, তাহার তুল্য ক্ষমতা ইহার নাই, রবীন্দ্রনাথের মত লেখকের প্রাণপণ চেষ্টাতেও প্রমাণ হয় নাই যে, এই রীতি পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে কথা পরে, যাহা বলিতেছিলাম। 'সবুজ পত্র' একটা coterie-র মুখপত্ররূপে দেখা দিল, এই coterie বাংলা-ভাষার রীতি পরিবর্ত্তন করিতে চাহিল। এই coterie-র সহিত রবীন্দ্রনাথ যুক্ত ছিলেন—যথেষ্ট উৎসাহও দিয়া থাকিবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যধর্ম্ম-বোধ তখনও অটুট, তাঁহার সাহিত্যিক instinct তাঁহাকে বাড়াবাড়ি করিতে দিল না। 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত সেকালের গল্পগুলির ভাষাই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। 'ক্ষণিকা'-রচনাকালে ভাষা ও ছন্দের নূতন রীতি রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চয়ই মুগ্ধ করিয়াছিল—গীতিকাব্যের প্রেরণা-বিশেষে এই ভঙ্গির যে একটি খাঁটি সাহিত্যিক উপযোগিতা আছে তাহা রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তখনও তিনি এই ভঙ্গিকে সর্ব্বেশ্বরী করিতে চাহেন নাই। তাই 'সবুজ পত্রে'র যুগে, রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনায়, আকালিক বসন্ত-সমাগমের মত, কবিত্বের যে অতি প্রবল ও আকস্মিক জোয়ার আসিয়াছিল, তাহার ফলে আমরা যে কবিতাগুলি পাইয়াছি—যাহা 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত ও 'বলাকা'য় সংগৃহীত হইয়াছিল—তন্মধ্যে যেগুলি ভাবৈশ্বর্য্যে ও গীতি-গৌরবে শ্রেষ্ঠ, সেগুলি সাধুভাষার সঙ্গীতে ও ভঙ্গিতে প্রকাশ পাইয়াছে। সেদিন যদি এই মতবাদ তাঁহাকে পাইয়া বসিত, তাহা হইলে 'বলাকা'র সেই কবিতাগুলি জন্মলাভ করিত না। সেই coterie-র সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও, ভাষার সেই নব আদর্শ ঘোষণার যুগে, বাঙালী-কবি বাংলা-ভাষার আসল ধ্বনি-রূপকে স্বীকার করিয়াছিলেন।

Coterie-র প্রভাবে কবিতার ভঙ্গি হইল এইরূপ—

শিকল-দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া ?
পাগলামী তুই আয় রে দুয়ার ভেদি !
ঝড়ের মাতন ! বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্‌রে বাছা-বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা !

অথবা—

যৌবন রে, বন্দী কি তুই আপন গণ্ডিতে ?
বয়সের এই মায়াজালের বাঁধনখানা তোরে হবে খণ্ডিতে।

উপরি-উদ্ধৃত কবিতার অংশগুলিতে কেবল বাক্যই আছে—ছন্দও আছে, সুর নাই। আমার মনে হয়, উগ্র মতবাদের প্ররোচনায় যাহা হইয়া থাকে, এখানে তাহাই হইয়াছে—বুলি ও ছন্দের জোরটাই বেশী করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কথ্যভাষা কাব্যরসসিক্ত হইলে, অর্থাৎ তাহাতে কবির প্রাণের সুর লাগিলে, বাংলা-গীতিকবিতার যে-রূপ ফুটিয়া উঠে, বাংলা-সাহিত্যে তাহা নূতন নয়। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সেই ভাষা ও ছন্দের যতই উন্নতি হউক, তদ্দ্বারা গোপীযন্ত্র বা একতারার কাজই চলিতে পারে, বঙ্গ-ভারতীর সপ্তস্বরার স্থান সে পূরণ করিতে পারে না। সেই সপ্তস্বরার আওয়াজ যে কিরূপ, 'বলাকা' হইতেই তাহার কিছু উদাহরণ দিব।—

হে সম্রাট তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কি মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে ?

* * *

জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে।

সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।

*　　*　　*

সহসা শুনিনু সেইক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গেল দূর হ'তে দূরে দূরান্তরে।
হে হংস-বলাকা,
ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
ঐ পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অপ্সর-রমণী,
গেল চলি' স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি'।
উঠিল শিহরি'
গিরিশ্রেণী তিমিরমগন,
শিহরিল দেওদার-বন।

—এ যেন গৃহকোণের বদ্ধ বাতাস হইতে একেবারে সাগরকূলের মুক্ত হাওয়ায় ছাড়া পাওয়া! এ হংস-বলাকা আর কেহ নয়—বাংলা পয়ারছন্দের সাধুভাষা; সেই ছন্দের সেই সুর কবিকে মাতাল করিয়াছে। সাধুরীতির এ ছন্দ আর কখনও এমন করিয়া কবিকে মাতাল করে নাই, এই কবিতাগুলির মধ্যেই কবি বার বার সেই কথা বলিয়াছেন।

যখন শুনি—

ওরে কবি, তোরে আজি করেছে উতলা
ঝঙ্কারমুখরা এই ভুবন-মেখলা।

*　　*　　*

ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

*　　*　　*

এই তব হৃদয়ের ছবি
এই তব নব মেঘদূত
অপূর্ব্ব অদ্ভুত
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে—

—তখন বুঝিতে বিলম্ব হয় না, ভাষা-ছন্দের কোন্ 'অপূর্ব্ব অদ্ভুত' সঙ্গীত এই 'নব মেঘদূত' রচনা করিয়াছে। কবির জীবনে এমন বহুবার ঘটিয়াছে, কিন্তু ইহাই শেষবার, এমন আর পরে ঘটে নাই।

'সবুজ পত্রে'র যুগে, অর্থাৎ 'বলাকা'র কবিতাগুলি ও নূতন গল্পগুলি লিখিবার কালে, ভাষার রীতি সম্বন্ধে মন যে দিকেই ঝুঁকিয়া থাকুক, তাঁহার কবি-চিত্ত বা অন্তরের বাণীপ্রেরণা, সাধুভাষাকেই বরণ করিয়াছে ইহা আমরা দেখিয়াছি। সত্য বটে, তাঁহার পদ্য, ও বিশেষ করিয়া গদ্যরচনার ভাষা, উত্তরোত্তর নূতনের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে—তাহাতে আমরা কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই; কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিল্পী রবীন্দ্রনাথের খেয়াল-খুশীর স্বাধীনতা আমরা মানিয়া লওয়াই সঙ্গত মনে করি। মানুষের যেমন, তেমনই কবিরও জীবনে একটা শেষ বা পরিণাম আছে। দেহে যৌবনের মত—মানস-জীবনেও প্রতিভার পূর্ণস্ফূর্ত্তির একটা কাল আছে, তারপর জরার আক্রমণ অনিবার্য্য। সকল কবির জীবনেই প্রতিভার পূর্ণোদয়ের শেষে অস্তকাল উপস্থিত হয়, রবীন্দ্রপ্রতিভাও সে নিয়মের বহির্ভূত নয়। 'বলাকা'য় আমরা রবীন্দ্রপ্রতিভার শেষ দীপ্তি দেখিয়াছি, তারপর হইতে তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাতে আর্টিষ্টের মনস্বিতার পরিচয় আছে—যিনি আজন্ম বাণীর সাধনা করিয়াছেন, তাঁহার চিরাভ্যস্ত লিপি-কুশলতা নানা ভঙ্গিমায় নিজেকে বাঁচাইয়া চলিয়াছে।

কিন্তু ভঙ্গিই তাহার প্রাণ, মানস-বিলাসের কারুকলাই তাহার প্রধান উপজীব্য; তাহাতে স্রষ্টার আত্মোৎসর্গ নাই; শিল্পীর আত্মসচেতন বিলাস-লীলা আছে। স্রষ্টা ও কবি, প্রকৃতির নিয়মে জরাগ্রস্ত হইলেও, শিল্পীহিসাবে রবীন্দ্রনাথের মানস-পিপাসা এখনও মরে নাই, এই অবস্থা ক্রমেই আরও প্রকট হইয়া উঠিতেছে। সত্তর বৎসর পার হইয়াও রবীন্দ্রনাথের মানস-শক্তি যে এখনও অটুট আছে, ইহাই বিস্ময়কর; এত কাল ধরিয়া মনের এই সজীবতা একালে আমাদের দেশে অতিশয় বিরল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিপ্রতিভা

হারাইয়াছেন (এ বয়সে তাহা কিছুমাত্র অগৌরবের নহে), তিনি বাণীর নিগূঢ় রহস্য, ভাব ও রূপের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, দৃষ্টি ও সৃষ্টির অভেদ-তত্ত্ব—কবিচিত্তের সেই পরম উপলব্ধিকে—উপেক্ষা করিয়া, এক্ষণে বাণীকে কেবল কেলি-কলার সহচরীরূপে ধরিয়া রাখিয়াছেন। প্রতিভা যাহাদের নাই, দিব্য-প্রেরণার অবস্থায় বাণীর জ্যোতির্ম্ময় প্রসন্নমূর্ত্তি যাহাদের সম্মুখে কখনও আবির্ভূত হইবে না, খাঁটি বাংলা-বুলি যাহারা বলিতেও ভুলিয়া গিয়াছে, তাহাদেরই পৃষ্ঠপোষকরূপে অতঃপর রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃত-বাংলার নামে একটা ভাষা—যাহা—ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক, কোনও হিসাবেই গ্রাহ্য নহে—তাহারই জয় ঘোষণা করিতেছেন।

১৩৩৮ সালে 'পরিচয়' নামক পত্রিকার আবির্ভাব হয়। এই পত্রিকা-খানিকে 'সবুজ পত্রে'র সাক্ষাৎ বংশধর বলা যাইতে পারে। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন—

> 'সবুজ পত্র' বাংলা ভাষার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে গেল। * * এর পূর্ব্বে সাহিত্যে চলতি ভাষার প্রবেশ একেবারে ছিল না তা নয়। কিন্তু সে ছিল খিড়কির রাস্তায় অন্দরমহলে। * * একবার যেমনি একে আত্মপ্রমাণের অবকাশ দেওয়া গেছে, অমনি আপন সহজ প্রাণশক্তির জোরেই সমস্ত বাঁধা আল ডিঙিয়ে আজ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে আপন দখল কেবলি এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তার কারণ এটা জবর দখল নয়, এই দখলের দলিল ছিল তার নিজের স্বভাবের মধ্যেই, ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত বেড়া তুলে দখল ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।

এই উক্তির কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য ; প্রথম দুইটির কথা একত্রে লওয়া যাক। খাঁটি সাহিত্যের প্রয়োজনে চলতি ভাষার সহজ প্রাণশক্তির আবশ্যক হইল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। আগে হয় নাই কেন? ইহার দখল ত কেহ ঠেকাইয়া রাখে নাই! যে চলতি-ভাষা লোক-সাহিত্যে এবং গ্রাম্য গীতিকাব্যে অষ্টাদশ শতকের রামপ্রসাদ হইতে উনবিংশ শতকের টপ্পা-কবি পর্য্যন্ত—অপ্রতিহতভাবে স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, তাহার সহজ প্রাণশক্তি বাঙ্গালী ত অস্বীকার করে নাই। কিন্তু সেই সহজ প্রাণ-শক্তি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে নব্য-বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই—দাশু রায়ের ছড়া সংস্কৃতব্যবসায়ী পণ্ডিতেরাই উপভোগ করিতেন, নব্য-সমাজের তাহা রুচিকর হয় নাই। এই সহজ প্রাণশক্তি মৌখিক ভাষা-মাত্রেরই আছে, কিন্তু সেই ভাষায় রচনা করিবার প্রবৃত্তি কোনও সাহিত্যিক

বাঙ্গালীর কখনও হয় নাই; কেবল কৃষ্ণদাস কবিরাজ নয়—মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্র, এমন কি ঈশ্বর গুপ্তের মত বাঙ্গালীও তাহার উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই; এখন কথা হইতেছে, এই 'প্রাণের জোর' কি কেবল পণ্ডিতগণের অত্যাচারেই সাহিত্যে আপনাকে জাহির করিতে পারে নাই? গত যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ—যিনি সাধুভাষাকেই আশ্রয় করিয়া নিজের কবিপ্রতিভাকে সার্থক করিয়াছেন—বাংলা-গদ্যের সেই অন্যতম উৎকর্ষবিধাতা রবীন্দ্রনাথ—আজ এতকাল পরে সাধুভাষার উপরে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন কেন? বাংলা সাহিত্য ও ভাষার ইতিহাস, বিশেষ করিয়া গত যুগের বাংলা-সাহিত্যের সেই পুনরুজ্জীবন-কাহিনী, এবং সেই সঙ্গে নিজের কীর্ত্তিকেও বিস্মৃত হইয়া রবীন্দ্রনাথ আজ এই ভাষাবিভ্রাট ঘটাইতে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? সাহিত্যের ইতিহাসে দুই-চারি-জন এমন প্রতিভাশালী কবি-লেখকের সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁহারা যেন যাদুশক্তির বলে ভাষাকে অস্পষ্ট, অসংলগ্ন, বিকলাঙ্গ অবস্থা হইতে সহসা একটা বড় ধাপে তুলিয়া দিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে ভাষার যে অসংস্কৃত রূপ ছিল, এই সকল লেখক তাহারই অন্তর্নিহিত শক্তিকে—ভাষার নিজস্ব প্রাণ-প্রবৃত্তিকেই, প্রতিভাবলে ভিতর হইতে বাহিরে প্রকাশিত করিয়া দেন। বাংলা-ভাষাও আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত সেইরূপেই ক্রমবিবর্ত্তিত হইয়াছে, সর্ব্বকালের কবি-সাহিত্যিক ভাষার যে রূপটিকে ধরিয়া আছেন তাহা প্রাকৃত বা কথ্যরীতি নহে—ইহার কারণ অতিশয় সুস্পষ্ট। বাঙ্গালী জাতির জীবন চিরদিনই গ্রাম্য, কিন্তু এই জীবনে যেখানেই যতটুকু আর্য্য সংস্কৃতির স্পর্শ ঘটিয়াছে—শাস্ত্রের উপদেশ বা পুরাণগুলির ভাব-প্রেরণা হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, সেইখানেই, সেই সংস্কৃতির প্রভাবে তাহার গ্রাম্যতা যতটুকু মার্জ্জিত হইয়াছে, সাহিত্যের ভাষাও ততটুকু রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রভাবের বশে, এই সংস্কৃতির ফলেই, বাঙ্গালী যখন গল্প বলিতে বা গান করিতে বসিয়াছে তখনই ভাষার গ্রাম্যতাকে কিয়ৎপরিমাণে শোধন করিয়া লইয়াছে; কথ্য-ভাষার ভঙ্গিতে তাহার সাহিত্যপ্রেরণা কখনও আরাম পায় নাই। আমাদের ভাষা কোনও একটা প্রাকৃতের অপভ্রংশ বটে, তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্যও ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু যখনই আমরা সাহিত্য-রচনা সুরু করিলাম তখনই এই অপভ্রংশকে—তাহার প্রকৃতি যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া, একটা সংস্কৃত রূপে বাঁধিয়া লইয়াছি। এই ভাষা বলি এক ছন্দে বা

ভঙ্গিতে, লিখি—আর এক ছন্দে, আর এক ভঙ্গিতে; মনে হয় যেন দুইটা ভাষা। কিন্তু ইহা লইয়া কেহ সমস্যায় বা সঙ্কটে পড়ে নাই, এ পার্থক্য কোন লেখককে পীড়া দেয় নাই; বরং এই বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভঙ্গিটুকুই প্রতিভাহীন লেখককেও সাহিত্য-রচনায় উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়াছিল। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের অধিকাংশই এই ভাষার গুণে সাহিত্য-পদ পাইয়াছে। অধিকাংশ রচনার বিষয়বস্তু যেমন ক্ষুদ্র তেমনই বৈচিত্র্যহীন, অথচ তাহাই সাহিত্যের উপকরণরূপে কবিকে আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ, সেগুলিকে ভাষা ও ছন্দের মর্য্যাদা দান করিবার স্পৃহা। পারিবারিক জীবনের দুই একটি বাঁধা-ধরা সুখ-দুঃখের একই কথা, ধর্ম্ম লইয়া সামাজিক বিবাদ, অতি তুচ্ছ দাম্পত্য-কলহ, মাহাত্ম্যহীন দেবদেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণন, নারীদের বেশবাস, অলঙ্কার, ও নাক-চোখের মামুলী বর্ণনা, পায়স পিষ্টক ও নানাবিধ ব্যঞ্জনের তালিকা—এই ধরণের বিষয়বস্তুই একযুগ ধরিয়া এতগুলা লেখকের কবি-প্রেরণার উপজীব্য যে কি করিয়া হয়, তাহার আর কোনও কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। কলিকাতা-অঞ্চলের কথ্য-ভাষার মোহ যেমন অনেক অ-সাহিত্যিককে সাহিত্যিক করিয়া তুলিতেছে, এককালে এই কথ্যভাষা বা dialect-এর অমার্জ্জিত ও ধ্বনি-সৌষ্ঠবহীন রীতিকে বর্জ্জন করিয়া ভাষার এই ভদ্ররূপের চর্চ্চাই বহু লেখকের সাহিত্যসাধনার অভিপ্রায় ছিল বলিয়া মনে হয়। ভাষার এই সাহিত্যিক ভঙ্গিকে কৃত্রিম বলিয়া অস্বস্তি বোধ করিবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। কারণ, এক অর্থে সাহিত্যের ভাষামাত্রেই কৃত্রিম। কবি যে-ভাষায় লেখেন, অরসিক অ-কবি তাহাকে কৃত্রিম মনে করিবেই, চিরদিনই করিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের রচনাপাঠ-কালে, সে রচনা যে রীতিরই হউক—হাস্যবেগ অনুভব করে এমন শ্রোতার অভাব কখনই হইবে না; অথচ রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'প্রাণের জোর' যে-ভাষার প্রধান সম্পদ, ইহারা সকলেই সেই কথ্যভাষাই বলিয়া থাকে। কাজেই, কৃত্রিমতার কথা ছাড়িয়া দিলাম। এই সাধুভাষা বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কৃতির ভাষা, এই ভাষা যদি বাঙ্গালী খুঁজিয়া না পাইত, তবে তাহার আদিম গ্রাম্যতা এখনও অক্ষুণ্ণ থাকিত। যদি এই ভাষা বিজাতীয় হয়, তবে বাঙ্গালী এতকাল ধরিয়া যাহা কিছু রচনা করিয়াছে, তাহা সাহিত্যই নয়। এ ভাষা খাঁটি বাংলা না হইয়া যদি সংস্কৃতানুযায়ী হয়,

তবে ইহাই বলিতে হইবে যে, জন্মহিসাবে বাঙ্গালী এক জাতি, কিন্তু ভাব-চিন্তার ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপনয়ন-সংস্কারের দ্বারা সে দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছে। খাঁটি বাংলাভাষা বলিতে এখন যাহা বুঝায়, তাহাও প্রাকৃত-বাংলা নয়—বারো আনা সংস্কৃত।

রবীন্দ্রনাথ এযাবৎ-প্রচলিত গদ্যরীতির জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতকে দায়ী করিয়াছেন। এই গদ্যের জন্য উক্ত পণ্ডিতগণকে দায়ী করার অর্থ অবশ্য ইহাই যে, এই পণ্ডিতেরাই যখন এ ভাষার জন্মদাতা তখন এ ভাষা খাঁটি বাংলা হইতেই পারে না—বরং তাঁহাদের পণ্ডিতী শক্রতার ফলে বাংলা গদ্যের স্বভাব-হানি হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া কৌতুক অনুভব করিয়াছি। আধুনিক যুগে বাঙ্গালীর যত কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহার মূলে একজন মাত্র যুগাবতার আছেন, তিনি রামমোহন রায়; বাংলা গদ্যের স্রষ্টাও তিনি। তাহাই না হয় মানিলাম, কিন্তু গদ্যসৃষ্টির যাহা কিছু গৌরব তাহার ভাগী হইবেন রামমোহন, আর ইহার জন্য যত-কিছু অপরাধ তাহার ভার বহিতে হইবে গরীব পণ্ডিতগণের—এ কেমন সুবিচার? হিন্দু পণ্ডিতদের যত দোষ—যত আক্রোশ তাঁহাদের উপরে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাধুভাষার প্রতি এক দলের এই যে বিরাগ, ইহার মূলে যেন একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব বা কমপ্লেক্স আছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্দ্ধে বাঙ্গালীর সুপ্ত প্রতিভা যখন নূতন করিয়া সাড়া দিল, তখন বাংলাভাষার—কি গদ্যে কি পদ্যে—অপরিসীম দারিদ্র্য তাহাকে নৈরাশ্যে অভিভূত করিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে আমরা বাংলা-ভাষার যে সুমার্জ্জিত কলাসম্মত রসনিপুণ ভঙ্গি ও বিশুদ্ধ রীতির প্রথম পরিচয় পাই—ভাষার সেই সাহিত্যিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সময় পাইল না, রাষ্ট্রীয় গোলযোগ ও সামাজিক অব্যবস্থার ফলে সকলই বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। ষোড়শ শতাব্দী হইতে যে জাগরণ আরম্ভ হইয়াছিল, যে নূতন সংস্কৃতি এ-জাতির স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার ধারা বিক্ষুব্ধ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া অতিশয় অগভীর হইয়া উঠিল—সাহিত্যে স্রোত-ধারার পরিবর্ত্তে কূপ-পল্বলের সৃষ্টি হইল। পূর্ব্ব-যুগের সাহিত্য ক্রমশঃ যে আদর্শে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, ভারতচন্দ্রের ভাষায় যে সরল অথচ সুমার্জ্জিত গাঢ়বন্ধ-শ্রী ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলাম—যাহার মূলে ছিল শিক্ষিত রসবোধ, বিদ্বানসুলভ বৈদগ্ধ্য,

পরবর্ত্তী কালে ভাবার সে আদর্শ টিকিল না, কারণ সে সংস্কৃতিই লোপ পাইতে বসিল; বাণী আর সাধনার বস্তু রহিল না, কবি-প্রতিভা স্বচ্ছন্দজাত লতা-গুল্মের মত মাঠ বাট ছাইয়া ফেলিল; বাংলাসাহিত্যের ক্ল্যাসিকাল যুগ স্বল্প-কালমাত্র স্থায়ী হইয়া সহসা অন্তর্হিত হইল। বাণী-সাধনার সেই আদর্শ যদি আরও কিছুকাল টিকিয়া থাকিতে পারিত, এবং ভারতচন্দ্রের সেই সাধনা যদি অব্যাহত থাকিয়া আরও শক্তিশালী প্রতিভার অভ্যুদয়ে স্বাভাবিক সুপরিণতি লাভ করিত, তাহা হইলে বোধ হয়, উনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধে আমরা কবিওয়ালার গান ও ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার পরিবর্ত্তে এমন কিছু পাইতাম, যাহাতে নবযুগের সাহিত্য-প্রেরণা সুসম্পন্ন ভাষা ও সুমার্জ্জিত রীতির অভাবে এমন দিশাহারা হইত না।

একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সেকালে বাঙ্গালীর সেই নবজাগ্রত প্রতিভা সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য বাংলাভাষাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সংস্কৃত করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল—সংস্কৃতের সাহায্যেই এক মহাসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল। 'বিষবৃক্ষ', 'কপালকুণ্ডলা'র যে রস-কল্পনা, তাহার বাহন হইল বঙ্কিমী-ভাষা—এ ভাষা সেই কাব্য-প্রেরণার প্রয়োজনেই জন্মলাভ করিয়াছিল। যে ভাষায় দেব-দেবীর জবানীতে গ্রাম্য জীবনের কাহিনী রচনা করিতে কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই, সে ভাষায় শেক্সপীরীয় ট্রাজেডির মত কাব্যরস সৃষ্টি করা কোনও কালের কবির পক্ষেই সম্ভব নয়। রসের আদর্শই যদি বদলাইয়া যায়, তবে কোন কথাই নাই, নতুবা, আজিকার দিনেও সেই ধরণের সাহিত্য খাঁটি কথ্য বাংলার ভঙ্গিতে রচনা করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। একথা যিনি বুঝিতে পারিবেন না তাঁহার সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা চলিতে পারে, সাহিত্যের আলোচনা নিষ্ফল। মিল্‌টনের মহাকাব্যের সঙ্গীত বাঙ্গালীর কানের ভিতর দিয়া প্রাণে পৌঁছিয়াছে, সে সঙ্গীতের উদার উদাত্ত ধ্বনি, ঈশ্বর গুপ্ত ও কবিওয়ালার যুগের একজন বাণী-বরপুত্রকে আকুল করিয়াছে। কানে যাহা বাজিতেছে ভাষায় তাহাকে ধরিবার উপায় নাই, সে যুগের সে ভাষায় তাহা কল্পনা করাও যায় না। প্রতিভা পথ দেখাইল—দৈবী প্রজ্ঞার বলে অসাধ্য-সাধন হইল; এত বড় বিস্ময়কর কীর্ত্তি বোধ হয় কোনও সাহিত্যের ইতিহাসে নাই। সংস্কৃতের সাহায্যে ভাষাকে এমন করিয়া বাঁধিয়া লওয়া হইল যে, কাশীদাসী-পয়ারের ছাঁদে

অমিত্রাক্ষরের সাগর-তরঙ্গ অপূর্ব্ব কলকল্লোলে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে-সঙ্গীতে বাঙ্গালী যেন অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রোত্থিত হইয়া কান পাতিয়া রহিল; বাংলা ছন্দের, তথা বাংলা কাব্যের গতি ফিরিল; আজিও সে সঙ্গীত বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে বিরাজ করিতেছে। গদ্যে ও পদ্যে এই দুই মহাপ্রতিভার উদয় না হইলে নব্য বাংলাসাহিত্য এত শীঘ্র এমনভাবে প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইত না।

এই নব্য-সাহিত্যের ভাষা এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের ভাষা তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, বাংলা ভাষা যেন একটি সবল সুমার্জ্জিত ভঙ্গি লাভ করিয়াছে, এতদিনে যে একমাত্র পথে তাহার শক্তি ও শ্রী বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব সেই পথে সুনিশ্চিত পদক্ষেপ করিয়াছে। শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য যেমন সংস্কৃতের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল, তেমনই শব্দযোজনারীতি বা ভাষার গাঁথনি দৃঢ় করিবার জন্য অনেক পরিমাণে সংস্কৃত-আদর্শ অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। তথাপি ভাষার ভঙ্গি সেই পুরাতন বাংলা ভঙ্গি—সেই ভঙ্গিতে শক্তি ও শ্রী সম্পাদন করিয়াছে সংস্কৃত শব্দসম্পদ ও ধ্বনিমন্ত্র। সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায়, যাঁহারা বাংলা-সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন—যাঁহারা ভারতচন্দ্র, দাশু রায় ও ঈশ্বর গুপ্তের ভক্ত ছিলেন, তাঁহারাই মেঘনাদবধের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত ছিলেন। এখনকার দিনে, যাঁহারা বাংলাসাহিত্য অপেক্ষা ইংরাজী-সাহিত্যের সহিত অধিকতর পরিচিত, তাঁহারাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যরস উপভোগ করিয়া থাকেন। ভাষার ভঙ্গিই ইহার একমাত্র কারণ নয় তাহা জানি—কিন্তু সংস্কৃত শব্দের অতিরিক্ত প্রয়োগেই বাংলা-ভাষা পীড়িত হইয়া উঠে, এবং লঘু ও সরস সুপ্রচলিত শব্দের বহুল প্রয়োগেই ভাষার খাঁটি ভঙ্গি যে অক্ষত থাকে—এ ধারণা ভুল। মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত, আমরা বাংলা কাব্যের যে ভাষা-বৈচিত্র্য দেখিয়াছি তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, মূল-ভঙ্গি অবিকৃত রাখিয়া, ভাব-কল্পনা ও ধ্বনিব্যঞ্জনার তারতম্য অনুসারে, ভাষা অতিশয় গাঢ় বা অতিশয় তরল হইতে পারে—রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। মধুসূদনের শব্দচয়নরীতি রবীন্দ্রনাথেও অক্ষুণ্ণ আছে—ভাবকল্পনা ও ধ্বনি-বিন্যাসের তারতম্য-হেতু তাহার সংস্কৃত ভঙ্গির পার্থক্য ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গীতি-কল্পনার ভাষা যতই সুললিত হউক, তাহার রীতি মধুসূদনের অপেক্ষা খাঁটি নহে, বরং তাহার উপর ইংরাজীর প্রভাব আরও সুস্পষ্ট। এককালে রবীন্দ্রনাথের রচনা বাঙ্গালী পাঠকের মনোহরণ করিতে

দিয়াছিলেন। তারপর প্রাণের আবেগে নিরন্তর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করিয়া সেই জীবন্ত বাণী-দেহ রবীন্দ্রনাথের যুগে সুদৃঢ়, সুবলয়িত ও সুনমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

যে-রীতির উদ্ভাবনায়, গুরু-গম্ভীর পদযোজনা এবং সহজ সরল বাক্‌-পদ্ধতির সমন্বয়ে, একটি অখণ্ড ধ্বনিপ্রবাহ সম্ভব হইয়াছে—যাহার ফলে বাংলা গদ্য ভাব, অর্থ ও ধ্বনি-ব্যঞ্জনার সর্ব্ববিধ প্রয়োজন সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে—'an instrument of many stops' হইতে পারিয়াছে—সে রীতি 'সাধু'ও নয় 'কথ্য'ও নয়, তাহার নাম আদর্শ-বাংলা-গদ্যরীতি; এই রীতি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই তিনজন প্রতিভাশালী লেখকের প্রতিভায় ক্রমপরিণতি লাভ করিয়াছে, তথাপি ইহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমী যুগের এই যে গদ্য—যাহাকে 'অসাধু'-অপবাদ দিবার জন্যই এক্ষণে বেশী করিয়া 'সাধু' বলা হয়—এই গদ্যের ভাষা ও ধ্বনিসম্পদ আধুনিক বাংলাসাহিত্যকে সাহিত্যপদবীতে আরূঢ় করিয়াছে। ভাষার এই গঠন ও তজ্জনিত ধ্বনি-গৌরব যদি বাঙ্গালীর সাধ্যায়ত্ত না হইত, তবে আজ আমরা জগতের সাহিত্য-সভায় যেটুকু স্থান দাবী করিতেছি, তাহাও সঙ্গত হইত না। যে রবীন্দ্রনাথকে আজ আমরা বিশ্বের সমক্ষে খাড়া করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকি, সেই রবীন্দ্রনাথেরও সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ হয় এই গদ্যকে আশ্রয় করিয়া, এবং তাঁহার সমগ্র কাব্যকীর্ত্তির মহনীয় অংশ এই রীতি ও এই ধ্বনি-ছন্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই এই গদ্যে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন—১৫ হইতে ২১।২২ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি যে গদ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই নিজ শক্তির পরিচয় পাইয়া সাহিত্য-সাধনার প্রবল প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে, এমন কি তাহার অনেক পরেও, কবিতা-রচনায় তাদৃশ সাফল্য লাভ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের এই ঘটনা অর্থহীন নহে। তারপর তিনি বিহারীলালের আদর্শে যে ভাষা ও সুর লইয়া গীতিকাব্য-রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরে সেই ভঙ্গি একরূপ পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিহারীলালের কাব্যমন্ত্রটুকু মাত্র বজায় রাখিয়া, তিনি বাংলা কাব্যে যে যুগান্তর আনয়ন করেন, তাহাতে সাধুভাষা

ও তাহার ধ্বনি-বিন্যাস তাঁহার বাণীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। তাঁহার কাব্যের ভাষাও কালিদাসের বাংলা সংস্করণ, এবং তাহার প্রধান ছন্দ-ভঙ্গি হইল পয়ার কিম্বা মাত্রাবৃত্ত পয়ার। মধুসূদন যেমন পয়ারকেই—অর্থাৎ বাংলা-কাব্যের বনিয়াদী ভদ্র ছন্দটিকেই সর্ব্বকর্ম্মের উপযোগী করিয়া বিচিত্র ধ্বনিসম্পদে মণ্ডিত করিলেন, তাহাতে নাটক ও কাহিনীজাতীয় কাব্যে কবিকল্পনা মুক্তিলাভ করিল; তেমনই রবীন্দ্রনাথও সেই পয়ারকে গীতি-কাব্যের উপযোগী সুর-ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত করিবার কৌশলটি আবিষ্কার করিয়া কাব্যের অপর রূপটি উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন। বাংলায় এতদিন কবিতার আকারে গান রচিত হইত, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় আমরা বাংলায় কাব্যের বহু-বিচিত্র গীতি-ছন্দ লাভ করিলাম। মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে সাহিত্য, তাহা এমনই করিয়া সাধুভাষা ও সাধু-ভঙ্গির সেবা দ্বারা পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই পূর্ণাবয়ব হইয়া উঠিয়াছিল।

অতঃপর ভাষার এই রীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অতিশয় আধুনিক মত যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিব। রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি আবার ছন্দ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। এই গবেষণার ফলে তিনি এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যাহা মানিয়া লইলে আধুনিক বাংলাসাহিত্যের মূলোৎপাটন করিতে হয়। কথ্য ও সাধুভাষার আসল প্রভেদ উভয়ের ধ্বনি-প্রকৃতির মধ্যে, এই ধ্বনিই ভাষার সর্ব্বস্ব, বিশেষতঃ নবযুগের সাহিত্যসৃষ্টির মূলে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল এই ধ্বনির ঐশ্বর্য্যবিধান। ভাবব্যঞ্জনার অতি নিগূঢ় তত্ত্ব ভাষার ধ্বনি-রূপের মধ্যেই নিহিত আছে। ভাবসংহতি এবং রসাত্মক ধ্বনিবিন্যাসের প্রয়োজনে সে-যুগের প্রতিভা ভাষার সংস্কৃত-আদর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, কারণ গ্রাম্য সাহিত্যের কথ্যভাষা বা চলতি-বুলির ধ্বনিপ্রকৃতিই দীন। বস্তুতঃ, ভাষাকে উৎকৃষ্ট সাহিত্য-রচনার উপযোগী করিয়া তোলাই সে যুগের সমস্যা ছিল, সেই সমস্যার সমাধানই সে যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ বাংলা-ছন্দের আলোচনায় যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে গতযুগের সমগ্র সাহিত্য অপদস্থ হইয়া পড়ে। এই আলোচনায় তিনি চলতি-ভাষার ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করিয়া তাহাকে এতখানি গৌরব দান করিতে প্রস্তুত যে, অতঃপর সাহিত্য-রচনায় সাধুভাষার প্রয়োজনই অস্বীকার করিতে হয়। চলতি

ভাষার প্রতি তাঁহার পক্ষপাত ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু তৎসত্বেও তিনি সাধুভাষার প্রয়োজন অস্বীকার করেন নাই। ১৩৩৮ সালের 'পরিচয়' পত্রিকায় তিনি বাংলা-ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—

> সভার রীতি ও ঘরের রীতিতে কিছু ভেদ থাকেই। শকুন্তলার বাকল দেখে দুষ্মন্ত বলেছিলেন, কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্—কিন্তু যখন তাঁকে রাজ-অন্তঃপুরে নিয়েছিলেন তখন তাঁকে নিশ্চয়ই বাকল পরান নি। তখন শকুন্তলার স্বাভাবিক শোভাকে অলঙ্কৃত করেছিলেন, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নয়, মর্য্যাদা রক্ষার জন্য।

১৩৩৮ সালে ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের মত। প্রাকৃত-বাংলার প্রতি পক্ষপাত থাকিলেও তখন তিনি সংস্কৃত-বাংলার রাজ-মর্য্যাদা স্বীকার করিতেন, এবং বাংলাভাষার এই দুইপ্রকার ধ্বনিকেই ক্ষেত্রভেদে সমান প্রয়োজনীয় মনে করিতেন; 'শুদ্ধির গোময়-লেপনে'—অর্থাৎ চল্‌তি-ভাষার রীতিই যে বিশুদ্ধ রীতি—এই অজুহাতে, সমস্ত একাকার করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না।

কিন্তু গত বৈশাখের (১৩৪১ সাল) 'উদয়ন' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের যে বক্তৃতাটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে—"আমরা ভুষি পেলেই খুশি রব, ঘুষি খেলে আর বাঁচব না"—ঈশ্বর গুপ্তের এই ছড়াটিকে উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

> "কেবল এর হাসিটা নয়, ছন্দের বিচিত্র ভঙ্গিটা লক্ষ্য কোরে দেখবার বিষয়। অথচ এই প্রাকৃত-বাংলাতেই 'মেঘনাদবধ কাব্য' লিখলে যে বাঙালীকে লজ্জা দেওয়া হোত সে কথা স্বীকার করব না। কাব্যটা এমন ভাবে আরম্ভ করা যেত—
>
> যুদ্ধ যখন সাঙ্গ হোল বীরবাহু বীর যবে
> বিপুল বীর্য্য দেখিয়ে শেষে গেলেন মৃত্যুপুরে
> যৌবনকাল পার না হোতেই—কও মা সরস্বতী,
> অমৃতময় বাক্য তোমার—সেনাধ্যক্ষ পদে
> কোন বীরকে বরণ কোরে পাঠিয়ে দিলেন রণে
> রঘুকুলের শত্রু যিনি রক্ষকুলের নিধি।
>
> এতে গাম্ভীর্য্যের ত্রুটি ঘটেছে একথা মানব না।"

এই উক্তির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ গত যুগের সমগ্র সাহিত্যকে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সেকালের লেখকেরা গোড়াতেই ভুল করিয়াছিলেন; মধুসূদনের নূতন ভাষা ও ছন্দের কোনও প্রয়োজন ছিল না, তাহা অপেক্ষা এই ভাষা ও ছন্দের গাম্ভীর্য্য কম নয়।

গাম্ভীর্য্যের 'ত্রুটি ঘটেছে একথা মানব না'—এই যুক্তিই কি যথেষ্ট ? এই যুক্তির উপরে নির্ভর করিয়া কোনও সাহিত্যিক সন্দীপ যদি 'বলাকা' কবিতাটির রীতি বদলাইয়া দেয়, অথবা ঘটাং ঘটাং করিয়া তাল-ঠোকা ছন্দে 'শাজাহান' কবিতাটি পড়িতে থাকে, তবে তাহার সেই বীরত্বব্যঞ্জনায় 'বলাকা'র কবিতা-গুলির সুর কি অক্ষুণ্ণ থাকিবে ? রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদ-বধের মাত্র কয়েক ছত্র এই অপূর্ব্ব ছন্দে প্যারাফ্রেজ করিয়াছেন, সমগ্র মেঘনাদ-বধ কাব্যখানি একটানা এই ভেক-প্রলম্ফী ছন্দে রচনা করিলে কেমন হয়, তাঁহাকে লিখিয়া দেখিতে বলি না—কল্পনা করিতে বলি।

এই বক্তৃতাটিতে, গদ্যেও চলতি-ভাষার প্রতাপ প্রতিপন্ন করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ যুক্তি ও দৃষ্টান্তের কোনটাই বাকী রাখেন নাই। সাধুভাষার প্রতি সরোষ কটাক্ষ করিয়া এক স্থানে তিনি বলিতেছেন—

> "যে বাংলা আমাদের মায়ের কণ্ঠগত, লেখনীগত নয়, ইংরাজীর মতো তারও সুর ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাতে। আজ সাধুভাষার ছন্দে জোর দেবার অভিপ্রায়ে অভিধান ঘেঁটে যুক্তবর্ণের আয়োজনে লেগেছি, অথচ প্রাকৃত বাংলায় হসন্তের প্রাধান্য আছে বলেই যুক্তবর্ণের জোর তার মধ্যে আপনি এসে পড়ে।"

উপরি-উদ্ধৃত উক্তিটি সাধুভাষার বিরুদ্ধে যে একটি আক্রোশমূলক অপবাদ তাহা এতখানি আলোচনার পরে বলা নিষ্প্রয়োজন। এই উক্তিটির মধ্যে কয়েকটি অতিশয় অযথার্থ কথা আছে। 'অভিধান ঘেঁটে যুক্ত-বর্ণের আয়োজন'—ইহা কোন্ যুগের সাধুভাষার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ? যদি তৎসম শব্দ ব্যবহার করিলেই 'অভিধান ঘাঁটা' হয়, তবে বাংলাভাষা দাঁড়াইবে কিসের উপর ? 'অভিধানে'র শব্দগুলা বাদ দিয়া যে খাঁটি গৌড়ীরীতির উদ্ভব হইবে, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্য-রচনাগুলি তর্জ্জমা করা সম্ভব ?—করিলে রবীন্দ্রনাথকে আর চেনা যাইবে ? এই প্রসঙ্গে তিনি আর একটি কথা বলিয়াছেন—"বাংলায় হসন্তের প্রাধান্য আছে বলেই যুক্তবর্ণের জোর তার মধ্যে আপনি এসে পড়ে"—তাহা আদৌ সত্য নহে। হসন্তের জোর আর যুক্ত-বর্ণের জোর, দুইয়ের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র—এই জন্যই একই ভাষা দুইটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে; যদি এক হইত, তবে ভাষার এই দুই রীতি লইয়া কোন সমস্যাই থাকিত না। এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনার স্থান এখানে নাই; তথাপি যাঁহাদের কেবল ছন্দজ্ঞান নয়—ছন্দবোধও আছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য

করিয়াছেন যে, হসন্তের ও যুক্তবর্ণের বিন্যাস-জনিত ছন্দধ্বনি এক নহে; রবীন্দ্রনাথের মাত্রাবৃত্ত ও ছড়ার ছন্দে রচিত কবিতার ধ্বনি-প্রকৃতি স্বতন্ত্র। একটি সাধুরীতির পয়ারজাতীয় ছন্দেরই রূপভেদ, অপরটি চলে চল্‌তি-ভাষার চালে। অতএব রবীন্দ্রনাথের এ উক্তিও যথার্থ নহে।

এইবার সংক্ষেপে দুইচারি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রাকৃত বা চলতি-বাংলার যে ধুয়া উঠিয়াছে তাহা যে সাহিত্যের প্রয়োজনে নহে, একথা সাহিত্যিকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। তথাকথিত প্রাকৃত-রীতিও যে খাঁটি বাংলা নয়, তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না—খাঁটি বাংলা কেহ লেখে না এবং সম্ভবতঃ আজিকার দিনে কেহ বলেও না। যে বাংলাকে রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ মহারথিগণ চলতি-বাংলা বলিয়া খাড়া করিতেছেন, তাহা অপেক্ষা কৃত্রিম ভাষা কল্পনা করাই যায় না—সাধুভাষা তাহার তুলনায় অতি সহজ ও স্বাভাবিক। বাংলাভাষার যে দুইটা রীতি, কি ছন্দে কি রচনা-ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা অস্বীকার না করিলে, এবং একই ভাষার পক্ষে এই দ্বৈত-পদ্ধতি অদ্ভুত বলিয়া মনে হইলেও, এই দুই রীতির মধ্যে কোন্‌টি প্রশস্ত রীতি—সর্ব্ববিধ ভাবব্যঞ্জনার পক্ষে, এবং পূর্ণ শক্তি ও সৌন্দর্য্যগুণের আধার হিসাবে, কোন্ রীতি সুপরীক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেছে—সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশমাত্র আর নাই। যাহাকে খাঁটি কথ্যরীতি বলা যাইতে পারে, সে ভাষা মৌখিক বক্তৃতা, উপদেশ, রূপকথা, বৈঠকী আলোচনার ভাষা হইতে পারে; বিষয়ের গুরুত্ব ও মর্য্যাদা অনুসারে সাধু বা চলতি-ভাষার ব্যবহার লেখকের রুচি অনুযায়ী হইলে ক্ষতি নাই। কিন্তু সাহিত্যরসিকমাত্রেই স্বীকার করিবেন—সাধুভাষায় সকল কাজই চলিতে পারে, চলতি-ভাষা একেবারে বর্জ্জন করিলে ক্ষতি নাই। বাংলাসাহিত্যের আধুনিকতম উৎকৃষ্ট গল্প ও উপন্যাস ইহার সাক্ষী। কিন্তু চলতি-ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতি এমনই যে, তাহাতে ভাব-চিন্তা বা কল্পনার বিশিষ্ট গৌরব রক্ষা করা যায় না। স্থানাভাবে আমি একটিমাত্র দৃষ্টান্ত এখানে দিব, এবং ইচ্ছা করিয়াই একটি কবিতার উল্লেখ করিব। রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' কবিতাটি সকলেই পড়িয়াছেন, এবং সম্ভবতঃ অনেকেই ইহার আবৃত্তিও শুনিয়াছেন। এই কবিতাটি সাধুভাষায় ও সাধুছন্দে রচিত। ইহার কথাবস্তু ও বর্ণনায়, ভাবের মত ভাষারও সকল স্তর সন্নিবিষ্ট আছে; অতি সহজ ও সরল নাটকীয় কথাবার্ত্তা

হইতে ভাব-কবিত্বময় উচ্ছ্বাসের অলঙ্কৃত বাণী একটি অখণ্ড ধ্বনিপ্রবাহে মিলিত হইয়া এই রচনাটিকে একটি অনবদ্য কাব্য-রূপ দান করিয়াছে। এত সরল, এত জীবন্ত অথচ এমন রস-গভীর কথাচিত্র অঙ্কিত করিবার পক্ষে সাধুরীতি কিছুমাত্র বাধার সৃষ্টি করে নাই, বরং অন্য রীতিতে তাহার ধ্বনিব্যঞ্জনা ক্ষুণ্ণ হইত, 'টরেটক্কা' ছন্দে ও কথ্যভাষার ভঙ্গিতে উহা যে কি হইত, তাহা কল্পনা করাও যায় না। গদ্যে ও পদ্যে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে যাহাতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে, ভাষার এই সাধু-রীতিই প্রশস্ত রীতি, তাহা বর্জ্জন করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই—বরং সে রীতি নষ্ট করিলে সাহিত্য-সৃষ্টিই বাধা পাইবে। এই সাধুরীতিকে সাধু বা পণ্ডিতী-রীতি বলিয়া নাসা কুঞ্চিত করিবার কোনও কারণ নাই—এই রীতিই বাঙ্গালীর চিত্ত-প্রকর্ষের নিদান, ইহাই তাহার ভাবচিন্তা ও কল্পনাকে মার্জ্জিত, তাহার সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশকে অব্যাহত, এবং তাহার মনের মেরুদণ্ডকে দৃঢ় ও ঋজু করিয়াছে। ভাষার রীতি একটা খেলা বা খেয়ালের বস্তু নয়—ব্যক্তিবিশেষের খুশী বা বিলাসবাসনা যদি এমন করিয়া কোনও জাতির ভাষাকে গড়িতে বা ভাঙ্গিতে চায়, ও পারে —তবে সে জাতির মৃত্যু অবধারিত। বাঙ্গালী কি সত্যই মরিতে বসিয়াছে?

সাহিত্যের আসরে

(১)

সাহিত্য মুখ্যভাবে আলোচনার জিনিস নয়, উপভোগের জিনিস—একথা মনে রাখিলে সাহিত্যকে লইয়া দল বাঁধা, অথবা বারোয়ারী-যাত্রার মত যখন-তখন যেখানে-সেখানে আসর বসাইবার জন্য মণ্ডপ তুলিবার উৎসাহ হইবে না। কারণ, সাহিত্য উপভোগ করিবার মত সংস্কার ও সংস্কৃতি সকলের নাই—সামাজিক ও রাজনৈতিক বচসা যেমন সকলেই করিতে পারে, সাহিত্যকে লইয়া তাহা করিতে পারিলে সাহিত্যই উবিয়া যায়। অতএব সাহিত্যের আসরে বসিয়া সর্ব্বাগ্রে এই কথাটি বলিতে হইল বলিয়া কেহ যেন ক্ষুব্ধ না হন। এই সঙ্গে ইহাও স্মরণ করিয়া সকলকে আশ্বস্ত হইতে বলি যে, সাহিত্যরসিক হইতে না পারাটা যতই লজ্জার বিষয় হউক, মানুষের আত্মগৌরব বৃদ্ধি করার জন্য আরও কত বস্তু রহিয়াছে—সেখানে সিদ্ধিলাভ যে-শক্তির দ্বারা সম্ভব, তাহা মাত্রাভেদে অনেকেরই আছে। সাহিত্য-রসবোধের যে সাক্ষাৎ জ্ঞাতি-শত্রু, তাহার নাম পাণ্ডিত্য;—আপনারা এ রসে বঞ্চিত হইলে, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য পাণ্ডিত্য-চর্চ্চা করিতে পারেন। এ ছাড়া আরও কত পথ রহিয়াছে। প্রভুত্ব ও ধনশক্তি আরও বড় পুরুষার্থ, তাহার সাধন করিলে, গরিব কবি বা সাহিত্যিককে অনুগ্রহ-ভাজন করিয়া, তাহার দ্বারাই স্ব-মহিমা কীর্ত্তন করানো যায়। সমাজে সাহিত্যরসিক বা কবির সম্মান কতটুকু? কবি হইয়া সংসারে কেহ সত্যকার প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত অতি বিরল; কবির শক্তি, বা তাঁহার ব্যক্তি-চরিত্রকে সমাজ কোন কালেই শ্রদ্ধা করে না; গানের ওস্তাদ বা নটনটীকে এক হিসাবে আদর করিলেও, তাহাদিগকে যেমন কেহ সত্যকার শ্রদ্ধা করে না, তেমনই কবির প্রতিভায় মুগ্ধ হইলেও সমাজ তাহার সহিত একটা নিরাপদ ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলে—সে যে একটা অস্বাভাবিক চরিত্র, এবং সেরূপ শক্তি যে কোন কাজের নয়, ইহাই মনে করে। অতএব, সাহিত্যের পক্ষ হইতে যদি বলা যায়, এটা ভিড় করিবার স্থান নয়,—রস উপভোগ করিবার শক্তি সকলের নাই, তাহা হইলে সংসার ও সমাজের তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই, বরং পাগলের দলে ভিড়িবার সখ না হওয়াই শ্রেয়।

কাব্য যে লক্ষ্মীছাড়ার কীর্ত্তি, অর্থাৎ যাহারা ও রস সৃষ্টি করে, তাহারা যে সাক্ষাৎ সংসার-যুদ্ধে অপারগ হইয়া দূরে সরিয়া থাকে, অতএব কিছুই লাভ করিতে পারে না—ইহা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যে সংসার-বিরাগী—এ কথা সত্য নহে; বরং যাহা 'রাগে'র আতিশয্যের ফল, তাহাকেই আমাদের বৈরাগ্য বলিয়া ভ্রম হয়। জগৎ ও জীবনের প্রতি তাহাদের সেই প্রেম খাঁটি বলিয়াই স্বার্থসাধনের প্রবৃত্তি লোপ পায়,—যে 'অহং' জগতের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়, সে অহং তেমন জাগ্রত হইতে পারে না বলিয়া, কবিরা সংসারে নির্ব্বোধ ও দুর্ব্বল কৃপার পাত্র হইয়া থাকেন। তাই বলিয়া, কবিরা শক্তিহীন নহেন—কেবল ইহাই সত্য যে, সংসার যে-শক্তির ভজনা করে, সে শক্তি কবিদের নাই। সেরূপ শক্তিমান হইতে হইলে ছোট-বড় নানা আকারের স্বার্থকে পরম-পুরুষার্থ করিতে হয়, এবং যাহার অহং যত বেশী, সে-ই তত শক্তিমান হইয়া থাকে। কবিরা এইরূপ শক্তিমান নয় কেন, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু জীবনকে আরও পূর্ণ, আরও গভীরভাবে ভোগ করিবার শক্তি তাঁহাদেরই আছে—বাহিরের ঐ যুদ্ধ একরূপ জয় করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের অন্তরের সুখ আরও সত্য, আরও গভীর। তাই কবির মুখেই আমরা শুনি—

এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ
চাহিনে করিতে বাদ প্রতিবাদ,
যে ক'দিন আছি মানসের সাধ
মিটাব আপন মনে;
যার যাহা আছে তার থাক্ তাই,
কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই,
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই
একটি নিভৃত কোণে।

ফার্সী কবি হাফেজের সঙ্গে তৈমুরলঙ্গের সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের যে একটি গল্প প্রচলিত আছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে। কবি হাফেজ যে সৌন্দর্য্যধ্যানে মশগুল, যাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি ধরণীর আধিপত্যও তুচ্ছ করিয়াছেন, শতরাজ্য-বিজয়ী তৈমুর—সংসারচক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভীতি ও ভক্তিভাজন সেই শক্তিমান পুরুষ—তাহা বুঝিতে পারেন নাই, তাই

হাফেজকে ভং সনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "মূর্খ তুমি! তাই তোমার প্রেয়সীর গালের একটি তিলের বদলে তুমি আমার বোখারা সমরখন্দের অতুল বৈভব বিলাইয়া দিবার কল্পনা করিয়াছ—সে বৈভব কখন চোখে দেখিয়াছ? দেখিলে এত বড় স্পর্দ্ধার কথা বলিতে না।" কিন্তু হাফেজ যে-রূপে মুগ্ধ, সে যে মানুষের হৃদয়-মন-আত্মার কত বড় আরাম, তাহা তৈমুর ও তৈমুর-উপাসক সাধারণ নরনারী কি বুঝিবে? আমিও বুঝাইতে পারিব না, কেবল কবিদের সাক্ষ্যমাত্র উদ্ধৃত করিতে পারি। আমাদেরই একজন কবি সেই আনন্দে, সেই অতুল সৌভাগ্যগর্ব্বে বলিতে পারিয়াছেন—

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক্ গে এ বসুমতী যার খুসী তার!

আর একজন এই সৌন্দর্য্য-বিহ্বল অবস্থার আভাস দিয়াছেন এই কয়টি কথায়—

ভাবিলাম মনে, ধরণী দেখায়ে দিল
ঐশ্বর্য্য আপন। কামনার সম্পূর্ণতা
ক্ষণতরে দেখা দিয়ে গেল।—ভাবিলাম
কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর,
পুরুষের পৌরুষ-গৌরব, বীরত্বের
নিত্য কীর্ত্তিতৃষা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের কাছে;
পশুরাজ সিংহ যথা সিংহবাহিনীর
ভুবনবাঞ্ছিত অরুণ চরণতলে।

এইজন্যই কবিদের মনে কোন দৈন্য নাই—সংসারের উপেক্ষাও তাঁহারা উপেক্ষা করিয়া থাকেন। সত্য বটে, অতিশয় আত্মসচেতন লিরিক কবিদের, কেহ কেহ যেন নিজেদের কাছেই নিজেদের মহিমাবোধ অটুট রাখিবার জন্য সংসারকে লক্ষ্য করিয়া সগর্ব্বে আত্মঘোষণা করেন—কবির আসন যে কত উচ্চে, তাহা অকৃতজ্ঞ ও অবোধ সমাজকে স্মরণ করাইয়া দেন। ইংরেজ কবি শেলির সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করুন—

"Poets are the trumpets which sing to battle, poets are the unacknowledged legislators of the world."

—এই কথাই একজন সামান্ত কবিও আরও উচ্চ-স্বরে, আবেগকম্পিত বাক্যঝঙ্কারে ঘোষণা করিয়াছেন—তাহাতে মনে হয়, সংসারকর্তৃক উপেক্ষিত অভিমানী কবি যেন আশ্বাস ও আত্মপ্রসাদের শেষ অবলম্বন খুঁজিতেছেন; কথাগুলি সত্যই বড় চটকদার—

We are the music-makers
And we are the dreamers of dreams,
Wandering by lone sea-breakers,
And sitting by desolate streams ;—
World-losers and world-forsakers,
On whom the pale moon gleams :
Yet we are the movers and shakers
Of the world for ever, it seems.
With wonderful deathless ditties
We build up the world's great cities ;
And out of a fabulous story
We fashion an empire's glory :
One man with a dream, at pleasure,
Shall go forth and conquer a crown,
And three with a new song's measure
Can trample a kingdom down.

আমাদের দেশে আধুনিক কালের যিনি শ্রেষ্ঠ কবি, তিনিও অন্তরে এই উপেক্ষার জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পান নাই—বরং আরও স্পষ্ট ভাষায় সে কথা বলিয়াছেন, এবং আপনার মত করিয়া তাঁহার সান্ত্বনাসৃষ্টিও করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব-মুকুট।
হৃদি-শয্যাতল
শুভ্রদুগ্ধফেননিভ, কোমল শীতল—
তারি মাঝে বসায়েছ; সমস্ত জগৎ

বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ
সে অন্তর-অন্তঃপুরে।
সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয় যৌবনময় দেবতাসমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা।
হেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন; সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্র ভার—কত অনুগ্রহ
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ;
অয়ি মহীয়সী মহারাণী,
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান! আজি
এই যে আমারে ঠেলি' চলে জনরাজি
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে
নিশিদিন তোমার সোহাগ-সুধাপানে
অঙ্গ মোর হয়েছে অমর?

—এখানে সমাজ ও সংসারকে কবি কোন জবাব দেন নাই,—নিজেরই অন্তরকে আশ্বস্ত করিয়াছেন, নিজেরই মহিমাবোধ জাগ্রত করিয়াছেন।

সংসারের অবহেলায় কবিগণের এই যে অভিমান, ইহা কবির নয়—কবি-মানুষটির দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের আত্মসচেতন মনোভাব। কবিদের ইষ্টদেবতা পরম-সুন্দর, তাঁহার উপাসনায় সকল অসৎ সৌন্দর্য্যধাতুতে পরিণত হইয়া সৎ হইয়া যায়। সেজন্য কবিহৃদয়ের আশ্বাস এত দৃঢ়, কবির প্রেম এমন সর্ব্বজয়ী ও শক্তিশালী যে, কবিচরিত্রে বা কবিরচিত কাব্যে কোথাও অহঙ্কার বা দম্ভ অভিমান থাকিতে পারে না; সে শক্তি পূর্ণশক্তি বলিয়াই তাহাকে আত্মঘোষণা করিতে হয় না, কাব্যও বিনা যুদ্ধে আমাদিগকে জয় করিয়া লয়। কেবল বাক্যের উদ্দীপনা, ছন্দের ঝঙ্কনা, অথবা কোন আইডিয়া বা আবেগের উত্তেজনা—কবিশক্তির লক্ষণ নয়। জগতের এক শ্রেষ্ঠ কবি সেই শক্তিকে এইকয়টি কথায়—ব্যাখ্যা নয়—একেবারে রূপ দিয়াছেন—

'Tis the supreme of power:
'Tis might slumbering on its own right arm.

—অর্থাৎ, সে শক্তি সকল শক্তির উপরে—সে যেন আপনারই দক্ষিণ বাহুর উপরে মাথাটি রাখিয়া আধ-নিদ্রায় মগ্ন হইয়া আছে। (তাহার হুঙ্কার

নাই, আস্ফালন নাই, আপন পূর্ণতাভরে সে আপনার মধ্যে স্থির হইয়া আছে।)

২

সভা-সমিতির বক্তৃতায়, বা পত্রিকাদির প্রবন্ধশালায়—যথার্থ সাহিত্য-রসাস্বাদন যে কেন হইতে পারে না, সেই কথা লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম, এবং কথা হইতে কথান্তরে গিয়া অনেক অবান্তর কথাও হয়তো বলিয়াছি। সাহিত্যের রসালাপ করিতে হইলে উপযুক্ত আসর চাই, এবং সে আসরে জনতা কম হইবারই কথা। তথাপি এমন কথা বলি না যে, গুহ্যসাধনার ভৈরব-চক্রের মত, সেখানে কেবল কয়েকটি দীক্ষিত সাধকেরই মাত্র আসন থাকিবে। তেমন আসরও হইতে পারে না এমন নয়, কিন্তু তাহার সহিত সমাজ-জীবনের সম্বন্ধ নাই—তাহাকে আদর্শ করিলে আপনাদের মত সাধু-সজ্জনের সঙ্গলাভ আর ঘটিবে না। যাঁহারা সেই রসিক-শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের কোনরূপ আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন হয় না, কোন জিজ্ঞাসা আর তাঁদের নাই; তাঁহারা কেবল চক্রে বসিয়া একত্রে ঢালেন ও পান করেন—একেবারে বুঁদ হইয়া থাকেন, কথা কহিয়া নেশাটিকে তরল করিতে চান না। এ অবস্থা খুবই কাম্য বটে, কিন্তু আমরা অনেকে এখনও কথা কহিতে চাই—জানিতে চাই, বুঝিতে চাই; এবং হয়তো বুঝি না বলিয়াই বুঝাইবার জন্য অধীর হই। এজন্য সেরূপ আসরে আমাদের চলিবে না। একজন সুফী কবি এইরূপ রসপানের আসরকে 'শরাবখানা'র সহিত উপমিত করিয়া যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা লোভনীয় সন্দেহ নাই, যথা—

একটু তফাতে ব'সে আছে দেখি ইয়ারের দল
একদম মাতোয়ারা—
উন্মাদ যত, নেশায় বেহুঁশ—প্রাণ ভ'রে পিয়ে
পীরিতির রসধারা।
নাই করতাল, বেহালা, সারং—মজলিসে তবু
ফুর্তির কমি নাই;
বোতল, গেলাস, মদ দেখি না যে—তবু ঢালে আর
পান করে একজাই।

এই শরাবখানার যিনি অধিষ্ঠাত্রী, সেই রূপসী তরুণী সাধক-কবিকে সেখানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আগেভাগেই বলিয়া দিলেন—

অবিশ্বাসীর আসর এটা যে—সুরা দিয়ে হয়
অতিথির সৎকার,
শুরু হতে সেই আখের অবধি হেথায় কেবলই
অবাক—চমৎকার!
পূজা-নমাজের ঘর ছেড়ে দিয়ে ব'সে পড় এই
শরাব-খানার মাঝে,
খুলে ফেলে ওই দরবেশ-বেশ সাজিতে হবে যে
ফুর্ত্তিবাজের সাজে।
কাঁধে পর' দেখি কাফেরের সুতা, ফেলে দাও ওই
পুঁথি আর জপমালা;
পেয়ালার মদ ভরপুর পিও—চলে এস ভেঙে
ধর্ম্মের আটচালা।
চুর হয়ে শেষে চুমাটি বাড়াও, গালে গাল দিয়ে
কথা ক'ব কানে-কানে,—
একটি সে কথা! জান্ তর্ হয়ে ত'রে যাবে তার,
যদি বোঝ তার মানে।

ভাগ্যবান পুণ্যবান কবির আর উপায় কি? তাই তিনিও বলিতেছেন—

করিলাম তাই! চাও যদি ভাই, আমারি মতন
দিল্‌খানা লালে-লাল,
এক কৌটা এই খাটির লাগিয়া খোয়াও সকলে
ইহকাল পরকাল।

এমন করিয়া ইহকাল পরকাল খোয়াইতে আমরা নিশ্চয় রাজি হইব না, ততখানি রসাবস্থার অধিকারী আমরা এখনও হই নাই; অতএব একটু নিম্নাধিকারে থাকিয়া এখনও পুঁথি ও জপমালার দাসত্ব করিব। আমাদের আসরে কেবল এমন ব্যক্তিকে চাই, যিনি ততখানি রসপিপাসু না হইলেও এই রসের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইবেন; রসালাপের মধ্যে তাঁহার যেন আর কোন অভিপ্রায় না থাকে—অন্তত এই সময়টুকুর জন্যও তাঁহার চিত্ত যেন সকল স্বার্থবুদ্ধি ও বৈষয়িক সংস্কার হইতে মুক্ত থাকে, ব্যক্তিগত মতামতের অভিমান বা কোনরূপ লাভের লোভ কেহ যেন এখানেও সঙ্গে করিয়া না আনেন। ব্যবসায়ে সুবিধা,

বড়লোকের দৃষ্টি-আকর্ষণ, দলবিশেষের দলপতি হইবার জন্য নিজের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি-করা, কবি, ভাবুক বা চিন্তাশীল লেখক বলিয়া শীঘ্র একটা নাম করিবার আকাঙ্ক্ষা, পত্রিকা-সম্পাদকদিগের কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত করিবার, অথবা ততোধিক কঠিনহৃদয়া আধুনিক মালবিকা-চতুরিকাদিগের অন্তরে একটু প্রবেশপথের আশা,—এ সকলই ত্যাগ করিতে হইবে। সাহিত্য যদি কেবল জ্ঞানের বিষয় হইত, তবে এতখানি চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন হইত না। কিন্তু এখানে কেবল তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি হইলেই চলিবে না, অন্তরের আর্দ্রতা ও ঋজুতা চাই, সত্যকার পিপাসা চাই,—সে পিপাসা কেবল সাগর-শোষণের দম্ভেই চরিতার্থ নয়; বরং যে বিন্দু-মাত্র আস্বাদন করিতে পারিলে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়, সেই বিন্দুটিকে রসনায় ধরিবার জন্য ব্যাকুল হওয়া চাই। ইহাকে পাইয়াছে এমন লোক খুবই কম হইবার কথা; কিন্তু পায় নাই—পাইতে চায়, এমন লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়া আশ্চর্য্য নয়। অতএব সাহিত্যিক আলাপের আসর খুব ছোট হইবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা জনসভার মত বৃহৎ হইতে পারে না।

সাহিত্যের রসচর্চ্চা করিবার জন্য এইরূপ আসরের প্রয়োজন আছে, তাহা মানি; কাব্যামৃত-রসাস্বাদ ও সজ্জন-সঙ্গ, এই দুইটিই সংসার-বিষবৃক্ষের অমৃতময় ফল, আর সকলই বিষ—এ কথা আজিকার দিনে সকলে স্বীকার না করিলেও, আপনারা যে কয়জন আজ এখানে ফুটবল-ম্যাচ ও অন্য নানা লোভনীয় বা লাভজনক দেখা-সাক্ষাৎ ত্যাগ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন,—তাঁহারা নিশ্চয় ইহার কিছুও স্বীকার করিবেন। এখন কথা হইতেছে এই যে, এমন আসরে আপনারা কেমন আলাপ আশা করেন? আমি জানি, অনেক—অনেক কেন, প্রায় সকল—সাহিত্যিক অধিবেশনেই অভিভাষণ ও বক্তৃতাগুলি নিতান্ত আনুষ্ঠানিক বলিয়া শ্রোতৃবর্গ তাহা কোনমতে সহ্য করিয়া থাকেন। বড় বড় সাহিত্যিকেরা যখন তাঁহাদের বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে, ভাব, ভাষা, তথ্য ও তত্ত্বের চরকিবাজি করিতে থাকেন, এবং আপন আপন কৃতিত্বের ক্রমিক উন্মাদনায় দেশ কাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া শেষে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে আত্ম-সংবরণ করেন, তখন শ্রোতৃবর্গ এই ভাবিয়া রোমাঞ্চ-কলেবর হন যে, এই মরুভূমিতে শীতল উৎসের দর্শন মিলিবে—এখানেও নৃত্য ও গীতের প্রচুর ব্যবস্থা আছে। হয়তো সেই নৃত্যকলা ও অন্যান্য কলা [illegible]

মতই বারিহীন, তথাপি ওই বক্তৃতার মত তাহা সত্ত্বপ্রাণঘাতী নয়। ইহাও জানি যে, আপনাদের এই বৈঠক তেমন বৃহৎ ব্যাপার নয়; ইহা শাখা ও প্রশাখার, কলার প্রদর্শনী ও কলাবিদ্‌গণের বিশেষত্ব-বাহুল্যে, পুষ্পোদ্যানকে ফলবান বৃক্ষ-বাটিকায় পরিণত করে নাই; আপনারা সত্যই একটু রসপান-অভিলাষে আসিয়াছেন। সে পক্ষে আমার পরামর্শ এই যে, এ আসরে কথার কচ্‌কচিকে গৌণ করিয়া কবিতা-পাঠ ও আবৃত্তি প্রভৃতিকেই মুখ্য করা হউক। নবীন সাহিত্যিকদিগের উৎসাহ-বৃদ্ধির জন্য তাঁহাদের রচনাও শুনিতে হইবে, কারণ যেখানে অজস্র মুকুলোদ্গম—সেখানে শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের কয়টি দৃঢ় বৃন্তে প্রস্ফুট কুসুমাকার ধারণ করিবে—সে সংবাদ লইবার জন্য সাহিত্যামোদী-মাত্রেরই উৎসুক হওয়া উচিত। কিন্তু যে সকল কাব্য-কুসুম পূর্ণস্ফুট ও অম্লান হইয়া আমাদের সাহিত্য-নন্দনে বিরাজ করিতেছে, তাহাদের গন্ধ-মধু পাঁচজনে মিলিয়া উপভোগ করাই এরূপ বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সুফী কবির শরাবখানায় যে কাজ হইয়া থাকে, তাহার অন্ততঃ কিছুও আমাদের অসাধ্য নয়; প্রত্যেকে প্রত্যেকের পাত্রে এক একটু কাব্যের রস ঢালিয়া দিবেন—পান করিবার সময়ে কোন কথার প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু পূর্ব্বে বা পরে সেই সুধার কিঞ্চিৎ গুণকীর্ত্তন করিলে স্বাদের মাধুর্য্য বৃদ্ধি হয়। সাহিত্যরস এমন করিয়া উপভোগ করিবার প্রয়োজন আছে। ইদানীং এরূপ রসচর্চ্চা বিরল হইয়া উঠিতেছে বলিয়াই, কাব্যের সহিত মানুষের হৃদয়ের যোগ সুস্থ ও সবল থাকিতেছে না। এক্ষণে কাব্যরস আফিম বা চণ্ডুর সামিল হইয়া উঠিতেছে; ঘরে বসিয়া একাকী, নিতান্ত অসামাজিকভাবে যাহার যেমন রুচি—কাব্যরস-সেবন হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে মনের তৃপ্তি হইলেও প্রাণের স্ফূর্ত্তি হয় না; এবং কাব্য-সাহিত্যের রসসম্ভোগে একটা বড় ত্রুটি থাকিয়া যায়—রস-সংবেদনা একটা সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকে বলিয়া, বিভিন্ন হৃদয়ে আবেদন-বৈচিত্র্যের মধ্যেই তাহার যে একটা সম্পূর্ণতর রস-প্রমাণ আছে, তাহা আর ঘটিতে পারে না। কবিতাকে এইরূপ যাচাইয়া লওয়ার প্রয়োজন অল্প নহে। অতএব এইরূপ সাহিত্যিক আসরের আমি যে একান্ত পক্ষপাতী, তাহা বলাই বাহুল্য।

৩

এখন আমি এ-আসরে কি বলিব? আমাকে যখন আপনারা এ সভার মঞ্চাসনে বসাইয়াছেন, তখন বুঝিতেছি যে, কচ্‌কচির ভারটা আমাকেই বহিতে হইবে। আমি পণ্ডিত নই, পাণ্ডিত্যের ব্যবসাদারী আমার সাধ্য নয়; আমি যাহা বলিব, তাহা আপনাদিগকে বুঝাইবার ছলে, নিজে কতটা বুঝিয়াছি তাহাই নিজের কাছে যাচাই করিয়া লইব। যদি আপনাদের কাছে পরিষ্কার হইয়া না উঠে, তবে বুঝিব, আমার নিজের কাছেও তাহা পরিষ্কার হইয়া উঠে নাই। আমি আপনাদের সমক্ষে কাব্য-পরিচয়ের দুই চারিটি সাধারণ সূত্রের অবতারণা করিব; মনে হয়, আপনাদের রসপিপাসু মন সেটুকু বরখাস্ত করিতে পারিবে।

প্রথমেই কবির 'কল্পনা' সম্বন্ধে কিছু বলিব। কাব্যরস-আস্বাদনের সঙ্গে চিন্তাবৃত্তির যেমন কোন সম্বন্ধ নাই—ও রস আমরা যে রসনার দ্বারা আস্বাদন করি, সে রসনা যেমন মস্তিষ্কের সমদেশবর্ত্তী নয়—তেমনই, কবিরা যে দৃষ্টি দ্বারা জীবনের রস-রূপ আবিষ্কার করেন, তাহাও সাধারণ মনস্তত্ত্বের অধিকারভুক্ত নয়; এই দৃষ্টিকেই আমরা 'কল্পনা' বলি। কিন্তু কল্পনা কথাটার দুর্নাম আছে, এজন্য উহার অর্থ একটু শোধন করিয়া লইলে ভাল হয়। কবিদের দেখা—একরূপ অনুভূতি; সে অনুভূতি শুধুই দেহের অনুভূতি বা মনের অনুভূতি নয়—আরও ভিতরের, সে যেন একটা পূর্ণতর চৈতন্যের অনুভূতি। ইহাতে সাধারণ জ্ঞানবৃত্তির ক্রিয়া নাই বলিয়া ভাষায় তাহার পরিচয় ঠিক মত দেওয়া দুরূহ। আমাদের বাক্য ও বাক্‌-পদ্ধতি যে ক্রিয়ার প্রয়োজনে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহা হইতে ইহা ভিন্ন; তাই কবির এই দেখার প্রকারটিকে কবিও বাক্যের দ্বারা বুঝাইতে পারিবেন না; বুঝাইবার প্রয়োজনও হয় না, কারণ কবিরা যাহা দেখেন, তাহা ঠিক তেমনিই করিয়া আমাদিগকেও দেখাইয়া থাকেন—সেই দেখা আমাদেরও দেখা হইয়া উঠে। তথাপি চিন্তার সাহায্যে, সেই দেখার বিশেষত্ব আমরা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিতে পারি—তাহা হইতেই এই কল্পনা বা কবি-দৃষ্টির লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যায়। কবির সেই দেখার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহাতে জগৎ ও জীবনের সব কিছু রূপান্তরিত হইয়া আমাদের প্রাণের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে। ইহাও আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে,

সে সময়ে আমরা চিন্তা করি না, বিশ্লেষণ করি না; কেমন করিয়া এমনটি ঘটিল, তাহার ভাবনাও থাকে না। অথচ তখন আমাদের চৈতন্ত যে নিদ্রিত বা দুর্ব্বল হইয়া থাকে তাহা নয়, বরং তাহা অতিমাত্রায় উদ্বুদ্ধ হয় বলিয়াই আমরা কাব্যরস-আস্বাদনে এত আনন্দ পাই। যদি বলি যে, দৈনন্দিন জীবনের যে জাগ্রত অভিজ্ঞতা তাহাই আমাদের গভীরতর চৈতন্তকে আবৃত করে—যাহাকে আমরা সজ্ঞান অবস্থা বলি, তাহাই আমাদের অন্তশ্চক্ষুকে অন্ধ করিয়া রাখে; যদি বলি, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, তাহা আমাদের বহিরিন্দ্রিয়সাক্ষী মনেরই একটা ষড়যন্ত্রের ফল—সেই জন্যই আমরা জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না—সে কেবল আমাদিগকে আঘাত করে মাত্র, সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব-কোলাহল ভুলিয়া আমাদিগকে বিভ্রান্ত করে, নানা সমস্যার সৃষ্টি করিয়া আমাদের মনকে মুক্ত হইতে দেয় না, এবং জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদিগকে জীবনের বহির্দ্বারেই বসাইয়া রাখে;—তাহা হইলে আপনারা চমকিত হইবেন না, কারণ, ইহা যে সত্য, তাহা কাব্যরস-আস্বাদনকালে আপনারা ক্ষণকালের জন্যও উপলব্ধি করেন। তথাপি আপনাদের অনেকেই হয়ত বলিবেন, জগৎ ও জীবনের সেই রূপান্তর—যাহা কাব্যে আমরা অনুভব করি—তাহা আনন্দদায়ক বটে, কিন্তু পরে ইহাই বোধ হয় যে, তাহা সুখের স্বপ্নের মত মিথ্যা; কবির সেই দেখা ও দেখানো যাহার দ্বারা সম্ভব হয়, তাহা কল্পনামাত্র,—সত্যের উপর সুমোহন মিথ্যার জাল বিস্তার করিবার সে এক আশ্চর্য্য যাদুশক্তি। এ কথার উত্তরে আমি কেবল একটা প্রশ্নই করিব, তাহা এই যে, আপনারা কাব্যরস-আস্বাদনকালে স্বপ্নে লাখ-টাকা-পাওয়া ভিখারীর মত পুলকবিহ্বল হন না, সুখ-দুঃখের অতীত, দেশকালহারা সর্ব্বসংশয়মুক্তির একটা অপূর্ব্ব চেতনার অধিকারী হন? মুহূর্ত্তের জন্যও হন কিনা? এইরূপ অনুভূতি হইতে কোন রসিক ব্যক্তি বঞ্চিত হইতে পারে না; যাহারা হইয়া থাকেন, তাঁহারা পুণ্যবান—অর্থাৎ রসিক—নহেন, তাঁহারা জগন্নাথ দেখিবার সময়েও লাউ-মাচা দেখিয়া থাকেন। যদি কোন প্রকৃত রসিক এমন কথা বলেন, তবে তাঁহাকে আমি বলিব—"হয়, ঢান্তি পার না"। ইহারই নাম আনন্দ; আর আগে যে অবস্থার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা সুখানুভূতি মাত্র—সেখানে বাস্তবের রূপান্তর ঘটে নাই, জাগ্রত চেতনার সেই অতি স্থূল সংস্কারই একটা

ভিন্ন দেশকালের আশ্রয়ে একই মোহের সৃষ্টি করিয়া থাকে। কবির এই যে দেখা ও দেখাইবার শক্তি, তাহাকেই আমরা নূতন অর্থে 'কল্পনা' নাম দিয়াছি। এই দিব্যদৃষ্টির ফলে খণ্ডের মিথ্যা পূর্ণের সত্যে পরিণত হয়,—জীবনের সমগ্র-রূপ সেই অনুভূতিকেন্দ্রে মণ্ডলায়িত হইয়া দেখা দেয় ; ইহাকেই আমি 'রূপান্তর' বলিয়াছি, এবং এই রূপান্তর যে মিথ্যা নয়, তাহার প্রমাণ ঐ আনন্দ। ভাল করিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিতে না পারিলেও,—সকল যুগের সকল দেশের রসিক ইহা অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন। আমাদের দেশের—এই বাংলাদেশেরই—এক পুরাণকার তাঁহার গ্রন্থে (বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ) প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন—

> ন কবের্বর্ণনং মিথ্যা কবিঃ স্রষ্টিকরঃ পরঃ।
> সর্ব্বোপর্য্যেব পশ্যন্তি কবয়োঽন্যে ন চৈব হি॥

—অর্থাৎ, কবির বর্ণনা মিথ্যা নয়, কবিই শ্রেষ্ঠ স্রষ্টিকর। কবিগণের দৃষ্টি সকলের দৃষ্টির উপরে, আর কেহ তেমন দেখে না। বেশ মনে হয়, আমরা এখানে যাহা বলিতেছি, ত্রয়োদশ শতাব্দীর এই লেখক ঠিক সেই কথাই বলিতেছেন। কবির বর্ণনা মিথ্যা হইতে পারে না—এই কথা খুব বড় কথা, আধুনিক কবিও একস্থানে ঠিক সেই কথা বলিয়া সকলকে চমকিত করিয়াছেন—

> সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
> ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি তব মনোভূমি
> রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

তাহা ছাড়া উপরি-উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকটিতে আরও দুইটি এমন শব্দ আছে, যাহার ব্যবহার আধুনিকতম কাব্যবিচারে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আমি 'স্রষ্টিকর' ও 'পশ্যন্তি' এই দুইটি শব্দের কথা বলিতেছি, আপনারাও কাব্য-বিচারে এই দুইটি শব্দের বিশেষ অর্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবেন। 'পশ্যন্তি'র অর্থ যে 'দেখা' এবং কবির কাজ যে 'সৃষ্টি করা'—'কল্পনা' বলিতে তাহার অধিক বুঝিতে হইবে না ; অথচ ইহা যে কতখানি তাহা আপনারা ভাবিয়া দেখিবেন। আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্রে কাব্য-রসের অতি সূক্ষ্ম বিচার ও কাব্যরচনা-কৌশলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু এ জিজ্ঞাসা নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন, শাস্ত্র এক জিনিষ, আর রসিক-হৃদয়ের সাক্ষ্য

আর এক বস্তু। কাব্যবিচার যিনি করিবেন, তাঁহার এই দৃষ্টি থাকা আবশ্যক, তাঁহাকেও এক হিসাবে কবি হইতে হইবে। বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের লেখক পুরাণকার হইলেও তাঁহার যে উপলব্ধি হইয়াছিল, যাঁহারা পাণ্ডিত্য-ব্যবসায়ী কাব্যসমালোচক, তাঁহাদের তাহা হয় নাই। অতএব কাব্য-আলোচনায় এই কল্পনা-শক্তিকেই সর্ব্বাগ্রে প্রণতি নিবেদন করিতে হইবে। ইহার প্রতি যাহার শ্রদ্ধা নাই, কাব্য-সমালোচনাতেও তাহার অধিকার নাই—এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে না। জ্ঞান নয়, পাণ্ডিত্য নয়, ভূয়োদর্শন নয়, বয়সের গৌরব নয়—শ্রুতির বহুশ্রুত বা মেধাও নয়,—এ অধিকার কেহ চেষ্টা করিয়া লাভ করিতে পারে না, 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—ইনি যাহাকে আপনি বরণ করেন, সে-ই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ ইহা সহজাত বা প্রাক্তন; ইহা সেই শ্রদ্ধা, যাহার অভাবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও নিষ্ফল। এজন্য, যাহার ইহা নাই সে যেন—যাহার আছে তাহাকে ঈর্ষ্যা, নিন্দা বা বিদ্রূপ না করে; সে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতির সাধনায় রত থাকিয়া আপনার ইষ্টলাভ করুক; কিন্তু, সেই সকলের কোন একটিকে উদ্দেশ্য করিয়া এ রাজ্য জয় করিবার চেষ্টা—যাহা আজকাল অনেকেই করিতেছেন—তাহার মত অধর্ম্মাচরণ আর নাই।

৪

কাব্যের আকৃতি, অর্থাৎ তাহার বাঙ্ময়ী মূর্ত্তির সম্বন্ধে আমাদের একটা ভুল ধারণা আছে। পদ্যে রচিত না হইলে আমরা কোন রচনাকে কাব্য বলি না; গদ্যকবি হইতে হইলেও (আজকালকার ফ্যাশন অনুসারে) বাক্যগুলিকে পদ্যের মত চরণযুক্ত করিতে হয়। এ বিষয়ে সংস্কৃত আলঙ্কারিকের বচনই যথার্থ—রসাত্মক বাক্যই কাব্য। পদ্য ও গদ্য—কাব্যের দুই রীতি মাত্র, কাজে দুই-ই এক। কবি হইবার জন্য জোর জবরদস্তি করিয়া অতিশয় রসহীন বাক্যকেও পদ্যের আকৃতি দিবার চেষ্টা হাস্যকর। ভাব-কল্পনার প্রকৃতি ও ক্ষেত্র অনুসারে কাব্য পদ্য বা গদ্য-রীতি আশ্রয় করে। মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির বিষয় একই—কাব্যের সেই চিরন্তন বিষয়, কিন্তু ইহাদের রচনায় যে রীতিভেদ বা আকৃতির পার্থক্য আছে, তাহার কারণ, বিষয় এক হইলেও কবি-কল্পনার প্রকৃতি এক নয়। মহাকাব্য ও উপন্যাস তুলনা করিলে দেখা যাইবে, উহাদের ধরণ প্রায় এক, কেবল জীবনের যে দিক বা স্তর

কবির কল্পনাকে অধিকার করিয়াছে, তাহারই প্রয়োজনে একটি সহজে পদ্যময় হইয়া উঠিয়াছে, অপরটি গদ্যকেই বাহন করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই দুইয়ের দ্বিবিধ প্রেরণা লক্ষ্য করিলেই গদ্য ও পদ্যের পৃথক উপযোগিতা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। নাটকেও গদ্য ও পদ্যের স্বতন্ত্র উপযোগিতা আছে; আজকাল নাটক হইতে পদ্য বহিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া ইহাই প্রমাণ হয় না যে, পদ্য-নাটক খাঁটি নাটক নয়; যাহারা এমন কথা বলে, রসিক-সমাজে তাহারা কৃপার পাত্র বটে। তথাপি এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, গদ্যেই হউক বা পদ্যেই হউক, কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে কবির সেই দৃষ্টির উপরে—সেই দেখাইবার শক্তির উপরে। যখন কোন কাব্য পাঠ করি, তখন এ বিচার করিবার অবকাশ থাকে না যে—ইহা পদ্য না গদ্য। কোন্ কাব্যের পক্ষে কোন্‌টা উপযোগী সে বিচার করেন কবি—কিংবা কবিও নয়, কাব্যের কল্পনা-বীজ বা মূলপ্রেরণায় তাহা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কবির দৃষ্টিতে তাহা প্রকাশ পায়, তাহা যদি সত্যকার প্রকাশ হয়, তবে, তাহার সেই রস-রূপ আপনার বাণীদেহের আকৃতি আপনি নির্ব্বাচন করিয়া লয়, কবিকেও ভাবিতে হয় না। কথাটা আর একটু স্থূলভাবে হিসাব করিয়া বলি। কবির অন্তরে কাব্যের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, ধরা যাক তাহার উপাদান দুইটি—ভাব ও বস্তু; ভাব, অর্থাৎ কবির নিজস্ব অনুভূতি, এবং বস্তু, অর্থাৎ জীবন ও জগৎ-ঘটিত ব্যাপার। কাব্যের সেই বীজের মধ্যেই এই দুই উপাদানের পরিমাণ বা মাত্রাভেদ গোড়া হইতে থাকে। বস্তুর মাত্রা যদি বেশী হয়, তবে সে কাব্য গদ্যে রচিত হওয়াই স্বাভাবিক; যদি ভাবের মাত্রা বেশী হয়, তবে তাহা পদ্যচ্ছন্দে কবিতার আকারে প্রকাশ পায়। আবার যদি তাহা একেবারে ভাবসর্ব্বস্ব হয়, অর্থাৎ বস্তুর সম্পর্ক যদি প্রায় শূন্য হয়, তবে তাহা শব্দের সুর রচনা বা গীত হইয়া উঠে। এ হিসাব কিন্তু একটা মোটা হিসাব—ব্যাপারটা বুদ্ধিগম্য করিবার উপায় মাত্র, যদিও বুদ্ধির প্রবেশ এখানে নাই। উৎকৃষ্ট কাব্যের পক্ষে, ভাব ও বস্তুকে এইরূপ হিসাব করিয়া ভাগ করিয়া দেখানো সম্ভব নয়, সেখানে ভাব ও বস্তুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব আসিয়া পড়ে। যাহাকে আমরা এখানে 'ভাব' বলিতেছি, তাহা 'বস্তু' হইতে পৃথক একটা কিছু নয়, কবির হৃদয়ে 'বস্তু' যে বিশেষ'-রূপে প্রকাশ পায়, তাহাই ভাব, অতএব ভাবই হইতেছে সেই ছাঁচ, যাহা কবিতার বস্তুকেও তাহার বিশিষ্ট রূপটি দিয়াছে; এবং যেহেতু এই বিশিষ্ট

রূপই কবিতার সর্ব্বস্ব—বস্তু এখানে ঐ রূপ ধরিয়াই কাব্য হইয়া উঠিয়াছে—অতএব, কাব্যবিচারে ভাব ও বস্তুর পার্থক্যবিধান তত্ত্বসঙ্গত নয়। কিন্তু এখানে এরূপ তত্ত্ববিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই—একটা মোটামুটি ধারণা থাকিলেই যথেষ্ট; আমাদের ঐ হিসাবটাই আর একটু টানিয়া চলিব। নাটকের কথা বলিতেছিলাম। নাটক ও উপন্যাস এক নয়; তথাপি শেক্স্পীয়ারের পদ্য-নাটকের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যকাব্যের—তাঁহার উপন্যাসগুলির—তুলনা করা যাক। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য ট্রাজেডিগুলি যেমন নাটকও নয়, তেমনই পদ্য-কাব্যও নয়; অথচ শেক্স্পীয়ারের নাটকীয় ট্রাজেডির অনেক লক্ষণ তাহাদের প্রেরণার মূলে রহিয়াছে; এবং গদ্যে হইলেও সেই কবিত্ব তাহাতে প্রচুর। কিন্তু তথাপি সেগুলি নাটকের আকার পায় নাই এইজন্য যে, তাহারা কেবল দৃশ্য নহে, পাঠ্যও বটে—ঘটনাবস্তু হইতে কবি আপনাকে একেবারে সরাইয়া লইতে রাজি নহেন,—কেবল দেখিলেই চলিবে না, তাঁহার কথাও শুনিতে হইবে, এইজন্য নির্ম্মাণ-কৌশলেও ইহা গদ্য-কাব্য, নাটক নহে। ইহার কারণ, কবির দৃষ্টি এখানে কেবল রস-দৃষ্টিই নহে, সেই রসদৃষ্টির সঙ্গে একটা সচেতন ব্যাখ্যা-প্রবৃত্তি আছে। অতএব, যেজন্য তাহা নাটক হইতে পারে নাই, সেইজন্য তাহা গদ্যও হইয়াছে। নাটকও গদ্য হইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্য নাটকীয় গুণসম্পন্ন হইয়াও নাটক হয় নাই কেন, তাহা বলিয়াছি; আবার, ভাব-প্রধান হইয়াও তাহারা গদ্যচ্ছন্দ আশ্রয় করিয়াছে কেন, তাহাও বলিতেছি। এই কাব্যগুলিতে কবির রসদৃষ্টি বস্তুর ভাবরূপকে যেমন প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তেমনই, সেই ভাবরূপের উপরে, আপনার অতিজাগ্রত মানস-চেতনার শাসন কখনও ত্যাগ করে নাই। যে আধ্যাত্মিক বৃত্তিবিশেষকে আমাদের শাস্ত্রে বিবেক বলে, বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-প্রবৃত্তিকে সেই বিবেক ভিতর হইতে বল্গাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এ যেন প্রকৃতির সঙ্গে রস-রঙ্গ করিয়াও পুরুষ আপনাকে অসঙ্গ রাখিতে চায়; সেই সঙ্গ-সুখের মধ্যেই যে মুক্তি, তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারে না। কবি-মানসের এই অতি জাগ্রত চেতনা জগৎ ও জীবনের রসরূপকেই একান্ত হইতে দেয় নাই—রূপরসের যে আত্যন্তিক আবেশ বাণীকে ছন্দোময় করিয়া তোলে, তাহাকে বশে রাখিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যগুলি পদ্যনাটক না হইয়া গদ্য-ট্রাজেডি হইয়াছে। শেক্স্পীয়ার ও বঙ্কিম উভয়ের কাব্যের বিষয়বস্তু এবং কবিপ্রেরণাও মূলে সগোত্র বলিয়া

মনে হয়, তথাপি একজনের কবিদৃষ্টি অবিমিশ্র বলিয়া—জগৎ ও জীবনের বস্তুগত সত্তাকে রসরূপে আত্মসাৎ করিবার শক্তি দ্বিধাহীন বলিয়া—তাহা কাব্যমন্ত্র-সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছে; অপরের দৃষ্টি সেইরূপ দ্বিধাহীন নয়—বস্তু ও ভাবের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে, একে অন্যের উপর প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছে, এবং শেষ পর্য্যন্ত একেরই জয় হইয়াছে। অথচ এই কাব্যগুলির উপাদান ও প্রেরণা এমনই যে, গল্প উপন্যাস হইলেও তাহারা বার বার শেক্স্পীয়ারকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

৫

আর একটি বিষয়ে কিছু বলিয়া আজিকার আলাপ শেষ করিব। কবি ও কাব্য সম্বন্ধে এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি, তাহা হয়তো তেমন কাজে লাগিবে না, কিন্তু ইহারই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিব, তাহা সাধারণ কাব্য-পাঠকেরও কিঞ্চিৎ কাজে লাগিতে পারে, অর্থাৎ তাহার দ্বারা সাক্ষাৎ কাব্য-পরিচয়ের সুবিধা হইতে পারে। আপনারা সকলেই নাটক, নভেল, এমন কি কবিতা পড়িতেও ভালবাসেন—কেন ভালবাসেন, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি। এই সকল রচনায় আমরা আর একটা এমন জীবনের স্বাদ পাই, যাহা আমাদের চিত্তকে ক্ষণকালের জন্যও সুস্থ করে। কবিকল্পনা বা কবিদৃষ্টির প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার পুনরুল্লেখ করিব না, বোধ হয়, আপনাদের তাহা স্মরণ আছে—এই আর এক জীবন ও জগতের উদ্ভাবনাকে একটা মিথ্যা স্বপ্নরচনা মনে করা যে ভুল, তাহাই বলিয়াছিলাম। এখন আমি সেই কথাটাই একটু ভাঙ্গিয়া কাব্যের প্রকৃতি-ভেদের কথা বলিব। ধরিয়া লওয়া যাক, অধিকাংশ কাব্যের মতলবই এই যে, আমরা যেন তাহাতে বাস্তব জীবনের এই দাহ হইতে একটা শীতল আশ্রয় পাই। জগতে যাহা নাই, কিন্তু আমাদের গভীরতর চেতনায় যাহা কল্পনা করিয়া আমরা আশ্বাস পাই,—এই সকল কাব্যে, কবিগণ তাহারই অনুযায়ী একটা অভিনব জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই জগৎকে আমরা যদি বাস্তব হইতে পলাইয়া বাঁচিবার জগৎ বলি, তবে তাহা মিথ্যা হইবে না—এ বিষয়ে আপনারা সকলেই একমত, তাহা জানি। অতএব একজন আধুনিক ইংরেজ সমালোচকের অনুসরণ করিয়া আমরা এই ধরণের কাব্যকে "Poetry of Refuge" বা আশ্রয়-সন্ধানের কাব্য বলিতে পারি। ইহাতে প্রখর সূর্য্যালোক

জ্যোৎস্নালোকে পরিণত হয়; অথবা, সূর্য্য যেন মধ্যগগনে না উঠিয়া পূর্ব্বাকাশেই ভ্রমণ শেষ করিয়া অস্ত যায়, যত কিছু শোক-তাপ একটি স্নিগ্ধ সান্ত্বনার রসে সিঞ্চিত হয়, কখনও বা অশ্রু হাসির ছদ্মবেশে পরম রমণীয় হইয়া উঠে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা স্বপ্ন-রচনা নয়; ইহাও একপ্রকার সৃষ্টি—একটা সুসম্বদ্ধ সুসংস্থাপিত জগৎ। অন্তরের অন্তরে আমরা ইহাকে সত্য বলিয়াই অনুভব করি, কারণ, ইহার মধ্যে একটা সঙ্গতি ও সুষমা আছে। স্বপ্নে তাহা থাকে না, তাহাতে কোন সুসম্পূর্ণ জগৎ নাই; কোন শৃঙ্খলা নাই—তাহা তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনার অনাসৃষ্টি মাত্র। অতএব এখানেও যে কল্পনার ক্রিয়া রহিয়াছে, তাহা কবি-কল্পনা; সেই কল্পনা যেন ধ্যানে বসিয়া, কোন এক নিগূঢ় প্রেরণার বশে, জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই কণ্টকহীন করিয়া, তাহার সকল কঠিনতা দূর করিয়া, এমন একটি ছাঁদে মাল্য রচনা করে যে, মানুষ তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ক্ষণিকের জন্য জীবন-মুক্তির আনন্দ পায়।

এইবার আর এক জাতীয় কাব্যের কথা বলিব। এ কাব্যে কবির কল্পনা জীবনকে মুখোমুখি দেখিবার, এমন কি তাহার অন্তস্তল ভেদ করিবার দুঃসাহস করিয়াছে। 'Poetry of Refuge' না বলিয়া ইহাকে 'Poetry of Interpretation' বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই Interpretation বা ব্যাখ্যা দুই রকমে বা দুই উপায়ে হইতে পারে। জীবনের যত দ্বন্দ্ব—সুখ-দুঃখ প্রভৃতির অস্তিত্ব পুরামাত্রায় স্বীকার করিয়াই, তাহাকে এমন একটি দৃষ্টির দ্বারা মানুষের অধ্যাত্ম-চেতনার অনুগত করা যায় যে, মানুষকে তাহার জন্য আর হতাশ হইতে হইত না। ইংরেজ কবি শেলী ও আমাদের রবীন্দ্রনাথের কাব্য এই শ্রেণীর কাব্য। এই সকল কাব্যে কবির কল্পনা জীবনের সকল বিরূপতাকে একটা সুষম-রূপ দিবার প্রয়াস পাইয়াছে—ভ্রম-সংশয়, দৈন্য-দুর্দ্দশা, কুরূপ-কুৎসিতের সমাধানমূলক এক একটি বাণী তাহাতে রূপময় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই জাতীয় কাব্যের আর এক স্তর আছে, সেখানেও কবির সৃষ্টি সমাধানমূলক বটে, কিন্তু তাহাতে সেই সমাধান এইরূপ কোন আদর্শ বা আইডিয়ার দ্বারা হয় নাই। সেখানে কবি-চিত্ত জীবনের ভীষণতম মূর্ত্তিকে শুধু স্বীকার নয়—বরণ করিয়াছে; যে দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি বা দেহ-দশাকে জয় করিতে না পারিয়া মানুষ নৈরাশ্যে অবসন্ন হয়—অতিশয় শক্তিমান ও হৃদয়বান ব্যক্তিও চরম বিড়ম্বনা ভোগ করে, এ সকল কাব্যে কবির দৃষ্টি

তাহার প্রতিই দৃঢ়বদ্ধ, এবং সেই দ্বন্দ্বকেই পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া তাহার যে রস-রহস্য উদ্ঘাটিত করে, তাহাতেই আমাদের অন্তরে এক আশ্চর্য্য উপায়ে প্রহেলিকার সমাধান হইয়া যায়,—দুঃখ দুঃখরূপেই আমাদের প্রাণে একটি প্রশান্তির উদ্রেক করে। ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, আসক্তি ও বিদ্বেষের মূলে—জীবনের সকল কোলাহল—উল্লাস ও আর্ত্তনাদের মধ্যে—যে মহাশক্তির লীলা রহিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াই আমাদের আত্ম-সম্বিৎ যেন বাড়িয়া যায়, আমরাও সকল দ্বন্দ্বের উপরে উঠিয়া যাই। উপরি-উক্ত ইংরেজ সমালোচক এই দুই স্তরের কাব্যকেই এক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন—কেবল কবিদৃষ্টির পরিধি ও প্রখরতার তারতম্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, ইহা শুধু একটা স্তরভেদ নয়, কবির দৃষ্টিগত পার্থক্যও ইহাতে আছে। প্রথমোক্ত কাব্যে Interpretation—বা, অনর্থের একটা অর্থ করিবার অভিপ্রায় আছে, কিন্তু শেষোক্ত কাব্যে অর্থ-অনর্থের ভেদজ্ঞানই যেন নাই। এই দ্বিতীয় স্তরে আছে—মহাভারতের কাব্যাংশ, সেক্স্পীয়ারের 'লীয়র,' 'হ্যামলেট,' আমাদের মধুসূদনের 'মেঘনাদ' ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ,' 'কপালকুণ্ডলা'; প্রথম স্তরে আছে—শেলীর 'প্রোমিথিউস,' রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তর কাব্য ও নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর,' 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি। কাব্য-গুলিকে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছি মাত্র—কক্ষভুক্ত করি নাই; কেহ যেন মনে না করেন যে, কাব্যহিসাবে তাহারা যে সকলে সমান, ইহাও আমার অভিপ্রায়; সে বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন।

এই দুই জাতি ভিন্ন কাব্যের আর কোন জাতির অস্তিত্ব সন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। আধুনিক কালে সাহিত্যের যে নানা ভঙ্গি দাঁড়াইতেছে, তাহার উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি বা রসপিপাসা চরিতার্থ করা নয়, বরং যাহাতে কাহারও রসপিপাসা আর না হয়, তাহারই যেন প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। অতএব আমাদের আসরে সেগুলিকে দূর হইতে নমস্কার করাই ভাল। তথাপি ধর্ম্মতঃ বলিতে হইলে, এই আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে, দুই-একজন বিদেশী লেখকের রচনায় (একজনের কথাই* বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে) এক নূতনতর কবি দৃষ্টির পরিচয় পাইয়াছি; ইহাতে 'Refuge' বা 'Interpretation'—কোনটাই নাই; সান্ত্বনাও নাই, সমাধানও নাই। সে কাব্যে জীবনের

* সমারসেট ম'ম (Somerset Maugham)

বাস্তবকেই এমন এক রূপে উদ্‌ঘাটিত করা হইয়াছে যে, তাহাকে যেমন স্বীকার করিতে হয়, তেমনিই তাহা হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। আমি আধুনিক সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদের কথা বলিতেছি না। এ বাস্তব দেহ-সম্পর্কহীন মন, অথবা মন-সম্পর্কহীন দেহের বাস্তব নয়; ইহার দৃষ্টি আরও গভীর—এ সকল রচনায় মানুষের প্রবৃত্তির নিষ্ঠুর শাসনে তাহার বিবেক ও বুদ্ধির লাঞ্ছনা ও জীবনের নিষ্ফলতা এমন করিয়া চিত্রিত হইয়াছে, এবং তাহাতে মানুষের শক্তি ও অশক্তি, তাহার ক্ষুদ্রতা ও মহত্ত্ব, পরস্পরকে এমন পরিহাস করিতে থাকে যে, তাহাই তাহার একমাত্র নিয়তি বলিয়া মনে হয়; এবং শেষ পর্য্যন্ত একটা বিমূঢ়তাই জাগে। ইহাতে ট্রাজেডিও নাই, কমেডিও নাই; ব্যাখ্যা নাই, বিশ্লেষণ নাই, কোন জিজ্ঞাসাও নাই—কারণ, সকলই নিষ্ফল। তথাপি, মানুষের সামাজিক বা নৈতিক সংস্কার, এমন কি, আত্মরক্ষামূলক স্বার্থ-সংস্কারেরও অন্তরালে সেই প্রবৃত্তি-রূপ নিয়তিকে এমন করিয়া দেখিবার যে দৃষ্টি, তাহাকেও একপ্রকার কবি-প্রতিভাই বলিতে হইবে। কিন্তু এইজাতীয় কাব্য ওই দুই শ্রেণীর মধ্যে কোন্‌টিতে পড়ে? চেষ্টা করিলে বোধ হয়, দ্বিতীয়টি কোন এক স্তরে ফেলিতে পারা যায়, নতুবা গত্যন্তর নাই।

আজ এই পর্য্যন্ত—এ আলাপের শেষ নাই। তবু যে এতদূর চলিয়াছে, তাহার কারণ, ইহার আগাগোড়াই একতরফা। প্রশ্ন করিবার অবকাশ দিই নাই, ভুল করিলেও তাহা ধরাইয়া দিবার—লোক নাই বলিব না—উপায় ছিল না। আবার, এত বেশী সময় লইয়াছি যে, ইহার পর জিজ্ঞাসাবাদ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও ধৈর্য্য থাকা অসম্ভব। তথাপি আশা করি, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার সব না হউক, কতকটা আপনাদের মনে ধরিবে। কবি ও কাব্য সম্বন্ধে আজ যাহা বলিলাম, তাহাতে কোন তত্ত্ববিচারের অভিপ্রায় ছিল না, তথাপি কোন কোন স্থানে আমার ভাষা তত্ত্বগন্ধী হইয়া উঠিয়াছে তাহা জানি, আপনারা সে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। *

* সঙ্গীত-সাহিত্য-বিতানের (টালা, কলিকাতা) সাহিত্য-সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা।

সংবাদপত্র ও সাহিত্য

সাহিত্যের সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্পর্ক কিরূপ, সংবাদপত্রের সাহায্যে সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব কিনা—এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে, বাধ্য হইয়াই কিছু লিখিতে হইল।

সংবাদপত্রে সংবাদ ছাড়া যাহা-কিছুর আলোচনা হইয়া থাকে, তাহাও সংবাদ-জাতীয়; অর্থাৎ দুইদিনে তাহা বাসী হইয়া যায়, সাধারণভাবে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। অপর পক্ষে, যাহা সাহিত্যপদবাচ্য তাহা দুইদিনে বাসি হইবার নয়; সাময়িকভাবে দেখা দিলেও তাহা সাময়িকতাকে অতিক্রম করে বলিয়াই সাহিত্য—এ কথাও অস্বীকার করিবার নয়। অতএব এই দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা মূলগত। সংবাদপত্র-রচনার (Journalism) যে বিদ্যা-বুদ্ধি এবং যে ধরণের লিপিকুশলতার প্রয়োজন, তাহা লইয়াই যেমন সাহিত্য রচনা করা চলে না, তেমনই, সাহিত্যসৃষ্টিতে যে প্রতিভা ও ধীর-দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন তাহা সংবাদ-প্রণয়নের পক্ষে নিতান্তই অপটু। যাঁহারা সংবাদপত্র পড়িয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই সাহিত্যচর্চ্চার অভিলাষী নহেন—সংবাদপত্রের জন্মই হইয়াছে অন্যবিধ প্রয়োজনে। যে সকল তথ্য একালের বুদ্ধিজীবী মানুষের বুদ্ধিকে মরিচা-ধরা হইতে রক্ষা করে, অলসের কৌতূহল নিবৃত্তি করে,—এবং যে ধরণের তত্ত্বালোচনা অপণ্ডিতকেও সহজে পণ্ডিত হইয়া উঠিবার সুযোগ দেয় প্রধানতঃ তাহাই সরবরাহ করা সংবাদপত্রের কাজ,—এ যুগের গণ-রাজের সেবাই তাহার মুখ্য ব্রত। কিন্তু এই সর্ব্বভুক গণ-রাক্ষসের ক্ষুধাবৃদ্ধি করিয়া সর্ব্ববিধ খাদ্যকে রুচিকর করিয়া তোলাও সংবাদ-ব্যবসায়ীর পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। দৈনিক আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা মাত্র ব্যয় করিয়া, মস্তিষ্কের উপরে বিশেষ কোন জুলুম না করিয়া সর্ব্ববিদ্যার সংবাদ রাখা, বড় বড় আবিষ্কার ও গবেষণা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া—সংবাদপত্রের দৌলতেই হইয়া থাকে। সামান্য দুই পয়সার বিনিময়ে সংবাদপত্র বর্ণজ্ঞানমাত্র-সম্বল আধুনিক সভ্য মানুষের এই মহদুপকার সাধন করে। অপরাহ্ণে একমাত্রা আফিমের মত সংবাদপত্র অনেকেরই একটি প্রভাতিক মৌতাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক কথায়, সংবাদপত্র একাধারে নেশা ও চাট—সস্তায় সাড়ে-বত্রিশভাজা, অথচ হজম করিতে কষ্ট নাই।

কোনও মনীষী নাকি বলিয়াছেন, সাহিত্যও সংবাদপত্র-জাতীয় দিন-মজুরি—তফাৎ এই যে, একটি স্থায়ী, অপরটি অস্থায়ী। এরূপ উক্তির তাৎপর্য্য—ইহাদের একটি ক্ষণের প্রতিবিম্ব, অপরটি কালের; মূলে উভয়ের প্রবৃত্তি এক। কথাটা এই হিসাবে সত্য যে, সাহিত্যের প্রবৃত্তিও কালানুগ; সংবাদপত্র ক্ষুদ্রতর কালকে আশ্রয় করে, সাহিত্য সেই কালেরই সেবা করে বৃহত্তর পরিধি ব্যাপিয়া। অর্থাৎ সংবাদপত্রও যেভাবে সৃষ্টি হইয়া থাকে, সাহিত্যও সেইভাবে হইয়া থাকে—কালের তাগিদ উভয়ত্র প্রবল। সাময়িক ঘটনা-তথ্যের উপাদানে যেমন সংবাদপত্র রচিত হইয়া থাকে, সাহিত্যও তেমনই কোনও এক যুগের আশা আকাঙ্ক্ষা, সাময়িক ধারণা ও আদর্শ-বুদ্ধির প্ররোচনায় রচিত হইয়া থাকে; একটির প্রবৃত্তি অপরটির অপেক্ষা গভীরতর বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যেই বর্ত্তমানের তাগিদ সমভাবে বিদ্যমান। যদি ঐ উক্তির এই অর্থই হয়, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে—একটিতে মানুষের প্রাণ-মনের ইতিহাস কালানুক্রমিকভাবে লিপিবদ্ধ হইতেছে, একটা কিছু গড়িয়া উঠিতেছে; কিন্তু অন্যটিতে ক্ষণ-বুদ্‌বুদের মালা দীর্ঘতর হইবার পূর্ব্বেই শূন্যে বিলীন হইয়া যায়; ইহার কারণ, তাহার কোন লক্ষ্য নাই—উপলক্ষ্যই তাহার প্রাণ; সম্মুখে বা পশ্চাতে তাকাইবার অবকাশ বা প্রয়োজন তাহার নাই; তাহার কাছে সব কিছুই শুধু সংবাদ—তদধিক মূল্য দিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

কিন্তু আধুনিক কালে, সংবাদপত্র সাহিত্য না হউক, সাহিত্য সংবাদ-ধর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে। যাহা নিতান্তই চলিষ্ণু, যাহা ক্ষণস্থায়ী, যাহা ক্ষণগত ও ব্যক্তিগত—যাহা নিতান্তই বাস্তব বা তথ্যগত, তাহাই সাহিত্যের প্রাণ! ইহার কাল—নিতান্তই বর্ত্তমান, এবং দেশ—অতি সাধারণ বুদ্ধি ও বিশ্বাসের সীমানায় গণ্ডিবদ্ধ। আজ যাহা রচিত হয়, কাল তাহা বাসী হইয়া যায়—তাহাই যেন উচিত ও বাঞ্ছনীয়। সংবাদের মূল্য যেমন পরদিন পর্য্যন্ত টিকে না—নূতনতার চমকই তাহার একমাত্র মূল্য, তেমনই সাহিত্যও আজ ক্ষণধর্ম্মী। এ কালের মানুষ এমনই নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছে যে, আয়ুষ্কালকে তাহারা ক্ষণসমষ্টি ও মৃত্যুকেই মোক্ষ বলিয়া জানে। সেজন্য সাহিত্যও—বিষয়-সর্ব্বস্ব, আধি-ব্যাধিগ্রস্ত, মৃত্যুভয়ভীত মানুষের—ক্ষীণ-প্রাণ স্ফীতবক্ষ পারাবতের—ক্ষণিক উত্তেজনার অথবা অবসর-বিনোদনের সামগ্রী

হইয়াছে। আজ সিনেমা-চলচ্চিত্র, যেমন নাটক-অভিনয়ের পরিবর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, রস সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্য না হইয়া জনগণের চক্ষু-গ্রাহ্য হইয়াছে—সাহিত্যও তেমনই, চিরন্তন সত্য ও চিরন্তন সুন্দরের সংবেদনায় অনুপ্রাণিত না হইয়া অতিশয় আধিভৌতিক প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়াছে; নিত্য না হইয়া নৈমিত্তিক ভাবাপন্ন হইয়াছে। অতএব আধুনিক কালে সাহিত্য ও সংবাদপত্রের মূল প্রেরণা বা তাড়না একই—উভয়ের মধ্যে রূপভেদ থাকিলেও আদর্শের ভেদ নাই।

সংবাদপত্র ও সাহিত্য—এই উভয়ের আদর্শ ও অভিপ্রায় এক নয়; অতিশয় সুপরিচিত সংবাদপত্র ও খাঁটি রসসৃষ্টি, এই উভয়ের মধ্যে কোনরূপ তুলনা স্থাপন করিতে যাওয়াই অন্যায়—তাহা আমি জানি। বিদেশের উৎকৃষ্ট পত্রিকাগুলি যে কাজ যেভাবে করিয়া থাকে, তাহাতে সাংবাদিক-বিদ্যাকে একটি কলাবিদ্যা বলা যাইতে পারে। যাহা দৈনন্দিন, বা দ্রুত ধাবমান কালের পদক্ষেপে প্রতি মুহূর্ত্তে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে—মানব-যাত্রীর অশান্ত পথযাত্রার বাঁকে বাঁকে, অব্যবহিত ভবিষ্যৎ যে নব নব রূপে বিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাকে তদ্দণ্ডে লিপিবদ্ধ করিয়া, নিত্য-অতীত ও নিত্য-ভবিষ্যতের যোগসূত্রটি অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া, সাংবাদিকের প্রতিভা যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করে, তাহার মূল্যও কম নহে। কিন্তু এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল দ্রুত ধাবমান ঘটনাস্রোতকে একটি অখণ্ড ইতিহাসের ধারায় ধরিয়া লওয়া—সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির সর্ব্ববিধ নূতন তথ্যকে সুবিন্যস্ত করিয়া, যাহা অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক তাহাকে একটা নিয়মের অধীন ও অর্থযুক্ত করিয়া পাঠকের সমক্ষে ধরা—সহজ কাজ নয়। অতএব সাংবাদিক প্রতিভা সাহিত্যিক প্রতিভা না হইলেও সুলভ নহে। কিন্তু এ আদর্শ কচিৎ রক্ষিত হইয়া থাকে। সংবাদপত্র সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি—বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে,· তাহাই তাহার যথার্থ পরিচয়। সাহিত্য ও সংবাদপত্রের সম্পর্ক-বিষয়ে সংক্ষেপে ইহার অধিক বলিবার স্থান নাই। এইবার সংবাদপত্র কিভাবে সাহিত্যের সাহায্য করিতে পারে, তাহার কথাই বলিব।

সংবাদহিসাবে সাহিত্যের সাময়িক পরিচয়-প্রদান সংবাদপত্রের অবশ্য-কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্য সকল সংবাদপত্রই কিছু কিছু করিয়া থাকে; সাময়িক-পত্রাদিতে সাহিত্যের জন-যাত্রার পথচিহ্ন আপনা-আপনি অঙ্কিত হইয়া যায়।

যাহা যুগব্যাপী সাধনার ফল, যাহা যুগান্তরে পরিণতরূপ লইয়া সকলের দৃষ্টি-গোচর হয়, তাহার ক্ষণিক লক্ষণ ও স্থায়ী প্রবৃত্তি, নিষ্ফল প্রয়াস ও সফল প্রযত্ন—সাময়িক-পত্রে এমনভাবে প্রতিফলিত হইয়া থাকে যে, আমরা তাহা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি ও গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করিতে পারি। যে সকল লেখক শেষে স্থায়ী সাহিত্যের অঙ্গন হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া যান, অথচ যাঁহারা এক একটা যুগের আবহাওয়াকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিচয় সাময়িক পত্রেই প্রকট হইয়া থাকে। এ পরিচয়ের প্রয়োজন আছে; প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানে তাঁহারাই জাতির রসপিপাসা উদ্রিক্ত করেন। বর্ত্তমানের চেয়ে সত্য আর কিছুই নাই—প্রতিদিনের প্রয়োজন সকল প্রয়োজনের বাড়া। নিত্য-নূতনের যে পিপাসা তাহাই প্রবলতম পিপাসা—তাহার নাম কৌতূহল। এই কৌতূহল জাগ্রত না থাকিলে মানুষের জীবনীশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সাময়িক সাহিত্য সেই কৌতূহল জাগাইয়া রাখে। এই হিসাবে যাহা নিত্য-বর্ত্তমান তাহার পরিচয়সাধনকল্পে সংবাদপত্রে সাহিত্যের সংবাদ একান্ত প্রয়োজন; সাময়িক সাহিত্য পত্রিকার কথাই বলিতেছি না, তদপেক্ষাও সাময়িক—যাহা দৈনিক বার্ত্তাবহরূপে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়—সেই সংবাদপত্রের স্তম্ভে সাময়িক সাহিত্যের সংবাদ নিয়মিতভাবে থাকা বাঞ্ছনীয়। যাহাকে চল্‌তি সাহিত্য বলা যায়—যাহা অগণিত পুস্তকাকারে, অথবা মাসিক পত্রিকার স্রোতের মত ভাসিয়া চলিয়াছে—সেই সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের পরিচয়, তথ্য ও তত্ত্বের যোগসূত্রে গাঁথিয়া পাঠক-সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করা, একটা কাজ বলিয়াই মনে করি। সে কাজ করিতে হইলে সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্যের তত্ত্ব, উভয়বিধ জ্ঞানেরই প্রয়োজন; সর্ব্বোপরি প্রয়োজন—সদ্যোজাত বর্ত্তমানকে সদ্যোগত অতীতের সঙ্গে মিলাইয়া অর্থযুক্ত করিয়া তোলা। বর্ত্তমানের সাহিত্য-সংবাদকে একটি পূর্ব্বপর পারম্পর্য্য দান করিয়া, তথ্য ও তত্ত্বের মিলন সাধন করিয়া, এমন একটি ধারাবাহিকতার ধারণা রক্ষা করিতে হইবে—যাহাতে সাহিত্যের নিত্য-নব ভঙ্গিকেও পুরাতনের সঙ্গে মিলাইয়া প্রতি পদে দিক-নির্ণয় করা সম্ভব হয়। আমি সাহিত্য-সংবাদের সঙ্গে একপ্রকার সমালোচনার কথা বলিতেছি বটে, কিন্তু ইহা ঠিক Academic সমালোচনা নহে—সংবাদপত্রে তাহার স্থান নাই। আমি সাহিত্যের সাময়িক প্রবৃত্তিরই একটা মূল্য নির্দ্দেশ করার কথা বলিতেছি—দেশ-কাল-

পাত্রই সেখানে বড় ; কোনও চিরন্তন আদর্শ বা নির্ব্বিশেষ রসতত্ত্বের আলোচনা তাহার অভিপ্রায় হইবে না। যাহা সাময়িক, তাহাকে তাহারই আদর্শে বিচার করিয়া, যুগপ্রবৃত্তির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, অতীত ও ভবিষ্যতের কালধারাটিকে বর্ত্তমানের মধ্যে চিনিয়া লইবার চেষ্টাই সাংবাদিকের প্রধান কৃতিত্ব।

ইহা দ্বারা সাহিত্যের সাহায্য বা উন্নতি কি পরিমাণ হইতে পারে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সাহিত্যের সাময়িক স্রোত, তাহার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে পাঠককেও যেমন অবহিত করা হয়, তেমনই ইহা দ্বারা লেখকেরও পথ এবং পাথেয় নির্দ্দেশ করা যায়। সাংবাদিকের মতামত যদি সুবিচার-প্রণোদিত হয়, যদি তাহাতে শিক্ষিত সাধারণের সহজ রসবোধ ও সুস্থ বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিফলিত হয়, তবে তাহা দ্বারা সাহিত্যের গতি কতকটা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। লেখকবিশেষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিভায় উজ্জ্বল নয়, সেখানে সাংবাদিকের সামাজিক বুদ্ধি এবং সুস্থ রসজ্ঞান তাহার যে মূল্য নির্দ্ধারণ করে, তাহাতে অন্ততঃ সাহিত্যের একটা ঋজু সরল পন্থা বজায় থাকে ; কৌতূহল-তৃপ্তির সঙ্গে একটা সুস্থ সংস্কার জাগ্রত হইয়া থাকে। পাঠকসাধারণ ও সাহিত্যিকদিগের মধ্যে যে পরিচয় থাকা অত্যাবশ্যক, সংবাদ-পত্রযোগে সেই পরিচয় কতকটা বাধ্যতামূলক হইয়া উঠে, ইহাতে সাহিত্যের যে প্রচার হয় তাহা জাতির পক্ষে কল্যাণকর। সাংবাদিকের নিকটে কেহ জটিল রসতত্ত্ব অথবা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-বিচার প্রত্যাশা করে না। পাঠক-সাধারণকে সমসাময়িক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন রাখা, অপরা-পর সংবাদের মতই সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের স্বরূপ সম্বন্ধে সজ্ঞান রাখাই সাংবাদিকের কাজ। ইহা মুখ্যতঃ সংবাদদাতার কাজ, বিচারকের কাজ নহে। কিন্তু এই সংবাদ দানও এমন একটি জ্ঞান ও বিবেচনার অপেক্ষা রাখে, যাহাকে সাংবাদিক প্রতিভা বলা যাইতে পারে—আমি পূর্ব্বে ইহার উল্লেখ করিয়াছি। এইভাবে সাহিত্যিক সংবাদ জনসাধারণের গোচর করিয়া, সাংবাদিকগণ কেবল সাহিত্যের পথ নহে, সাহিত্যের পাথেয় বিষয়ে প্রভূত সাহায্য করিতে পারেন—তাহাতে সাহিত্যসেবার দ্বারা জীবিকা-সংগ্রহের সুবিধা হইয়া থাকে, এবং তাহা সাহিত্যের অল্প উপকার নহে।

আজিকার এই অতিব্যস্ত বিষয়-সর্ব্বস্বতার যুগে, সাহিত্য বা ঐ জাতীয় সুকুমারকলার চর্চ্চা দ্বারা চিত্ত-প্রকর্ষলাভের অবসর প্রায় কাহারও ঘটিয়া

উঠে না। অতএব, সাহিত্য ও সংবাদপত্রের মূলগত বিরোধ সম্বন্ধে প্রথমেই যাহা বলিয়াছি, তাহা সত্য হইলেও সাহিত্য-চর্চ্চার এই সুলভ উপায়কে একেবারে নিরর্থক বলা চলে না; বরং যুগধর্ম্মের তাড়নায়, 'মন্দের ভাল' হিসাবে সাংবাদিকের মুখ চাওয়া ছাড়া উপায় নাই। যাঁহারা আদর্শবাদী তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম, তাঁহারা নিভৃতে এককভাবে যে দৃষ্টি লইয়া যে সাধনা করিতে সক্ষম, তাহার ফললাভে জাতি কখনও বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু সাহিত্যিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে হইলে যে সমতলভূমিতে সাহিত্যের এক প্রান্ত সংলগ্ন থাকা দরকার, সেই ক্ষেত্রে সাংবাদিকের কর্ত্তব্য আছে। ইংরাজীতে যে প্রবচন আছে—'Many are called, but few are chosen' অর্থাৎ 'অনেকেরই ডাক পড়ে, কিন্তু কাজ পায় দুই-চারিজন মাত্র'—তাহা বড় সত্য। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহা আরও সত্য; এখানে সেই অল্প কয়েকজনকে বাছিয়া লইবার জন্য ডাকিতে হইবে অনেককে—এই ডাক দেওয়ার কাজটা অন্ততঃ সাংবাদিকের।

আমাদের দেশের সংবাদপত্রসমূহের যে অবস্থা—তাহাদের সম্পাদন ও পরিচালন যে ভাবে হইয়া থাকে, তাহাতে সাহিত্যের পক্ষে কোনরূপ উপকার প্রত্যাশা করা যায় না। একেই তো কোন বড় আদর্শ কাহারও নাই; শিক্ষিত সমাজের ঔদাসীন্য তাহার একটা কারণ। আমাদের সংবাদপত্রের পশ্চাতে কোনও সুগঠিত জনমত নাই; এজন্য সাংবাদিকের দায়িত্ব নাই বলিলেও চলে। শিক্ষিত সমাজে যেটুকু রাজনীতি-চর্চ্চার আদর ও আবশ্যকতা আছে, তাহাই সাংবাদিকের উপজীব্য। এই রাজনীতি-চর্চ্চাও যেভাবে হইয়া থাকে, তাহাতে মনস্বিতা, দূরদৃষ্টি, সততার অভাব প্রায়ই লক্ষিত হয়। প্রায় সকল পত্রিকাতে যে পলিসি প্রকট হইয়া থাকে, তাহা যেমন স্বচ্ছ তেমনই সংকীর্ণ। জাতির বুদ্ধিকে সজাগ এবং চিত্তকে সজীব রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট বাধা আছে, স্বীকার করি; তথাপি সংবাদপত্র-হিসাবে যেটুকু বৈশিষ্ট্য বা character থাকা প্রয়োজন, তাহা প্রায় কাহারও নাই। এই সকল সংবাদপত্রে সাহিত্যের প্রসঙ্গ খুব কম থাকে, যাহা থাকে তাহা এতই লঘু ও দায়িত্বহীন যে, না থাকাই ভাল। আমাদের দেশের পণ্ডিত-মহলে সাহিত্য-চর্চ্চা একটা recreation বা অবসর-বিনোদন মাত্র: সকলেই তাহা কিছু কিছু করিয়া থাকেন, কারণ বিলাতী ও দেশী উপন্যাস বা কবিতার বই পড়া না

থাকিলে, এবং সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বৈঠকী আলাপ করিবার মত যোগ্যতা না থাকিলে, বিদ্বজ্জন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। এজন্য যিনি Economics, Politics, অথবা Sociology-র চর্চ্চা বা চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়া থাকেন এবং তাহাই যাঁহার পেশা, তিনিও পায়ের উপর পা' তুলিয়া সাহিত্য-বিচার করিতে বসেন, এবং যেহেতু তিনি একজন পি. আর. এস. অথবা পি-এইচ-ডি উপাধিধারী অধ্যাপক ব্যক্তি, সেই হেতু তাঁহার অমূল্য সাহিত্যিক মতামত সংবাদপত্রে আড়ম্বরে বিঘোষিত হইয়া থাকে। একটা ফুটবল খেলার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইলেও বিশেষজ্ঞ হওয়া চাই, কিন্তু আমাদের এই সাহিত্য-সহজিয়ার দেশে সকলেই নিজেই নিজের অথরিটি—আত্মপ্রচার ও Mutual Admiration-ই এরূপ সাহিত্য-সমালোচনার অভিপ্রায়। সংবাদপত্রে যাহা কিছু সাহিত্যিক সংবাদ বাহির হয়, তাহার অধিকাংশ এইজাতীয়। আর একটি বড় কাজ হইয়াছে—প্রাপ্ত পুস্তকের সমালোচনা; এই সকল রচনা অপাঠ্য, এবং বোধ হয় পত্রিকা-সম্পাদকেরও তাহা অজ্ঞাত নহে। যে ব্যক্তি ইহা লিখিয়া থাকেন তাঁহার একমাত্র যোগ্যতা—তিনি বুকনি-বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন—লাগসই বচন-রচনে তিনি বিশেষ পটু। সমালোচনার মূল্যস্বরূপ পুস্তকগুলি লেখক বা সম্পাদকের অনুরোধ-সহ সোজা তাঁহার নিকটেই পৌঁছে—সম্পাদক কোন খবরই রাখেন না। ইহাই আমাদের সংবাদপত্র-সমূহের সাহিত্য-সংবাদ। বিদেশী সাহিত্যের বিদেশী সংবাদও তেমন নিষ্ঠার সহিত সঙ্কলিত হয় না; সংবাদপত্রের কোনও অংশে উৎকৃষ্ট সাহিত্যরস পরিবেশনের জন্য ধারাবাহিকভাবে—কোনও উপন্যাস বা আর কিছু প্রকাশের জন্য—পৃথক রাখা হয় না। আমাদের সংবাদপত্রে—Feuilleton বলিতে যাহা বুঝায়—তাহার একান্তই অসদ্ভাব, যেটুকু চেষ্টা দেখা যায় তাহা হাস্যকর।

আমাদের সংবাদপত্রগুলি যেভাবে এই গুরুতর কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকে, তাহাতে মনে হয়, সংবাদপত্রে সাহিত্য-প্রসঙ্গ না থাকাই শ্রেয়স্কর। এরূপ অবস্থার আর একটা কারণ এই যে, ইহারা এ সকল রচনার জন্য পয়সা দেয় না; ইহাদের নিকটে সাহিত্যমাত্রেই অমূল্য—উহার কোনও মূল্য নাই। আসল কথা, আমাদের দেশ এখনও উচ্চতর সাংবাদিক কর্ত্তব্য-

পালনের ক্ষেত্র হইয়া উঠে নাই; জন-মনের কণ্ডুতিসাধন যাহার একমাত্র ব্রত, তাহাকে দোষ দেওয়া বৃথা; কারণ, জন-মনই এখনও জাগ্রত হয় নাই।